# দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে

[দ্বিতীয় খণ্ড]

ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র

প্রথম প্রকাশ :
১৮ই আগস্ট ১৯৬২

প্রকাশক :
শ্রীকান্তিরঞ্জন ঘোষ

প্রচ্ছদ : পঞ্চানন মালাকর

মুদ্রক :
শ্রীভূপেন্দ্রকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস
৫২এ কৈলাস বোস স্ট্রীট
কলকাতা-৫

উৎসর্গ

আমার মায়ের নামে।

## নিবেদন

এই গ্রন্থ-পর্যায়ের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশে অভাবিতপূর্ব বিলম্বের জন্যে পাঠকের মার্জনা চাই। ছাপার কাজ খুবই মন্থর-গতিতে এগিয়েও অনেক ভুল-ত্রুটি থেকে গেছে। দীর্ঘ শুদ্ধিপত্রের পরিবর্তে কেবল গুরুতর ত্রুটিগুলি সংশোধনের জন্যে এখানেই উল্লেখ করা গেল। ৩৫-এর পৃষ্ঠায় ১৪নং পাদটীকার সঙ্গেই পৃথক অনুচ্ছেদে ৩৭-এর পৃষ্ঠার ১৫নং পাদটীকার দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি বসবে। ঐ ৩৭-এর পৃষ্ঠাতেই ষষ্ঠ-সপ্তম পংক্তির 'পূর্বোক্ত পুস্তিকায়—' অংশটুকু কেটে দিতে হবে এবং সপ্তম পংক্তির ১৯৬১ হবে ১৯১৬। ৩৮-এর পৃষ্ঠার শেষ দু'লাইনে—'অনেকবার দেখানো হয়েছে। এখন'—অংশটুকু পুরোপুরি বাদ দিতে হবে। ৩৯-এর পৃষ্ঠায় ১২নং অধ্যায়ের শেষ লাইনে—'আগেও করা হয়েছে'—অংশের পরে পূর্ণচ্ছেদ বসবে। ৬৩-র পৃষ্ঠায় শেষ থেকে নবম পংক্তিতে 'অনাসক্তি' হবে 'অনাসক্তি'। ৮২-র পৃষ্ঠায় অষ্টম পংক্তিতে 'জ্ঞানে' হবে 'জ্ঞানের'। ৮৪-র পৃষ্ঠায় ইংরেজি উদ্ধৃতিতে তেরো-র লাইনে social বানানটি ভুল ছাপা হয়েছে। ৮৭-র পৃষ্ঠায় শুরু থেকে পনেরোর লাইনে তারিখটি হবে ১৩১৫। ৯৬ পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় লাইনে 'বন্দেমাতরম্' পড়তে হবে; ঐ পৃষ্ঠার শেষ থেকে চতুর্থ লাইনে তারিখটি পড়তে হবে '১৫ই ডিসেম্বর' এবং শেষ থেকে অষ্টম লাইনে '২৪-এ'।

এগুলির অতিরিক্ত যে-সব ছাপার অশুদ্ধি আছে, সেগুলি সহজেই পাঠকের চোখে পড়বে এবং পাঠক অনুগ্রহ করে সংশোধন করে নিতে পারবেন। ওপরে ত্রুটি সংশোধনের অংশগুলি দেখিয়ে দেবার জন্যই ঊর্ধ্বকমা ব্যবহৃত হয়েছে—কোনো ক্ষেত্রেই ঐসব ঊর্ধ্বকমার প্রয়োজন নেই।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক ভাব-ভাবনা ও তাঁর রাজনীতি ত্যাগ নানা মনোযোগী পাঠক নানাভাবে দেখেছেন ও আলোচনা করেছেন। বর্তমান খণ্ডে তাঁর ঐ রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের বিশদ আলোচনার অভিপ্রায় থাকলেও এই লেখকের পক্ষে কিছুতেই ভুলতে পারা সম্ভব হয়নি যে, বিলেত থেকে ফিরে, বোম্বাইয়ে অ্যাপলো বন্দরে পা দেবার

সঙ্গে সঙ্গে বিশাল এক শান্তভাব তাঁর অন্তরে দেখা দেয় এবং পরবর্তী বেশ কয়েক মাস সেই ভাব অনির্বাপিত ছিল। রংপুরে ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের দ্বারা অনুপ্রেরিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' (১৮৮২) তাঁকে উদ্দীপিত করে এবং তিনি বরোদায় অবস্থানকালেই ১৯০১ সালে এক সন্ধ্যায় প্ল্যানচেটে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছ থেকে 'মন্দির গড়ো' নির্দেশ পান। 'নিজের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ'তে,—এ. বি. পুরানির 'দি লাইফ অফ শ্রীঅরবিন্দ-তে' এবং অন্যত্রও এই সূত্রটি পাওয়া যায়। শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি দেশ-কে এই মাতৃরূপে উপলব্ধির রাজনীতি—তাতে হিংসা-অহিংসা দু'রকম পরীক্ষাই ঘটেছিল, কিন্তু চিত্তশুদ্ধি, আত্মদর্শন, বিশ্বকল্যাণদৃষ্টি ও যোগের পথে অতি-মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হওয়াই সে রাজনৈতিক ঝড়-ঝাপটার শেষ লক্ষ্য বলে উপস্থিত লেখকের ধারণা হয়েছে। বরোদাতেই ভগিনী নিবেদিতার কয়েকটি ভাষণ উপলক্ষে শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি যে শক্তিব্রতী বিপ্লবী, নিবেদিতা তখনি তা জানতেন এবং নিবেদিতার 'Kali—the Mother' পড়ে শ্রীঅরবিন্দ সে-রচনার প্রশংসা করেন। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের আমলে শ্রীঅরবিন্দের 'ভবানী মন্দির' নামে পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি (ভবানী মন্দির ওম্ নমস্ চণ্ডিকায়ৈ) প্রচারিত হয় গোপনে—এবং তার মূলকথা ছিল ভক্তি, কর্ম ও জ্ঞানের সাধনাগুণে শক্তি উপাসনার জন্যেই কোনো অনুকূল পার্বত্য অঞ্চলে 'ভবানী মন্দির' গড়ে তুলতে হবে। তাতে মা বলেছেন—'আমি ভবানী ভারতী, ভারতজননী'! শ্রীঅরবিন্দের সক্রিয় রাজনৈতিক আন্দোলনের পর্ব খুবই সংক্ষিপ্ত এবং তারই মধ্যে তাঁর যোগসাধনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। নিজের মনকে তিনি অবলীলাক্রমে স্তব্ধ করতে পেরেছিলেন—সে তাঁর রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের পর্বেই। ১৯১০-এর পরেও তিনি দেশের ও বিশ্বের নানা রাজনৈতিক সামাজিক ঘটনা লক্ষ্য করে গেছেন, কিন্তু দেশের নানা নেতা ও মনীষীর সঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক আলোচনায় যোগ দিলেও তিনি নিজে আর রাজনীতিতে নামেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তিনি প্রকাশ্যেই নিজেকে মিত্র-শক্তির পক্ষাবলম্বী বলে ঘোষণা করেন, তার কারণ, হিটলারের পিছনে তিনি আসুরিক শক্তির অন্ধকার দেখেছিলেন। দেশকে তিনি অতঃপর সার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌সের প্রস্তাব মেনে নিতে বলেছিলেন। কিন্তু সে

আলোচনা যখন ব্যর্থ হয়ে যায় তখন আবার আধ্যাত্মিক শক্তিরই শরণ নেন তিনি। ১৫ই আগস্ট তাঁর জন্মদিন; ১৯৪৭-এর সেই জন্মদিনে ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়—এবং তিনি এশিয়ার নবজাগরণ ও ইউরোপে আমেরিকায় ভারতাত্মার শুভ অনুপ্রবেশের ক্রমগতি লক্ষ্য করে লেখেন —"The unification of mankind is under way, though only in an imperfect initiative, organised but struggling against tremendous difficulties."

প্রথম খণ্ডের মতন এই দ্বিতীয় খণ্ডেও অবিন্যস্ততার ত্রুটি ঘটেছে। অতিকথন, স্বল্পালোচনা ইত্যাদি দোষের জন্মে মার্জনা চাই। এই আলোচনা-পর্যায় একজন সাধারণ পাঠকের নিতান্তই সীমিত সামর্থ্যের নিদর্শন। অতঃপর তাঁর যোগপথের প্রসঙ্গ আলোচ্য। ইতি—

১

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ সুবিস্তীর্ণ। বিলেতে তাঁর ছাত্রজীবনের দিনগুলি, বরোদায় তাঁর অধ্যয়ন ও যোগচর্চা, তাঁর কবিতা ও বিভিন্ন শ্রেণীর নিবন্ধাদি রচনা,—বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টি-বিনিময়, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা দূর করবার আয়োজনে তাঁর নিজস্ব ভূমিকা,—আলিপুরে তাঁর কারাবাসের কাহিনী,—'কর্মযোগীন্', 'আর্য', 'ধর্ম' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর নিবন্ধাবলী এবং ১৯১০ থেকে তাঁর তিরোধান অবধি চল্লিশ বছরের পণ্ডিচেরির জীবন সবই বিবেচ্য।

এই বিশেষ কথাগুলি বারবার ভেবে দেখা দরকার যে 'স্বাধীনতার অর্থ' নামে তাঁর একটি বাংলা নিবন্ধে তিনি লেখেন—"রাজনীতিক স্বাধীনতা স্বারাজ্যের একমাত্র অঙ্গ—তাহার দুই দিক আছে, বাহ্যিক স্বাধীনতা ও আন্তরিক স্বাধীনতা। বিদেশীয় শাসন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি বাহ্যিক স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্র আন্তরিক স্বাধীনতার চরম বিকাশ। যতদিন পরের শাসন বা রাজত্ব থাকে, ততদিন কোন জাতিকে স্বরাজপ্রাপ্ত স্বাধীন জাতি বলেনা। যতদিন প্রজাতন্ত্র সংস্থাপন না হয়, ততদিন জাতির অন্তর্গত প্রজাকে স্বাধীন মনুষ্য বলে না।' তিনি ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চেয়েছিলেন। আগে এসব লেখা হয়েছে, পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও এখানে আবার একথা বলা অনিবার্য।

১৯০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দের সাপ্তাহিক 'কর্মযোগীন্' নামে ইংরেজি পত্রিকায় এক নিবন্ধে লেখা হয়—"We aim not at the alteration of a form of government but at the building up of a nation. Of that task politics is a part, but only a part." সচরাচর লোকে যাকে রাজনীতি বলে, শ্রীঅরবিন্দের কাছে সেটাই পূর্ণ লক্ষ্য ছিল না। এই 'নেশন' সম্বন্ধে তাঁর ধারণার স্বরূপ,—'নীতি', 'ধর্ম',—ভারতের বিশেষ আধ্যাত্মিক প্রকৃতির চরিতার্থতা সম্বন্ধে তাঁর ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি বিষয় তাঁর রাজনীতি-চিন্তার সঙ্গেও জড়িত। এই প্রসঙ্গগুলি কিছুতেই অগ্রাহ্য করা চলে না।

প্রথাগত ধারণার পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়,—কোন রকম বিচ্ছিন্নতা নয়,—মানুষের

পূর্ণ বিকাশ ও যথার্থ স্বাধীনতা চেয়ে গেছেন তিনি। এই দিক থেকেই এক আসন্ন বিশ্ববিপ্লবের দিকে সজাগ ছিলেন তিনি। বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় পর্যায়-ক্রমে ১৬ই জুলাই, ১৮৯৪ থেকে ২০-এ আগষ্ট ১৮৯৪-এর মধ্যে ইংরেজিতে 'by a Bengalee' নাম দিয়ে, অরবিন্দ তাঁর বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কিত যে সাতটি প্রবন্ধ লেখেন, ১৯৫০-তে পণ্ডিচেরি শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম থেকে সেগুলি এক পুস্তিকায় ('Bankim Chandra Chatterjee') প্রকাশিত হয়। সেই লেখাগুলি স্পষ্টভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাঞ্জলি বটে, কিন্তু অরবিন্দের রাজনীতি-চিন্তার কয়েকটি বিশেষ দিকই সেগুলিতে প্রসঙ্গত ব্যক্ত হয়েছে। যোগ্য এক সাবলীল ভাষা, সমৃদ্ধ আধুনিক এক সাহিত্য ও একটি জাতি সৃষ্টিতে বঙ্কিম-মধুসূদনের দান ও কৃতিত্ব-গৌরব তিনি স্মরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গও ছিল তাতে। শেষ প্রবন্ধ 'Our Hope in the Future'-এর এক জায়গায় তিনি লেখেন "Young Bengal gets its ideas, feelings and culture not from schools and colleges but from Bankim's novels and Rabindranath Tagore's poems; So true is it that language is the life of a nation." শ্রীঅরবিন্দের ইংরেজি "কালেক্‌টেড পোয়েম্‌স্‌"-এর মধ্যে সম্ভবত তাঁর অল্প বয়সের লেখা তারিখ-হীন এক চতুর্দশপদী পাওয়া যায়। সেটির বঙ্গানুবাদ দেওয়া হোলো এই আলোচনা-পর্যায়ের বর্তমান দ্বিতীয় খণ্ডের প্রারম্ভেই—

সীমাহীন মানচিত্রে তুচ্ছ এক বিন্দুর একক
বিশাল বিস্তারে ঘোর অর্থহীনতায়
জনহীন সৃষ্টিব্যাপী অগ্নিচক্রে যেন অকস্মাৎ
এ-মর্তের মৃত্তিকাই উদ্ভব ঘটায় মানুষের।

আপন অজ্ঞানে এক ধূসরতাবন্দী সেই জীব—
মন তার আধোআলো—আধোছায়া-নিহিত; নিঃশ্বাস
মন্থরত বন্দী যেন মৃত্যুময় মহাবিশ্বলোকে
আয়ু তার মাত্র কটি পঙ্গু বর্ষে সীমিত, তথাপি

অগ্রগতি অফুরন্ত অন্তরের দিব্যতাপ্রয়াসী
অচেতন অন্ধকার রাত্রিলীন চৈতন্যকণিকা
অদৃশ্য নির্মম নানা শক্তির সংঘর্ষ-সম্মুখীন
কারণ, নিজেরই দিব্য দ্যুতির সে উপলব্ধিকামী।

অবোধ মৃত্তিকা থেকে ঈশ্বরত্বে চায় উত্তরণ
অতি মন্দ পদপাতে চলে যেথা কাল চিরন্তন।

মূলে এই চতুর্দশপদীর অন্ত্যমিলের ছাঁদ কখখক কখখক কখখক গগ; কিন্তু বঙ্গানুবাদে সেই ছাঁদটুকু লঙ্ঘন করতে হয়েছে। কোনো অনুবাদই বোধ হয় মূলের যথাযথ প্রতিরূপ হয়ে ওঠেনা কখনো। সে যাই হোক, তাঁর রাজনৈতিক ভাবাদর্শ ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে 'দি লাইফ অফ শ্রীঅরবিন্দ (১৮৭২-১৯২৬)' বইটির লেখক পুরানির এই মন্তব্য স্মরণীয় যে. প্রথমত শ্রীঅরবিন্দ এক গুপ্ত বিপ্লবী প্রচারসংস্থা ও সংগঠন সহযোগে কাজ আরম্ভ করেন—যার কেন্দ্রীয় লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধায়োজনের প্রস্তুতি, দ্বিতীয়ত তিনি যখন রাজনীতিতে প্রবেশ করেন তখন সারা দেশকে রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার যে প্রচারায়োজন ছিল, দেশের অধিকসংখ্যক লোকই তা অবাস্তব ও অসম্ভব,—এমন কি উন্মাদের কল্পনা বলে মনে করতেন; তৃতীয়ত, জনসাধারণের সংগঠন ছিল উত্তরোত্তর বৃদ্ধিশীল ও ঐক্যবদ্ধ এবং অসহযোগিতা ও অহিংস প্রতিরোধের পথে বৈদেশিক শাসন উচ্ছেদের প্রয়াসী।[১] একথা অন্যান্য কেউ-কেউও বলেছেন। এই পরিস্থিতিতে—যখন বৈদেশিক কোনো কোনো শক্তি খুবই সশস্ত্র ও যুদ্ধপরায়ণ ছিল, তখন দেশের স্বল্প-সংখ্যক ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে বাইরে থেকে সম্ভাব্য সাহায্যের বলে ভারতবর্ষ অপসারণ করতে অসমর্থ হবে না। এই রকম ধারণাই শ্রীঅরবিন্দ পোষণ করতেন। তিনি জানতেন যে, সে কাজের জন্যে উপযুক্ত সংগঠন চাই। এ সত্য তিনি মনে-প্রাণে বুঝেছিলেন। ভারতের সেনাদলের মধ্যেও বিদ্রোহ ঘটা অসম্ভব ছিল না। ব্রিটিশ শাসকদের চরিত্র ও মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তাতে তাঁর মনে হয়েছিল যে, দেশের মধ্যে ভারতীয়েরা যদি মুক্তি-আন্দোলন ঘটিয়ে তোলে, তাহলে ব্রিটিশ সরকার তা দমনের চেষ্টা করলেও, নিজেদের রাজকীয় নিয়ন্ত্রণের অধিকার বজায় রেখে তারা ধীরে ধীরে কিছু কিছু সংস্কার মেনে নিতে আপত্তি করবে না। যদি আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে, তাহলে পরিণামে তারা ভারতকে স্বাধীনতা দিতেও পারে।[২] পুরানি লেখেন যে, কোনো-কোনো অঞ্চলে

এই ধারণা বিদ্যমান যে, শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক মনোভাব ছিল পুরোপুরি শান্তিবাদী এবং নীতিগতভাবে ও আচরণে তিনি ছিলেন সর্বপ্রকার হিংসাত্মক কার্য-বিরোধী,— কেউ বা একথাও বলেন যে, অহিংসা-নীতির আদি-পথপ্রদর্শকদের মধ্যেই তিনি গণ্য। কিন্তু পুরানির কথায়—"This is quite incorrect. Sri Aurobindo is neither an important moralist nor a weak pracifist."।[৩] অর্থাৎ পুরানি তাঁকে অক্ষম নীতিবাগীশও বলেন নি, দুর্বল শান্তি-বাদীও বলেন নি। শান্তিবাদ তো কোনো তুচ্ছ কৌশলের ব্যাপার নয়! প্যাসিভ রেজিস্‌ট্যান্‌স্‌-- যার বঙ্গানুবাদে বলতে হয় 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ'—বিষয়টি কেমন যেন হাস্যকর। মানবচৈতন্যের বিশেষ উন্মীলন ব্যতিরেকে যথার্থ অহিংসা ও শান্তির মনোভাব কি দেখা দিতে পারে? কোনোভাবে আরোপিত কোনো নীতিজ্ঞান দিয়ে মনকে অহিংস করা সম্ভব কখনো? আবার পুরানির কথায় বলা যেতে পারে— "Peace is a part of the highest ideal, but it must be spiritual or at the very least psychological in its basis, without a change in human nature it cannot come with any finality."[৪] —আধ্যাত্মিক ও মানসিক পরিবর্তন ব্যতিরেকে যথার্থ উচ্চস্তরের সংকল্প জাগিয়ে তোলা অসম্ভব। তিলকের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের প্রথম পর্বের রাজনৈতিক আদর্শের সাদৃশ্য দেখিয়ে পুরানি লেখেন—"Sri Aurobindo has never concealed his opinion that a nation is entitled to attain its freedom by violence if it can do so or if there is no other way; whether it should do so or not depends on what is the best policy, not on ethical considerations. Sri Aurobindo's position and practice in this matter was the same as Tilak's and that of other Nationalist leaders who were by no means Pacifists or worshippers of Ahimsa."[৫] অতএব 'শান্তি' ও 'অহিংসা'-ই তাঁদের লক্ষ্য ছিল না; তিলক ও শ্রীঅরবিন্দ উভয়েই চেয়েছিলেন মুখ্যত স্বাধীনতা—তা সে যে উপায়েই হোক না কেন।

বিলেত থেকে দেশে ফেরবার ঠিক পরমুহূর্তেই তিনি রাজনৈতিক কাজ আরম্ভ

---

৩। তদেব, পৃঃ ২৫২।

৪। তদেব।

৫ তদেব, পৃঃ ২৫৩।

করেন কি না, সে প্রসঙ্গে পুরানি লিখেছেন—না, তা করেন নি। 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকার প্রবন্ধগুলি লেখা ছাড়া তিনি অন্য কোনো রাজনৈতিক কাজে এগোন নি। বরোদার সেনা-বিভাগের যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে [পরে ইনিই 'নিরালম্ব স্বামী'] বাংলায় বিপ্লবাত্মক সংঘ গড়ে তুলতে পাঠানোই ছিল তাঁর প্রথম রাজনৈতিক কাজ।

তাঁর তিরোধানের পরে তাঁর খশড়া-খাতা থেকে আনকোরা অবস্থায় পাওয়া শ্রীঅরবিন্দের যে বাংলা লেখাগুলি ১৯২৫-র ২৪এ নভেম্বর পণ্ডিচেরির শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম থেকে 'শ্রীঅরবিন্দ বিবিধ রচনা' নামে প্রকাশিত হয়, তাতে 'পুরাতন ও নূতন', 'সমাজের কথা', 'মানবসমাজের তিন ক্রম', 'পূর্ণতা' ইত্যাদি মোট দশটি ছোটো ছোটো গদ্যনিবন্ধ পাওয়া যায়। প্রথম লেখাটিতে তিনি 'পুরাতন' ও 'সনাতন'-এর ভেদ দেখিয়েছেন এইভাবে—"সনাতন ও পুরাতন এক নয়। সনাতন চিরকালের, যাহা ত্রিকালাতীত, যাহা অবিনশ্বর, যাহা সকল রূপান্তরের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন ধারায় বিদ্যমান থাকে, যাহাকে দেখি বিনশ্যৎসু, অবিনশ্যন্তং, তাহাই সনাতন। পুরাতন বলিয়া ভারতের ধর্ম ও মূল চিন্তাকে আমরা সনাতন ধর্ম সনাতন সত্য বলি না। আত্মানুভূতিলব্ধ সনাতন আত্মজ্ঞান বলিয়া, সেই চিন্তা সনাতন জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সেই ধর্ম সনাতন। পুরাতন সনাতনের একটু সময়োপযোগী রূপ মাত্র।" হিন্দুর 'সনাতন ধর্ম' সম্বন্ধে বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের চিন্তার সাদৃশ্য এই সূত্রে স্মরণীয়; পরে এই প্রসঙ্গটি পুনরায় দেখা যাবে। দ্বিতীয় রচনা 'সমাজের কথা'-তে তিনি লেখেন—"মানুষের জন্ম সমাজের জন্য নয়, সমাজ মানুষের জন্য সৃষ্ট।" এই উক্তিতে ব্যক্তি ও সমাজ, এই দুই পক্ষের মধ্যে 'ব্যক্তি'কেই তিনি প্রাধান্য দেন। এই লেখাটি নানা কারণে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের ভিত্তিস্বরূপ বলা চলে। স্পষ্টভাবে তাঁর এই অভিমত উচ্চারিত হয় যে,—"মানুষ সমাজের নয়, মানুষ ভগবানের।" এবং—"সমাজ উদ্দেশ্য হইতে পারে না, সমাজ উপায়, যন্ত্র।" নিবন্ধটির শেষ অনুচ্ছেদে লেখা হয়—"আমরা মানুষকে ছোট করিয়া সমাজকে বড় করিয়াছি। সমাজ কিন্তু তাহাতে বড় হয় না, ক্ষুদ্র নিশ্চল ও নিষ্ফল হয়।"[৬] পূর্বোক্ত 'পূর্ণতা' নিবন্ধে তাঁর মন্তব্য—"পূর্ণতার অর্থ কি? পূর্ণতা ভাগবত সত্তার স্বরূপ, ভাগবতী প্রকৃতির ধর্ম। মানুষ অপূর্ণ, পূর্ণতার প্রয়াসী. পূর্ণতার দিকে ক্রমবিকাশ, আত্মার ক্রম-অভিব্যক্তির ধারায় অগ্রসর। পূর্ণতা তাহার গন্তব্যস্থান, মানুষ ভগবানের একটি অর্ধবিকশিত রূপ। সেইজন্য সে ভাগবত পূর্ণতার পথিক।

---

৬। 'বিবিধ রচনা' পৃঃ ৪ দ্রষ্টব্য। এইসূত্রে প্রথম খণ্ডের ৭-৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এই মানুষরূপ মুকুলে ভাগবত পদ্মের পূর্ণতা লুক্কায়িত, তাহা ক্রমে ক্রমে আস্তে আস্তে প্রকৃতি ফুটাইতে সচেষ্ট। যোগ-অভ্যাসে যোগশক্তিতে সে মহাবেগে ত্বরিতবিকাশে ফুটিতে আরম্ভ করে। লোকে যাহাকে পূর্ণ মনুষ্যত্ব বলে, মানসিক উন্নতি, নৈতিক সাধুতা, চিত্তবৃত্তির ললিত বিকাশ, চরিত্রের তেজ, প্রাণের বল, দৈহিক স্বাস্থ্য, সে ভাগবত পূর্ণতা নয়। সে প্রকৃতির একটি খণ্ড-ধর্মের পূর্ণতা। আত্মার পূর্ণতায়, মানসাতীত বিজ্ঞানশক্তির পূর্ণতায় প্রকৃত অখণ্ড পূর্ণতা আসে। কারণ, অখণ্ড আত্মাই আসল পুরুষ, মানুষের মানসিক প্রাণিক ও দৈহিক পুরুষত্ব তাহার একটি খণ্ডবিকাশ মাত্র। আর মনেব বিকাশ বিজ্ঞানেব একটি খণ্ড বাহ্যিক বিকৃত খেলা, মনের প্রকৃত পূর্ণতা আসে যখন সে বিজ্ঞানে পরিণত হয়। অখণ্ড আত্মা জগৎকে বিজ্ঞানশক্তিদ্বারা সৃজন করিয়া নিয়ন্ত্রিত করে, বিজ্ঞানশক্তির দ্বারা খণ্ডকে অখণ্ডে তুলিয়া দেয়।"[৭] এই 'বিজ্ঞানশক্তি' বলতে কী বোঝায়? অধ্যাপক হরিদাস চৌধুরীর কথায় "বিজ্ঞানেব প্রধান বৈশিষ্ট্য হইল অদ্বৈতবোধ।"—'বিজ্ঞান' হোলো Comprehending Consciousness, 'প্রজ্ঞান' Apprehending Consciousness এবং 'সংজ্ঞান' হোলো Projecting Consciousness।[৮]

১১ই মার্চ, ১৯২৫ তারিখে লেখা "দি পোলিটিকাল ফিলসফি অফ শ্রী অরবিন্দ" বইয়ের প্রথম সংস্করণের মুখবন্ধে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথপ্রসাদ ভার্মা দাদাভাই নৌরজী, ফিরোজ শা মেহেটা, বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, গোখেল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামেব প্রথম পর্বের অন্যান্য নেতৃবৃন্দেব মধ্যে শ্রীঅরবিন্দেব বিশেষ গৌরবময় স্থানের উল্লেখ ক'রে রোমা রোলাঁর মন্তব্য স্মরণ করিয়ে দেন, যে তিনি ছিলেন ইউরোপ ও এশিয়ার শীর্ষ প্রতিভার সমন্বয়! অধ্যাপক ভার্মার কথায়—"He was one of the foremost leaders of the Extremist party in Bengal during 1905-1910. The editorial articles that he wrote in those days in the *Bande Mataram*, the *Karmayogin* and the *Dharma* are full of political inspiration[৯] অর্থাৎ 'বন্দেমাতরম্', 'কর্মযোগীন্' ও 'ধর্ম'—তিন সূত্র থেকেই শ্রীঅরবিন্দকে তখনকার একজন উগ্রপন্থী রাজনৈতিক ভাবুক রূপে দেখা যাচ্ছে।

## ২

একথা বারবার বলা হয়েছে যে, কবি, যোগী, বিপ্লবী—এই তিন সত্তার সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর জীবনে। আধ্যাত্মিকতায় তাঁর বিশ্বাস বেদ, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতির নিজস্ব উপলব্ধি থেকে তো বটেই, প্রভূত পরিমাণে য়ুরোপীয় সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব-রাজনীতি-অর্থনীতি ইত্যাদির অধ্যয়নসূত্রেও ঘটেছিল বটে, তবে মানবমনের সাধারণ বুদ্ধিচালনার অসামান্য কৃতিত্বের উদাহরণ হিশেবেই তাঁকে দেখলে চলবে না। বাংলায় তিনি কিছুই যে না লিখেছেন, তা নয়, তবে তাঁর রচনার বোধ হয় শতকরা পঁচানব্বই বা তারও বেশির ভাগ হোলো ইংরেজিতে। পণ্ডিচেরি শ্রীঅরবিন্দ-সোসাইটি থেকে প্রকাশিত 'শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গালা রচনাবলী' নামে বইটির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। ১৫ই আগস্ট, ১৯২৫ তারিখে প্রকাশিত সেই বইয়ের প্রথম সংস্করণের 'ভূমিকা'য় শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত লিখেছেন যে, বরোদায় এসেই তিনি বাংলা রীতিমত পড়তে, লিখতে, বলতে শেখা আরম্ভ করেন। তাঁর বাংলা রচনা-প্রয়াসের—"প্রথম ফলই হ'ল বঙ্কিমচন্দ্রের উপর প্রবন্ধাবলী। ক্রমে চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কবিওয়ালাদের অনুবাদ।" নলিনী-কান্তের কথায়—"বসুমতী সংস্করণের সকল গ্রন্থাবলী তাঁর পুস্তকাগারে ছিল, অনেক অনেক মন্তব্য পড়বার সময় তিনি সেইসব পুস্তকে লিখে রেখেছেন, যথা, মধুসূদনের কয়েকটা কবিতার উপর। বাংলা লেখাতেও কাব্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর দাদা মনোমোহন ঘোষ এক কৌতূহলের সংবাদ পরিবেশন করেছেন। মনোমোহন রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন, অরবিন্দ তার কিছু কবিতা (ইংরেজি) রবীন্দ্র-নাথকে পাঠাবেন হয় ত; তবে সে এখন ব্যস্ত বাংলা কবিতা লেখায়, ইংরেজি কবিতায় সে সুন্দর, সুদক্ষ, এখন সে বৃথা সময় নষ্ট করছে বাংলা কবিতা লেখার চেষ্টায়—লিখছে উষাহরণ কাব্য (মধুসূদনেই ঢং-এ)। মনোমোহন কিন্তু নিজেও ঠিক ঐ বিষয়ে এক কাব্য লিখেছেন।" আগেই বলা হয়েছে, এ-ভাষা নলিনীকান্তের। এইসূত্রে আরো লেখা হয় -"আমাদের এই সংগ্রহের মধ্যে বাংলা ভাষায় তাঁর প্রথম লেখার নিদর্শন হ'ল মৃণালিনীর নিকট পত্রাবলী। আর সর্বশেষ হ'ল পণ্ডিচেরিতে লিখিত পত্রাবলী কয়েকজন সাধিকার কাছে। পণ্ডিচেরির পূর্বে বেশির ভাগ বাংলা লেখা হয়েছিল 'ধর্ম্ম' পত্রিকার জন্য। 'ধর্ম্ম' পত্রিকার সব লেখাই শ্রীঅরবিন্দের হাত থেকে, শেষের কয়েকটি সংখ্যা ছাড়া।"

তাঁর এই বইটিতে 'স্বাধীনতার অর্থ' নিবন্ধে অরবিন্দের সেকালের এই মন্তব্যটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়—"স্বাধীনতা আমাদের রাজনীতিক চেষ্টার উদ্দেশ্য। কিন্তু স্বাধীনতা কি, তাহা লইয়া মতভেদ বর্তমান। অনেকে স্বায়ত্তশাসন বলেন, অনেকে ঔপনিবেশিক স্বরাজ বলেন, অনেকে সম্পূর্ণ স্বরাজ বলেন। আর্য্য ঋষিগণ সম্পূর্ণ ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা এবং তৎফলস্বরূপ অক্ষুণ্ণ আনন্দকে স্বারাজ্য বলিতেন।" এবং—"আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাই, বিদেশীয় আদেশ ও বন্ধন হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি, স্বগৃহে প্রজার সম্পূর্ণ আধিপত্য, ইহাই আমাদের লক্ষ্য।"

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি-চিন্তার এই সূত্রটি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যাঁরা তাঁকে তথাকথিত বিপ্লবপন্থা-পরিত্যাগী 'পলাতক' পর্যন্ত বলতে কুন্ঠিত হন না, তাঁদের বিচার-বুদ্ধি প্রায়শঃই শ্রীঅরবিন্দের নিজের এইসব সুস্পষ্ট উক্তি ও ভাবনা হয় দেখেনা বা দেখেও দেখতে চায় না। স্বরাজ, স্বাধীনতা, প্রজাতন্ত্রের প্রতি লক্ষ্য তাঁর জাতীয়তা-বোধের বিশেষ উপলব্ধিরই নিদর্শন। তিনি স্বধর্মাবলম্বনকেই ভারতের ব্যক্তি, পরিবার ও জাতির একমাত্র লক্ষ্য বলে মানেন। এই ছোটো নিবন্ধটিতেই তিনি লেখেন—"বিদেশী যদি দেশ অধিকার করিয়া অতি দয়ালু ও হিতৈষীও হন, তাহা হইলেও আমাদের মস্তকে পরধর্মের ভার চাপাইতে ছাড়িবেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ভাল হউক মন্দ হউক, তাহাতে আমাদের অহিত ভিন্ন হিত হইবে না।" যেমন—"রোমের আধিপত্যভুক্ত, রোমের সভ্যতাপ্রাপ্ত প্রাচীন য়ুরোপীয় জাতিসকল অনেক দিন সুখস্বচ্ছন্দে কাটাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের শেষ অবস্থা অতি ভয়ানক হইল, মনুষ্যত্ব বিনাশে তাঁহাদের যে ঘোর দুর্দশা অবশ্যম্ভাবী!"—"অতএব কোন জাতি যদি নিজদোষে পরাধীনতায় পতিত হয়, অবিকল ও পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ তাহার প্রথম উদ্দেশ্য ও রাজনীতিক আদর্শ হওয়া উচিত। ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন স্বরাজ নয়, তবে যদি বিনা সর্তে সম্পূর্ণ অধিকার দেওয়া হয় এবং জাতি আদর্শভ্রষ্ট ও স্বধর্মভ্রষ্ট না হয়, স্বরাজের অনুকূল ও পূর্ববর্তী অবস্থা হইতে পারে বটে।" তিনি আরো লেখেন যে, যদি স্বধর্মের বিরোধী না হয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত থেকেও আমাদের পূর্ণাঙ্গ স্বরাজ লাভ সম্ভব হোতো, তাহলে সেরকম ব্যবস্থাতেই বা আপত্তি ঘটবে কেন? তাঁর নিজের কথায়—"আমরা ইংরাজ জাতির বিদ্বেষে স্বরাজ চেষ্টা করিতেছি না। দেশরক্ষার জন্য করিতেছি।"

তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাকে কখনোই যুক্তি-বিবেচনা-সর্বস্ব ব্যাপ্যার বলা ঠিক হবে না। এক্ষেত্রে 'উপলব্ধি' কথাটির ওপরেই বিশেষ জোর দিতে হবে। তিনি 'আত্মজ্ঞান'-এর সঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক সাধনাকে অবিচ্ছেদ্য ব্যাপার

বলে মেনেছিলেন। যে সীমিত অর্থে 'ঐতিহ্য' ও 'প্রগতি' গতানুগতিক আলোচনায় ব্যবহৃত হয়, শ্রীঅরবিন্দ সেই সীমিত অর্থে এসব শব্দ অনুভব করেছিলেন কি? মনে রাখতে হবে—কখনোই সে রকম ঘটেনি। স্বামী বিবেকানন্দের স্বদেশপ্রেম ও বিশ্বাত্মভাবনার সঙ্গেই বরং শ্রীঅরবিন্দের ভাবনার সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। প্রথম খণ্ডের নানা অংশে এদিকটি আগেই দেখানো হয়েছে। বিবেকানন্দের প্রসঙ্গ অনিবার্য কারণেই এই দ্বিতীয় খণ্ডেও বারবার দেখা দেবে।

ব্রিটিশ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের মূলে যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষারই প্রেরণা ছিল, সেকথা সুবিদিত। ১৮৫৮-তে সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার নতুন ঘোষণা-সূত্রের আমলেই প্রশাসনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু সংস্কারের পরিকল্পনা এবং সেই সূত্রে কতকটা আঞ্চলিক স্বশাসন অনুমোদনের আগ্রহ দেখা দেয়। ১৮৮৩-তে ইলবার্ট-বিল সম্পর্কে আন্দোলন দেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে সামাজিক সংস্কারকর্ম থেকে রাজনৈতিক সংস্কারের দাবির দিকে অগ্রগতির উদাহরণ। ১৮৮৫-তে অ্যালান অক্‌টেভিয়ান হিউম ও উইলিয়ম ওয়েডারবার্ন নামে দুই ইংরেজ-সন্তান দেশের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষিত কয়েকজন প্রখ্যাত নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্যে এক সর্বভারতীয় রাজনৈতিক সংস্কারের সংকল্প নিয়েই কাজে এগুনোর ফলে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পত্তন হয়। ঠিক রাজনৈতিক দল হিশেবে নয়, ভারতের জাতীয় কংগ্রেস শুরু হয়েছিল দেশের বিভিন্ন মতাদর্শের বিনিময় ও রাজনৈতিক অভিপ্রায়গুলি ব্রিটিশ সরকারের গোচরে আনার উদ্দেশ্যে। ১৮৮৫-তে বোম্বাইয়ে এই জাতীয়-মহাসভা বা কংগ্রেসের যে প্রথম অধিবেশন হয়, তাতে যে বাহাত্তর জন সদস্য যোগ দেন তাঁদের কাউকেই মুখ্যত রাজনৈতিক কর্মী বলা যায় না। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শের অনুরাগী এবং উনিশ শতকের ব্রিটিশ উদারপন্থার ভক্ত। ভারতের পল্লীবাসী জনসাধারণের প্রতিনিধি বলা যায় না তাঁদের।

'বেতার জগৎ'-এর ২২এ জুলাই ১৯২৫ (৪০ বর্ষ : ১৫শ সংখ্যা) সংখ্যায় প্রকাশিত ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'জাতীয় জাগরণে শ্রীঅরবিন্দের অবদান' নিবন্ধে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে চোদ্দ বছর বিলাত প্রবাসের পরে দেশে ফিরে শ্রীঅরবিন্দ দেশে কংগ্রেসের যে কাজ পেলেন, সে বিষয়ে সংক্ষেপে লেখা হয়—কংগ্রেসের "একমাত্র কার্যপদ্ধতি ছিল শাসন সংস্কারের জন্য ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ও ইংরেজ জাতির নিকট আবেদন। কারণ তখন এ দেশের রাজনীতির মূল সূত্র ছিল ইংরেজ জাতির ন্যায়পরায়ণতায় অগাধ বিশ্বাস। অরবিন্দ প্রথমেই কংগ্রেসের মূলনীতি ও কার্য-পদ্ধতির বিরুদ্ধে ওজস্বিনী ভাষায় তীব্র প্রতিবাদ করেন। বম্বে হইতে প্রকাশিত 'ইন্দুপ্রকাশ' নামক পত্রিকায় তিনি ক্রমাগত প্রবন্ধ লিখিয়া তাঁহার স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন।" এদেশের রাজনীতি-ভাবনার প্রবাহে তাঁর নিজস্ব এই মতের কথা-প্রসঙ্গেই জাতীয়তার প্রেরণা ও আত্মজ্ঞান-সাধনার আহ্বানের দিকগুলি মনে আসে। এই আত্মজ্ঞানের প্রসঙ্গও অবান্তর নয়। তাঁর রাজনীতি-চিন্তার দিক থেকেও এ প্রসঙ্গ বিশেষ বিবেচ্য—যদিও এই বিষয়টি প্রথম খণ্ডে বারবার উল্লেখ করা হয়েছে।

'আত্মজ্ঞান' এমন একটি শব্দ যার অর্থ আমাদের কাছে কতকটা ঝাপসা মনে হয়। অরবিন্দ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র লেখেন—"ভারতে ফিরিবার কিছু পূর্বে বিলাতেই তিনি একটি গুপ্ত সমিতি গঠন করেন—ইহার নাম হয় 'লোটাস অ্যাণ্ড ড্যাগার' (Lotus and Dagger) অর্থাৎ 'পদ্ম' ও 'অসি'। অরবিন্দ মানে পদ্ম, সুতরাং পরোক্ষভাবে অরবিন্দ নিজের নামেই এই সমিতির নাম রাখেন। এই গুপ্ত সমিতির প্রতি সভ্যকেই শপথ গ্রহণ করিতে হইত যে, যে কোন উপায়ে হউক ভারতকে অধীনতার পাশ হইতে মুক্ত করিবে। বলা বাহুল্য, এই সমিতি বেশি দিন স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু অরবিন্দ যে শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন জীবনে কখনও তাহা বিস্মৃত হন নাই। বিপ্লবাত্মক কার্য, সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন এবং আধ্যাত্মিক উন্নয়ন, এই ত্রিবিধ উপায়ে দেশের স্বাধীনতার পথ প্রশস্ত করার কার্যেই তিনি ভারতে জীবনের অবশিষ্ট কাল নিয়োজিত করিয়াছিলেন।" স্বরাজ, জাতীয়তা, আধ্যাত্মিকতা, আত্মজ্ঞানের সাধনা—শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি-বোধে

এসব শব্দের একটিও 'পলায়ন'-বাচক নয়। আমি কে ?—এ প্রশ্ন মানবচিত্তেরই সহজাত বা পরিবেশতাড়িত জিজ্ঞাসা। আমার শরীর আছে, মন আছে, রুচি-অরুচি আছে—আমার দেশ আছে, মমতা আছে, মর্যাদা আছে—এই সব বিভিন্ন মমত্বের সমাহার যেখানে, সেই আধারটির নাম 'আমি'। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা আর সংস্কারের একত্রিত রূপটি কিন্তু সম্পূর্ণভাবে বা বিস্তৃতভাবে সাধারণত এক নিমেষে, এক ক্ষেত্রে বা পাত্রে চোখে পড়ে না। আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাছে স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর, কিন্তু অংশত অনেকটাই অদৃশ্য। কারণ, গুপ্ত বাসনা, নিহিত জিজ্ঞাসা, অগোচর বিচিত্র ভবিষ্যৎ এবং বিস্মৃত বিবিধ অতীতও প্রত্যেকের 'আমি'-কে অবলম্বন করে আছে। রবীন্দ্রনাথের একটি গানে আছে—

জানি তোমার অজানা নাহি গো কী আছে আমার মনে,
আমি গোপন করিতে চাহি গো ধরা পড়ে দুনয়নে।

সংসারে সবই সরে সরে যায়। কতো বিপরীত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, বিস্ময়, আকর্ষণ, আসক্তির নায়ক সেই 'আমি'। এই নায়কের সাধ-আহ্লাদ আছে, কর্মবাসনা আছে, কর্তৃত্বও আছে। সে সুখ চায়, দুঃখ পরিহার করবার দিকেই তার আগ্রহ। বাসনার জোরেই সে বেঁচে থাকে। এবং একথাও সুবিদিত যে বাসনা নানাবিধ। আবার, বাসনা আছে, কিন্তু চূড়ান্ত লক্ষ্যটি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত জ্ঞান নেই,—এই রকম সংকট ঘটে থাকে মানুষের জীবনে। যে-মুহূর্তে এই সংকট তীব্রভাবে আমাদের চৈতন্যে ধরা পড়ে, সেই মুহূর্তেই আত্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই। শ্রীঅরবিন্দের বিষয়ে পূর্বোক্ত নিবন্ধে রমেশচন্দ্র আরো লেখেন—"১৮৯৩ সালের ৭ আগষ্ট তারিখে 'পুরানো দীপের পরিবর্তে নূতন দীপ' (New Lamps for Old) শীর্ষক প্রবন্ধের আরম্ভ এইরূপ: যদি এক অন্ধ আর এক অন্ধকে পরিচালিত করে—তবে উভয়েই গর্তে পড়িবে—এই প্রবচনটি ভারতের জাতীয়-কংগ্রেস সম্বন্ধে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।" শ্রীঅরবিন্দ সুদূর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দেই ভারতের রাজনৈতিক কর্ম ও নেতৃত্বের এই অভাবের দিকটি অনুভব করেছিলেন এবং দ্ব্যর্থহীন ভাবে তা প্রকাশ করে গেছেন।

রাজনীতির ক্ষেত্রেও প্রকৃত স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রতিলক্ষ্য রেখে তিনি মানুষের বর্তমান চেতনা অতিক্রম করে যোগ-প্রভাবে অতিমানস বা বিজ্ঞানলোকে পৌঁছোবার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে গেছেন। তাঁর প্রথম জীবনের প্রস্তুতি-প্রসঙ্গ অতঃপর ডঃ করন সিং-এর কথায় দেখা যাক—

"It will be recalled that his father was strict in his desire that Sri Aurobindo should remain free from any Indian influence. Nevertheless, it is evident that his medical career in India had led to a sad disillusionment with the British. In fact he began sending his sons cuttings from *The Bengalee* newspaper in which he marked passages relating to cases of maltreatment and insult of Indians by Englishmen. In his letters he denounced the British Government in India as a heartless Government, and it seems that these communications for the first time drew Sri Aurobindo's attention and interest towards Indian politics. This interest gradually crystallized into the idea of working for the liberation of his country to which he still was, for all practical purposes, a stranger. When he went to Cambridge he came into contact there with an organization known as the Indian Majlis founded in 1891. He took an active part in the activities of the Majlis, of which he also became Secretary." পাদটীকায় এই সূত্রেই করন সিং লেখেন যে, কেম্ব্রিজ-মজলিশের সেকালের কার্যবিবরণী বহু অনুসন্ধানেও তিনি খুঁজে পাননি "This Society still exists, but enquiries revealed that unfortunately 'no minutes or records are available for the period when Sri Aurobindo was associated with it." সে যাই হোক, তাঁর কথায়—"Along with several other hot-blooded young men he participated in its debates, and it seems that he delivered several speeches against British imperialism that can only be described as revolutionary. Some of the more enthusiastic young Indians at Cambridge formed a secret society romantically called 'The Lotus and Dagger' which Sri Aurobindo joined along with his brothers. Each member vowed to work for the liberation of India generally and also to take upon himself some special work to further that end. Sri

Aurobindo testifies that this society was still-born, but it is nevertheless a significant incident when viewed in the context of his later contacts with secret terroristic societies in India. This much is clear ; while yet at Cambridge Aurobindo had become imbued with deep patriotic fervour and a desire to dedicate himself to the libaration of his country from foreign rule. At that time of course his inspiration was exclusively European. It is very likely that he was influenced by Mazzini's *Risorgimento.* He was certainly influenced by the Irish patriotic movement that was at the time in full action. This is evident not only from his later writings when he returned to India, but also from his early poems written when he was in England."[১০] এই সূত্রেই তিনি উল্লেখ করেন যে, ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে আয়ার্লাণ্ডের প্রসিদ্ধ জাতীয় নেতা চার্লস স্টুয়ার্ট পার্নেল তিরোহিত হন এবং শ্রীঅরবিন্দ সেই প্রয়াত পার্নেল সম্বন্ধে একটি কবিতা লেখেন- 'O pale and guiding light, now star unsphered' ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গেই 'Hic Jacet' কবিতাটিও স্মরণ করা যেতে পারে চব্বিশ ছত্রের যে কবিতার শেষ তিন ছত্রে পাওয়া যায়—

Beneath this stone
He lies : this guerdon only Ireland gave,
A broken heart and an unhonoured grave.

এ ছাড়া ১৮৯৬-এর অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ কবিতা 'Lines on Ireland' স্মরণীয়। আবার এই আদিপর্বের স্বল্লায়তন কবিতাগুলির মধ্যেই 'Bankim Chandra Chatterji', 'Saraswati with the Lotus', 'Madhusudan Dutt' প্রভৃতিও গণ্য। ইউরোপে বাসের সময়ে ইউরোপের স্বাধীনতাযোদ্ধা বীরের কাহিনী বা বীরত্বের ঘটনা যেমন তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণা হিসেবে কোনো কোনে ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিল, দেশে ফিরে তেমনি তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের মহিমা,

মধুসূদনের কৃতিত্ব ইত্যাদির প্রতি কবিতায় শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। ১৮৯০--৯২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা তাঁর আর একটি ছোটো কবিতা গ্যেটে ( Goethe ) এই সূত্রে উল্লেখযোগ্য। ডঃ করন সিং-এর সেই বিশেষ মন্তব্যটি যা তিনি পূর্বোক্ত 'Hic gacet—Glasnevin Cemetery' কবিতা থেকে আয়ার্লাণ্ডের দেশ-প্রেমিকদের উদ্দেশে নিবেদিত শ্রীঅরবিন্দের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করে দেখিয়েছেন, সেই ছত্রগুলি এবং আলোচকের সেই মন্তব্য দুই-ই দেখা দরকার—

Patriots, behold you guerdon. This man found
Erin, his mother, bleeding, chastised, bound,
Naked to imputation, poor, denied,
While alien masters held her house of pride.
And now behold her terrible and fair
With the eternal ivy in her hair,
Armed with the clamorous thunder, how she stands.

'এরিন' হোলো আয়ার্লাণ্ডের কাব্যিক নাম। ডঃ করন সিং লেখেন—"These lines graphically presage his future sorrow at seeing India bound and bleeding under the heel of alien rulers, and his vision of her regeneration and emancipation—sentiments which over a decade later he expressed with unparalleled eloquence in the pages of the **Bande Mataram** and the **Karmayogin.**"

**৪**

আমাদের জাতীয় জীবনে শ্রীঅরবিন্দের তিরোধানের পরে, মোটামুটি উনিশ শ'ষাটের দশক থেকেই ব্যাপকভাবে অনিশ্চয়তা ও মূল্যজ্ঞানহীনতার সংকট দেখা দিয়েছে। আমাদের সমাজে এখন পরিবর্তনের প্রবল স্রোত বইছে। অনেকেই বিষণ্ণ হয়ে আছি। পুরোনো আশ্রয় অতি দ্রুত গতিতে নিরন্তর ভেঙ্গে যাচ্ছে! আগে অন্নচিন্তা না কি আগে আত্মজ্ঞান? সংশয়ে, হতাশায় বিমুখ হয়ে আছে মন।

এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ আকাশ থেকে আমাদের মধ্যে তীব্র কোনোরকম ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নেমে আসবে মনে করা বাতুলতা। আমাদের অভ্যস্ত সংস্কার, পরিচিত লোকাচার ইত্যাদির চাপে সমাজের বিভিন্ন স্তরে যে অবস্থান সয়ে গিয়েছিল, সেই ভাবটাই এখন ভেঙ্গে গেছে। যাঁরা আস্তিক, তাঁরা ক্ষীণভাবে বলছেন—ভগবান

যা ঘটাচ্ছেন, তা তো মানতেই হবে। কেউ কেউ জিগেশ করছেন—সবটাই কি ভগবানের কাজ? ভগবানের সঙ্গে শয়তানের লড়াই চলছে বোধ হয়! সংশয়ে, নৈরাশ্যে, অবসাদে—চেতনার জ্বরবিকারে ভুগছে মানুষ। মানুষের মন যেন চিরকালের কুরুক্ষেত্র। এ লড়াই চলছে, চলবে। তবু তো শান্তি চাই, আশ্রয় চাই,—সংঘর্ষের নিবৃত্তি না হোক, ধর্তব্য কোনো ধ্রুবের বোধ তো অবশ্যই চাই। কিন্তু নির্বিচার ইন্দ্রিয়বাসনার জগৎ থেকে ধ্রুবকে কি ধরা যায়? রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের একটি কবিতা মনে পড়ে—

ওরে মন তুই চিন্তার টানে
বাঁধিস নে আপনারে
এই বিশ্বের সুদূর ভাসানে
অনায়াসে ভেসে যা রে।

অর্থাৎ কবির মন দিয়ে দেখা যেতো যদি, তাহলে সকলেই বলতে পারতেন যে, অধ্রুবই ধ্রুব—এবং তাতেই সান্ত্বনা পেতেন। শ্রীঅরবিন্দের সেই ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বোক্ত রচনাগুলি সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র লেখেন—"এই প্রবন্ধে এবং পরবর্তী কয়েকটি প্রবন্ধে তিনি প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন—(১) আমাদের প্রধান শত্রু ইংরেজ বা বাহিরের কোন শক্তি নহে—আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, স্বার্থপরতা, ভণ্ডামি ও ভাবপ্রবণতাই আমাদের প্রকৃত শত্রু। (২) ইংরেজ জাতি বা গভর্ণমেণ্টের নিকট ভিক্ষা বা আবেদনপত্র না পাঠাইয়া আমাদের নিজেদের মধ্যে ঐক্য ও মনুষ্যত্বের বিকাশ করাই আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য হওয়া উচিত। (৩) সুতরাং আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য জনসাধারণকে জাতীয় ভাবে প্রবুদ্ধ করা। (৪) কংগ্রেসের মুষ্টিমেয় শিক্ষিত লোক বৎসরে একবার তিনদিনের জন্য মিলিত হইয়া বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণের উপর কোনই প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। (৫) ভারতের 'জাতীয়' কংগ্রেস জনসাধারণের প্রতিনিধি নহে, সুতরাং জাতীয়তার দাবী করিতে পারে না।"

জীবন-যন্ত্রণার কথা কে না জানেন? ব্যক্তি ও গোষ্ঠী উভয় ক্ষেত্রেই অনেকরকম আদর্শের মোহভঙ্গ মানুষকে নিপীড়িত করে থাকে। দেশপ্রেম, জাতীয়তা, স্বাধীনতা, সাম্রাজ্য ইত্যাদি আদর্শের মধ্য দিয়ে মানুষের গোষ্ঠীবাস প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এর কোনোটিই সার্থকতা সন্ধানের শেষ কথা নয়। পথ খুঁজতে-খুঁজতেই পথের লক্ষ্যও বদলে যাচ্ছে। বিজ্ঞান, দর্শন, অর্থনীতি আমাদের পথ বদলে দিচ্ছে

বারবার। সাধারণ গৃহস্থ যাঁরা, তাঁরা স্ত্রীপুত্র-পরিজনাদির সঙ্গসুখে বিভোর হয়ে থাকেন। জীবনের অজস্র যন্ত্রণা ভোগ করবার জোর পেয়ে থাকেন সেই সুখ থেকেই। কিন্তু সে-জোরও চিরস্থায়ী নয়। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে—"গৃহস্থেরা সমাজমধ্যে সম্মানলাভ করিয়া যে স্ত্রীপুত্রাদিরূপ বিষয় দ্বারা ভোগী হইব বলিয়া স্থির করে, অচিরাৎ সেই সমুদয় হইতেই বিনষ্ট হয়। ঐ সমুদয় গৃহস্থের মধ্যে যে সকল বুদ্ধিমান ব্রহ্মবাদী ব্যক্তি শুভকর্মের কামনা করিয়া নিষিদ্ধ ও কাম্য কর্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারা চিরকাল অসীম সুখ সম্ভোগ করিয়া থাকেন। পীড়া এবং স্ত্রী পুত্র ও ধনাদিনাশ নিবন্ধ ঐ সকল মহাত্মার অন্তঃকরণে ঘোরতর নির্বেদ উপস্থিত হয়। ঐ নির্বেদ হইতে আত্মজ্ঞান, আত্মজ্ঞান হইতে শাস্ত্রদর্শন ও শাস্ত্রদর্শন হইতে তপস্যায় প্রবৃত্তি হইয়া থাকে।"[১১] 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাধারা লক্ষ্য করে —রমেশচন্দ্রের কথায়—"কংগ্রেস নেতারা বিচলিত হইয়া কেবল প্রতিবাদ করেন নাই—'ইন্দুপ্রকাশের' সম্পাদকের উপর চাপ দিয়া যাহাতে ঐ কাগজে অরবিন্দের লেখা আর বাহির না হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন।" কিন্তু যে সাতটি প্রবন্ধ বেরিয়ে গিয়েছিল, তাতেই কংগ্রেসের মধ্যে নরমপন্থী ও চরমপন্থী, এই দুই দলের উদ্ভব ঘটে যায়। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম থেকেই চরমপন্থী 'তপস্যা' জোর পায়। ১৮৯৮-এ দীনেন্দ্রকুমার রায় তাঁর বাংলা শিক্ষক হবার আগেই ১৮৯৪-এ তিনি 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ পূর্বোক্ত নিবন্ধগুলি লেখেন এবং সেই ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দেই বোম্বাইয়ে মাধব গোবিন্দ রানাডে তাঁকে আধ ঘণ্টার সাক্ষাতে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কিছু না লিখে বরং কারা-সংস্কার বা ঐরকম কোনো বিষয়ে লিখতে পরামর্শ দেন। বলা বাহুল্য,অরবিন্দ তাতে তাঁর তপস্যা ত্যাগ করেন নি। তপস্যা আত্মস্থ থাকবার পথ। পুরাণে দেখা যায় সুখ,দুঃখ, লোভ, বাসনা, নৃত্যগীতে অনুরাগ, বন্ধুস্নেহ ইত্যাদিতে নির্লিপ্ত হয়েছিলেন ব্যাসের পুত্র শুকদেব। কিন্তু তখনো তাঁর সংশয় ছিল। তাঁর পিতা ব্যাসদেব তাঁকে রাজর্ষি জনকের কাছে যেতে বলেন। জনক তাঁর সংশয় দূর করেন। শুকদেবের মন অনেকটা প্রস্তুত ছিল বলেই তা সম্ভব হয়। অরবিন্দও—আগেই বারবার বলা হয়েছে, ১৯১০-এর মধ্যেই বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে প্রস্তুত হয়ে ওঠেন। ১৯০৯-এর জুন মাসে ইংরেজি 'কর্মযোগীন্' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত তাঁর প্রসিদ্ধ 'Uttarpara Speech'-এ তিনি ভারতীয় নেশনের উদ্দেশ্যে বলেন যে, এক বছর আগে দেশব্যাপী যে বন্দেমাতরম্ ধ্বনির জয়োল্লাস ছিল, সেই বিজয়ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে গেছে বটে, কিন্তু যে পরমেশ্বর উৎফুল্লতা দিয়েছিলেন,

১১। কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

তিনিই তো শুভ্রতা দিয়েছেন!—অতএব কোনো খেদ নেই। বক্সার জেলে বন্দীজীবনে বিপিনচন্দ্র পাল যেমন ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছিলেন, আলিপুর জেলে তিনিও সেইরকম আদেশ পান। সে আদেশ সনাতন ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা পালনের আদেশ—ঋষি, সন্ত, অবতার প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে ধর্ম জেগে আছে, তাকে জাগিয়ে রাখা এবং তার যোগ্য কর্মানুষ্ঠান চাই।—"It is for the dharma and by the dharma that India exists."। কোনো সংকীর্ণ, সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়,—চাই সনাতন ধর্মে নিষ্ঠা। এই ছিল তাঁর অর্জিত আত্মজ্ঞান।

মহাভারতের শান্তিপর্বে শুকদেবের এই রকম আত্মজ্ঞানলাভ ও সংশয়মুক্তির বর্ণনা আছে। মিথিলা নগরে প্রবেশের পরে রোদে দাঁড়িয়ে থেকে দ্বারপালদের তিরস্কারেও তিনি ব্যথিত হননি, আবার 'নিবিড়নিতম্বিনী, সূক্ষ্মরক্তাম্বরধারিণী, উজ্জ্বল-স্বর্ণালঙ্কারভূষিতা, আলাপকুশলা, নৃত্যগীতে সুনিপুণা, হৃদয়জ্ঞা পঞ্চাশটি সুন্দরীর সেবাতেও তিনি আকৃষ্ট হন নি। সেই বোধই যদি 'সুখ' হয়, তাহলে 'সুখ' কথাটার মানে দাঁড়ায় যাকে আমরা সচরাচর 'সুখ' বলি তাও যেমন, তার বিপরীত যা তাও,—মানে দুইই! আলিপুর জেলের মধ্যেই অরবিন্দ চোর-ডাকাত ও তথাকথিত 'ছোটলোক'দের নতুন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাতে তাঁর মনের দৃষ্টি-সামর্থ্যই বেড়ে যায়। তাঁর রাজনীতিচিন্তা মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ, মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা, চূড়ান্ত প্রজাতন্ত্রবাদ ইত্যাদির সঙ্গে জড়িত এবং সেই আলোচনাসূত্রেই তপস্যা, চেতনার রূপান্তর প্রভৃতি কথা তাঁর লেখার মধ্যে বারবার দেখা দেয়। মানুষের মনের সীমা সম্বন্ধে রাজনীতিক্ষেত্রেও তাঁর নিজের চিন্তা যথাসাধ্য দেখে নেওয়া দরকার। পুরানি-সংকলিত 'Evening Talks with Sri Aurobindo' দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৩।৪।১৯২৩ তারিখের গুরু-শিষ্য সংলাপের মধ্যে দেখা যায় যে, বরোদায় বাসের সময়েই নিস্তব্ধ ব্রহ্মচেতনা (Silent Brahman Consciousness) তাঁর মধ্যে দেখা দেয়। সে ছিল সুরাট-কংগ্রেস [১৯০৭] থেকে ফেরার পরের ব্যাপার। তখন যোগী লেলে মহারাজ এসেছিলেন তাঁর কাছে। পরে বোম্বাইয়ে ঘটে তাঁর 'Vedantic experience'। তিনি নিজে বলে গেছেন যে, ভেতরের কোনো এক মানসাধিক শক্তির বলেই 'বন্দেমাতরম্', 'কর্মযোগীন' ও 'আর্য' পত্রিকার লেখাগুলি তিনি লিখেছিলেন। মন, যুক্তি, বুদ্ধি ইত্যাদিকে তিনি বলেছেন 'very crude।' কিন্তু সেই মনকেও তিনি অগ্রাহ্য করতে বলেননি। উপস্থিত আলোচনার প্রথম খণ্ডে ৪, ৫, ৬, ২৪, ৩৬ ইত্যাদি অধ্যায়ে 'মন'

সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে; দ্বিতীয় খণ্ডেও অন্যান্য কথার সঙ্গে পুনরায় মনের কথা উঠলো। এই প্রসঙ্গটি অপরিহার্য। রাজনীতিচিন্তার কথান্তরে মনের রূপান্তর ঘটিয়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে একথা স্মরণীয় যে. রবীন্দ্রনাথও তাঁর 'মানুষের ধর্ম' ও অন্যান্য নানা নিবন্ধে মানুষের পূর্ণতা লাভের সাধনার কথা লিখে গেছেন এবং রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি আমাদের বারবার মনোযোগী হতে জানিয়েছেন। মানব-বিশ্বের জনভার, অস্ত্রভার ও বিদ্বেষভার যতোই বাড়ছে, আমাদের চারদিকে নৈরাশ্যের তমিস্রাও ততোই বাড়ছে। বুদ্ধ, খ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি অবতার বা অবতারকল্প ব্যক্তিদের কেবল নামসংকীর্তনের জোরে স্বার্থান্ধ মানুষের জ বনে সত্যি কী-ই বা হবে? বিবেকানন্দ যে প্র্যাকটিকাল-বেদান্তের দীক্ষা দিয়ে গেছেন, সেই বেদান্তের সঙ্গে গান্ধীজীর প্র্যাকটিকাল বৈষ্ণবতার গুণগত ভেদ কোথায়? এসব প্রশ্ন প্রত্যেকের স্বগতোক্তি এখন—যা আমাদের মনে-মনে উচ্চারিত না হয়ে পারে না। চালাকির দ্বারা সত্যিই মহৎ কর্ম হয় না। সততার চেয়ে সত্যিই অধিক বলশালী কেউ নেই। এসব উপলব্ধিই তো কালের প্রবাহে আজকের মানুষের পুনরপি আত্মনিরীক্ষা।

৫

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের কথায়—শ্রীঅরবিন্দ "নানা স্থানে নানাভাবে বলিয়াছেন যে এক অদৃশ্য ঐশী শক্তির দ্বারা আমাদের রাজনীতি পরিচালিত হইতেছে এবং বয়কট বা অন্য নীতির দ্বারা সাময়িক সুবিধা বা উপকার হইলেও ভগবানের অদৃশ্য শক্তিই আমাদের রক্ষা করিবে—ইহা কেবল বুদ্ধির দ্বারা বিচার করিয়া নয়, হৃদয়ের অনুভূতি দিয়া বুঝিতে হইবে। আমাদের রাজনীতি একটি ধর্ম—জাতির অর্থাৎ ভারতের ত্রিশকোটি লোকের মধ্যেই ভগবানকে উপলব্ধি করিতে হইবে। স্বামী বিবেকানন্দ ব্যতীত এরূপ উচ্চ আদর্শ, এইরূপ মহান আদর্শ আর কেহ প্রচার করেন নাই।"

এই কথাগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। মানুষের রূপান্তর ঘটাতে হবে—একথা অনেকেই বলেছেন। রাজনীতি যদি এই উন্নয়নমুখী রূপান্তর উপেক্ষা ক'রে চলতে থাকে, তাহলে সে-রাজনীতির তুচ্ছতা ধরা পড়বেই। তাই মানবপ্রবৃত্তির বাস্তবতা মেনে নিয়ে, যাঁরা রাজনীতি ও আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গ একযোগে ভাবেন, তাঁরা 'বিলুপ্তি' আর 'রূপান্তর'—এই দুটি শব্দ নিয়ে অবশ্যই চিন্তা করেন ও করবেন। এই প্রসঙ্গও কিঞ্চিৎ আলোচনা দাবি করে। অতএব তা দেখা যাক্।

প্রথম খণ্ডের ২৫, ২৮, ৩৬ প্রভৃতি অধ্যায়ে এ-প্রসঙ্গ আলোচিত হলেও এখানে একই প্রসঙ্গ আর এক ভাবে পুনরায় দেখা যেতে পারে। আসল প্রশ্ন হোলো—প্রবৃত্তির বিলুপ্তি ঘটাতে হবে—নাকি রূপান্তর—কোন্‌টা বাস্তবভাবে কাম্য, কোন্‌টা সাধ্য? এই মর্ত্য জীবনের নানান্ সুখ-দুঃখের ঢেউ খেতে-খেতে সমস্ত ভাবুক মানুষই এই প্রশ্নের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য হন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে কাশীর দুর্গাবাড়ির কাছে নানকপন্থীর মঠে রামকৃষ্ণদেব এক মোহন্তের প্রভাব দেখেছিলেন। 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতে'র চতুর্থ ভাগে ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বরের আলাপে সে-প্রসঙ্গ আছে। সেখান থেকে এই কয়েক ছত্র তুলে দেখা যাক—

"ন্যাঙটা (তোতাপুরী) বল্‌লে, কোন রাজা সোনার থালা সোনার গেলাস দিয়ে সাধুদের খাওয়ালে। কাশীতে মঠে দেখ্‌লাম মোহন্তর কত মান—বড় বড় খোট্টারা হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে আছে, আর বলছে কি আজ্ঞা!

"ঠিক ঠিক সাধু ঠিক ঠিক ত্যাগী সোনার থালও চায় না, মানও চায় না। তবে ঈশ্বর তাদের কোন অভাব রাখেন না। তাঁকে পেতে গেলে যা যা দরকার সব যোগাড় করে দেন।

"আপনি হাকিম—কি বোল্‌বো!—যা ভালো বোঝো তাই ক'রো। আমি মূর্খ।"

এই কাহিনী শুনতে-শুনতে হাকিম অধর বলেছিলেন—'উনি আমাকে একজামিন করছেন।' অন্যান্য ভক্তেরা ছিলেন। তাঁরাও শুনেছিলেন। রামকৃষ্ণদেব অধরের কথা শুনে হাসতে হাসতে বলেন—"নিবৃত্তিই ভালো। ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু।"

কিন্তু প্রথম ধাপেই পুরো 'অবস্তু' ব'লে নিজের জীবণধার, সংসার ও জীবমন তো অস্বীকার করা চলে না। বরং আস্তে আস্তে রূপান্তরণের দিকে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। হাজরা-কে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন—"আপনার ভিতর আপনাকে দেখতে পেলে ত সব হয়ে গেল। ঐটি দেখতে পাবার জন্যই সাধনা। আর ঐ সাধনার জন্যই শরীর। যতক্ষণ না স্বর্ণপ্রতিমা ঢালাই হয়, ততক্ষণ মাটির ছাঁচের দরকার হয়। প্রতিমা হয়ে গেলে মাটির ছাঁচটা ফেলে দেওয়া যায়। ঈশ্বরদর্শন হলে শরীর ত্যাগ করা যায়।" অরবিন্দের রাজনীতি-ভাবনা এবং তাঁর রাজনৈতিক কর্মানুষ্ঠান তো তাঁর ব্যক্তিত্বের কোনো খণ্ডিত দিক নয়। তাঁর অখণ্ড সত্তার সঙ্গে সে দিকটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত বলেই এইসব দৃষ্টান্ত ভাবতে হয়।

মানুষের বহু হাজার বছরের অভিজ্ঞতায় কতো বেদ-বেদান্ত, কতো রামায়ণ-মহাভারত ঘটে গেল। শুক্লযজুর্বেদে সেই পরম-কে বলা হয়েছিল—তুমি আমাদের পিতা, তোমাকে আমরা যেন পিতা বলেই বোধ করি। তুমি মঙ্গল স্বরূপ—'নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ'। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বহুশ্রুত উক্তি রবীন্দ্রনাথের অনুবাদে পাই—

যিনি অগ্নিতে যিনি জলে,
যিনি সকল ভুবনতলে
যিনি বৃক্ষে যিনি শস্যে,
তাঁহারে নমস্কার—
তাঁরে নমি নমি বার বার।

এই নমস্কার হোলো ভয়-ভক্তি-শ্রদ্ধার অভিব্যক্তি। ঈষৎ আকস্মিক মনে হলেও এই সূত্রেই অন্যান্য কথা জেগে ওঠে। বাউল, সূফী ইত্যাদি ভাবধারায় 'মনের মানুষ' ও সকলের মধ্যে 'এক'-এর অনুভব উচ্চারিত হয়েছে। জীবকে বিনাশ থেকে রক্ষার জন্যে দয়াময়কে বারবার ডাকা হয়েছে। ঋগ্বেদে এরকম অংশের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ থেকে এই অংশটি লক্ষণীয়—

হে বরুণদেব
মানুষ আমরা দেবতার কাছে
যদি থাকি পাপ করে,
লঙ্ঘন করি তোমার ধর্ম
যদি অজ্ঞান ঘোরে—
ক্ষমা কোরো তবে, ক্ষমা কোরো হে,
বিনাশ কোরো না মোরে।

অথর্ববেদের ৬।৮।৩ অংশের অনুবাদে সেই রবীন্দ্রনাথই লেখেন—

আকাশ-ধরা রবিরে ঘেরি
যেমন করি ফেরে,
আমার মন ঘিরিবে ফিরি
তোমার হৃদয়েরে।

'আমিত্ব' বা ব্যক্তিমনের অহংভাব কি বিনাপ্রয়াসে দূর হয়? আমরা যাকে 'ভালবাসা', 'মমতা', 'প্রেম' ইত্যাদি বলে থাকি, সেও অনেকটাই আমিত্বের বাঁধা নয় কি? অজ্ঞানে হলেও আমরা অনেকেই এক্ষেত্রে জন্মঅভিনেতা!

'আমত্ব'-ত্যাগের অভিনয়ে অনেকেই পটু। কিন্তু সে তো অভিনয় মাত্র, সে তো যথার্থ রূপান্তরণ নয়। আবার রামকৃষ্ণদেবের কথা মনে পড়ে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৪-এ ডিসেম্বরের আলাপ-লিপিতে কথামৃতের মধ্যেই পাই সে-কথা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ যা বলেছিলেন, শ্রীম সেই কথাই লিখে গেছেন—"একজন বহুরূপী সেজেছে 'ত্যাগী সাধু'। সাজটি ঠিক হয়েছে দেখে বাবুরা একটি টাকা দিতে গেল। সে নিলেনা, উঁহু করে চলে গেল। গা হাত-পা ধুয়ে যখন সহজ বেশে এলো, তখন বল্লে, 'টাকা দাও'। বাবুরা বললে, এই তুমি টাকা নেবে না বলে চলে গেলে আবার টাকা চাইছ?' সে বল্লে, 'তখন সাধু সেজেছি টাকা নিতে নাই।'

অবতারতত্ত্বের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে রামকৃষ্ণদেব এই উদাহরণটি দেন। তিনি বলেন—'তেমনি ঈশ্বর যখন মানুষ হন, ঠিক মানুষের মত ব্যবহার করেন।"

তের-চোদ্দ বছর বিলেতে কাটিয়ে শ্রীঅরবিন্দ যখন বোম্বাইয়ের অ্যাপলো বন্দরে দেশের মাটিতে পা দেন, তখন থেকেই তাঁর অলৌকিক অনুভূতি দেখা দেয়। ১৯৫৮ তে প্রকাশিত 'On Yoga II' তে তিনি লেখেন —"My own life and my yoga have always been, since my coming to India both this-wordly and other-worldly without any exclusiveness on either side" এই ঐহিক ও বাস্তব জীবনস্বীকৃতির দিকটি কিছুতেই ভোলা উচিত নয়। ভারতের তথাকথিত শিক্ষিত-শ্রেণীর জনজীবন সম্বন্ধে উদাসীনতা তিনি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন। ডঃ শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের কথায়—"Returning to India, he found to his chagrin that the so-called "educated" classes were desperately trying to ape the foreighner in almost everything. Our educational machinery, our ruling ideas, our imported models, all were shoddy in appearance and poisonous in their effects." 'The ideal of Karmayogin' বইটিতে 'The Awakening Soul in India' নিবন্ধে তিনি যে গীতার আদর্শ অনুসারে স্বধর্ম পালনই শ্রেষ্ঠ পথ লিখে গেছেন, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তা এইসূত্রে দেখিয়ে দেন।

৬

বঙ্কিমের সমসাময়িক রমেশচন্দ্র দত্ত পরিবারেরই এক সন্তান ছিলেন উপেন্দ্রকৃষ্ণ দত্ত (১৮৫৭-১৯৩৯)। তাঁর সন্তান—যার মা ছিলেন এক সুইডিশ মহিলা, সেই

রজনীপাম দত্ত 'মডার্ন ইণ্ডিয়া', 'ফ্যাসিজ্‌ম্‌ অ্যাণ্ড সোশ্যাল রেভোলিউশন', 'ওয়ার্লড্‌ পলিটিক্‌স্‌', 'ব্রিটেন ইন দি ওয়ার্লড্‌ ফ্রন্ট', 'ইণ্ডিয়া টু-ডে' প্রভৃতি বই লিখে গেছেন—যে-বইগুলিতে ভারত ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য, গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। শেষোক্ত বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইংলণ্ডে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে, পরে তার পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৯৪৭-এ প্রকাশিত হয় বোম্বাইয়ের 'পিপ্‌ল্‌স্‌' পাবলিশিং হাউস' থেকে। সেই বইয়ের চতুর্থ অধ্যায়ে 'দি সিক্রেট অফ ইণ্ডিয়ান পভার্টি' শিরোনামে ১৮৩৪-এ বাংলার এক তরুণ সিভিলিয়নের তিন সর্গের 'ভারত' সম্পর্কিত কবিতার এই ছত্রগুলি তুলে দেওয়া হয়—

"There yet remains a class, the general one,
Which has no merit, and preterds to none ,
Good easy folk who know that eels are eels,
But never pause to think how skinning feels,
Content to know that eels are made to flay,
And Indians formed by destiny to pay——
And hence when they become the great and high,
There is no word they hate so much as—Why ?

[ "India" : A Poem in Three Cantos. By a Young Civilian of Bengal. London, 1834. ]

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শোষণ ও পীড়নের নির্ভরযোগ্য তথ্য না জেনে কেবলমাত্র উনিশ শতকের শেষার্ধ থেকে বিশ শতকের প্রথমার্ধের শেষ দিকে স্বাধীনতা-লাভ পর্যন্ত শ'খানেক বছরের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতির টুক্‌রো-টুক্‌রো খবরে নজর দিলে আসল দুর্গতির পরিস্থিতি-পরিচিতি কি সম্ভব? রজনীপাম দত্ত 'Imperial Gazetteer of India'-র সম্পাদক স্যার উইলিয়ম হাণ্টারের ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের উক্তি তুলে দেখান যে, অসংখ্য মহাফেজখানা থেকে সেসব তথ্য সংগ্রহ করা কোনো একক ব্যক্তিপ্রয়াসের বা ব্যক্তিগত ব্যয়সামর্থ্যের সাধ্য নয়। তিনি এবং আরো অনেকেই এইরকম মন্তব্য করেছেন। আমাদের জাতীয় কংগ্রেসের পত্তন বা তার আগে সিপাহী-যুদ্ধ ইত্যাদির উল্লেখ তো বিজ্ঞানসম্মত কোনো ইতিহাস-সন্ধানের ঘটনা নয়। ইংরেজ ভারতবর্ষকে যে কী পরিমাণে ধ্বংস করেছে, উদ্ধৃত কবিতাংশে তার কিঞ্চিৎ যন্ত্রণাবোধ পাওয়া যায়

বটে। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কার্ল মার্ক্‌স্‌-ই প্রথম এঙ্গেল্‌সের সঙ্গে কিছু চিঠিপত্রের মধ্যে—১৮৫৩-তে 'ন্যু-ইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন'-এ তাঁর আটটি নিবন্ধে এবং তাঁর বিখ্যাত 'Capital'-বইয়ে ভারতীয় সংকটের কথা লেখেন। রজনীপাম দত্তের কথায়—"We are only concerned with the past in order to bring to light the dynamic forces which still live in the present The first to bring this dynamic approach to Indian history, to turn the floodlight of scientific method on to the social driving forces of Indian development both before and after British rule, and lay bare alike the destructive role of British rule in India and its regenerative revolutionising significance for the future, was the founder of modern socialism, Karl Marx."

বিশেষত ভারত ও চীনের ওপর য়ুরোপের ধনতান্ত্রিক শক্তির আলোচনা করেন মার্ক্‌স্‌। ব্রিটিশ শাসন যে পল্লীপ্রাণ ভারতের জনজীবনের মূল কাঠামো ভেঙে দিয়েছিল, কার্ল মার্ক্‌স্‌ তা বহু প্রবন্ধে দেখিয়ে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দের আয়ুকাল সে-দুর্যোগের অনেক পরের পর্ব। ১৮১৩ পর্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আদিপর্ব এবং ১৮১৩র পরের পর্ব—এই দুই পর্বের প্রকৃতিভেদ, অর্থাৎ কোম্পানির একচেটিয়া শোষণ থেকে সেই একনায়কত্বের পরিবর্তন পর্যন্ত ঘটনাগুলির মূল কথা দেখিয়ে মার্ক্‌স্‌ ভারতের জনজীবনের প্রতি ইংরেজের দেওয়া বিষাদ বা 'melancholy'র স্বরূপ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করেন। রজনীপাম দত্ত (R. Palme Dutt) কথাসূত্রে E. Thompson and G. T. Garratt এর 'Rise and Fulfilment of British Rule in India (১৯৩৪) বই থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করে, ইংরেজ শাসনের হিংস্রতা ও নীচতার দিকগুলি স্মরণ করিয়ে দেন। তিনি কার্ল মার্ক্‌স্‌কেই ব্রিটিশের ভারত-পীড়নের প্রথম সমালোচক বলেন। ভারতের আদিম সমাজ-ব্যবস্থাতে যে সাম্যবাদী লক্ষণ তাঁর নজরে পড়েছিল, পাশ্চাত্ত্য জগতের মতন কেন তা ক্রমে ভূসম্পত্তিবান সামন্ততন্ত্রে পর্যবসিত হয়নি, সেসব বিষয়ে মার্ক্‌স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌-এর চিঠিপত্র উল্লেখ করেন তিনি। 'ক্যাপিটাল' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের চতুর্দশ অধ্যায়ে ভারতীয় পল্লীব্যবস্থার চিত্র আছে। 'নিউইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন' পত্রিকায় ১৮৫৩-র ২৫-এ জুন 'দি ব্রিটিশ রুল ইন ইণ্ডিয়া' নিবন্ধে মার্ক্‌স্‌ দেখান যে, ব্রিটিশ শক্তি ভারতের ধ্বংস ঘটাতেই

নিযুক্ত ছিল,-গঠনের দিক থেকে ব্রিটিশের দান নেতিবাচক। সারা আঠারোর শতকে ব্যাপক লুটপাট ঘটিয়ে, ভারত থেকে মূল্যবান জিনিসপত্র ইংলণ্ডে সরিয়ে, শোষণের চূড়ান্ত হয়েছে। আবার, পূর্বশাসনব্যবস্থায় ভারতের নিজস্ব যে ভূমিসেচ-প্রথা ইত্যাদি জনকল্যাণকর ব্যবস্থা ছিল, সেসব অবহেলা করা হয়েছে। তৃতীয়ত ভারতে ইংরেজি রীতি অনুযায়ী ভূমিসত্ব চালু করা,—ব্যক্তিগত সম্পত্তি-ঘটিত ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর ইত্যাদির প্রশ্রয়,—ইংরেজি প্রথার দণ্ডবিধি প্রবর্তন—এবং চতুর্থত প্রথমে ইংলণ্ডে, পরে সারা য়ুরোপে ভারতীয় শিল্পোপকরণ-সামগ্রীর আমদানী-কর সম্পূর্ণ রহিত করার ব্যবস্থা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো ধূলিসাৎ করে। তারপর আসে উনিশ শতকের চূড়ান্ত ধনতন্ত্রী পীড়ন। ১১ই জুলাই ১৮৫৩ তারিখে পূর্বোক্ত 'নিউ-ইয়র্ক ডেইলী ট্রিবিউন'-এ প্রকাশিত মার্ক্স্-এর 'East India Company, Its History and Outcome' থেকে এই ছত্রগুলি রজনীপাম দত্তের পূর্বোক্ত বই থেকে তুলে দেওয়া হোলো—"The true commencemet of the East India Company cannot be dated from a more remote epoch than the year 1702, when the different societies, claiming the monopoly of the East India trade, united together in one single company. Till then the very existence of the original East India Company was repeatedly endangered, once suspended for years under the protectorate of Cromwell, and once threatened with utter dissolution by Parliamentary interference under the reign of William III.

"It was under the ascendancy of that Dutch Prince, when the Whigs became the farmers of the revenues of the British Empire, when the Bank of England sprang into life when the protective system was formally established in England, and the Balance of Power in Europe was definitely settled, that the existence of an East India Company was recognised by Parliament. That era of apparent liberty was in reality the era of monopolies, not created by Royal Grants, as in the times of Elizabeth and Charles I, but

authorised and nationalised by the sanotion of Parliament."

১৮১৮ থেকে ১৮৩৬-এর মধ্যে গ্রেট ব্রিটেন থেকে ভারতে সুতা রপ্তানি কয়েক সহস্র গুণ বেড়ে যায়। ভারতে ব্রিটিশ মসলিন-রপ্তানী অভাবিত পরিমাণে বাড়ে। ঢাকার জনসংখ্যা কমে যায় ১৫০,০০০ থেকে মাত্র বিশ হাজারে। 'ক্যাপিটাল'-এর প্রথম খণ্ডের পনেরোর অধ্যায়ে মার্ক্‌স্‌-এর উক্তি—"The English cotton machinery produced an acute effect in India. The Governor-General reported in 1834-5: 'The misery hardly finds a parallel in the history of commerce. The bones of the cotton-weavers are bleaching the plains of India." ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন তারিখে এঙ্গেল্‌স্‌-কে লেখা এক চিঠিতে ভারতে ব্রিটিশ অর্থনীতি সম্বন্ধে মার্ক্‌স্‌ লেখেন যে, সে-অর্থনীতির প্রকৃতি ছিল শূকরোপম—'swinish'!

শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর আগে স্বামী বিবেকানন্দ যখন ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশার প্রসঙ্গ নানাভাবে ভেবেছেন এবং আলোচনা করেছেন, সেসবের পূর্বপটে ব্রিটিশ শাসন-শোষণ সম্বন্ধে কার্ল মার্কসের এই আলোচনা কিছুতেই ভোলা যায় না। আবার এও ভোলা যায়না যে 'অতিমানস', 'অধিমানস' ইত্যাদি শব্দ-মায়ার বিভ্রান্তিজাল সৃষ্টি করাই তো শ্রীঅরবিন্দের উদ্দেশ্য নয়। তিনি ভারতের পূর্ব-ইতিহাস বিস্মৃত হননি, শুধু মনকে নির্লিপ্ততায় অধিষ্ঠিত রেখে উত্তরণের পথে চালিত করার যোগসাধনাই বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর রাজনীতি তাঁর ধর্মের সঙ্গেই অচ্ছেদ্য-ভাবে জড়িত। কার্ল মার্ক্‌স্‌ ভারতের জনজীবনের বিষাদ বা 'melancholy'র ওপর জোর দেন। ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতেই এই বিষাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন তিনি। শ্রীঅরবিন্দ তমস্‌ ও বিষাদ থেকে সারা দুনিয়ার মানবমনের নিষ্ক্রমণের পথ দেখান। জগতের নানা ধর্মমতে এই নিষ্ক্রমণপন্থার বিভিন্নতার ইঙ্গিত আছে। কার্ল মার্ক্‌স্‌-এর পথ আর শ্রীঅরবিন্দের প্রদর্শিত পথ পৃথক বটে, কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা প্রত্যেকেই আপন আপন উপলব্ধি অনুসারে মেনেছেন। বেদ-বেদান্ত-গীতা-মহাভারতের প্রসঙ্গ দেখা দেয় শ্রীঅরবিন্দের চিন্তায়। তিনি পুরুষোত্তমের অভিপ্রায়ী!

১৯৬১-তে ছাপা 'A Handbook of Sri Aurobindo's Yoga' বইয়ের লেখক T. D. Chatterjee সেই বইয়ের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় তখনকার বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র লেখেন যে, যোলোটি

অধ্যায়ে প্রবাহিত সেই বইটি তৎকালাবধি প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের যোগ সম্বন্ধে ছিল সর্বাধিক সামগ্রিক রচনা। মহাযানী বৌদ্ধ মতে বিশ্বব্যাপী মানব-মোক্ষের ওপর যে জোর দেওয়া হয়, শিশিরকুমার শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণযোগে পতঞ্জলির, তন্ত্রমতের, হঠযোগীদের ও অন্যান্য যাবতীয় যোগাদর্শের সমন্বয়ী আদর্শে সেই মহাযান যোগপন্থা ও যোগলক্ষ্যের মিলের দিকটি দেখিয়ে জানান যে, অরবিন্দযোগ আরো ব্যাপক—শুধু প্রত্যেক ব্যক্তির ও সমগ্র মানবজাতিরই নয়,—সারা বিশ্বের নির্বাণ মাত্র নয়,—শ্রীঅরবিন্দ দিব্যতায় উত্তরণের কথাই জানিয়ে গেছেন। 'নির্বাণ' নয়; দিব্যতা-ই লক্ষ্য। তান্ত্রিকদের মতন শুধু ভেতরের সত্তার উদ্ভাসনের ওপরেই নয়, ওপর থেকে আত্মিক ও অতিমানসিক দ্যুতির অবতরণের দিকটিতেও তিনি জোর দেন। এই অবতরণের ধারণা তিনি গীতা থেকে নিলেও গীতাতে যেমন বিশেষ পরিস্থিতিতে ধর্মের গ্লানি-ঘটিত গ্রন্থিমোচনের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকৃত, অরবিন্দ নিজে তৎপরিবর্তে তাঁর পৃথক এই উপলব্ধি ব্যক্ত করেন যে, বিবর্তনের প্রবাহে প্রত্যেক স্তরেই—জড় থেকে প্রাণে,—প্রাণ থেকে মনে,—এবং তদূর্ধ্বে দিব্যশক্তির অবতরণ ঘটছেই। গীতা-তেও যোগ-প্রসঙ্গ আছে বটে, কিন্তু অরবিন্দমতে যোগ শুধু ঈশ্বরের সঙ্গে সংযোগ বা মিলন নয়, ব্যক্তিসত্তার কোনোরকম 'লয়' নয়, ব্যক্তিবোধের পূর্ণ সংরক্ষণ সত্ত্বেও ঐশী অবস্থায় উত্তরণই লক্ষ্য। অন্যান্য যোগপন্থায় যা নেই, শ্রীঅরবিন্দযোগের লক্ষ্য হোলো তাই—শুধু মানুষের নয়, সমস্ত বিশ্বের দিব্যতাতে রূপান্তরণ। এতে কিছুই বর্জনীয় নয়, সবই রূপান্তরিত করবার আয়োজন। এইসূত্রে শিশিরকুমার দার্শনিক আলেকজাণ্ডারের প্রসঙ্গ তুলে বলেন যে, আলেকজাণ্ডারের সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের ধারণার বেশ কিছু সাদৃশ্য থাকলেও বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, তিনি দেখিয়েছেন নিম্নপ্রবৃত্তির বিলুপ্তি ঘটিয়েই উর্ধ্বতর চেতনার জাগরণ সম্ভব। পক্ষান্তরে, শ্রীঅরবিন্দ নিম্নপ্রবৃত্তির যোগ্য রূপান্তরণের পথেই উর্ধ্বচেতনাতে অভ্যুদয়ে আস্থাশীল।

৭

পুরুষোত্তমই উপাস্য। কিন্তু উত্তম হওয়া কঠিন বইকি। গান্ধীজী আততায়ীর গুলিতে নিহত হবার পরে জর্জ বার্ণার্ড শ বলেছিলেন—অতিশয় উত্তম হওয়া বড়োই বিপজ্জনক। এই আলোচনার প্রথম খণ্ডের ৯ সংখ্যক অধ্যায়ে দেখা গেছে যে, ভারতের আধ্যাত্মিকতাকেই শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন 'ভারত-শক্তি'। প্রথম খণ্ডের

৩০ সংখ্যক অধ্যায়ও এই সূত্রে স্মরণীয়। এবং এই দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ পৃষ্ঠায় পুরানি-র যে মন্তব্যটি ছাপার ভুলে অর্থহীন হয়ে গেছে, সেটির শুদ্ধ রূপ এখানে অবশ্যই স্মরণীয়—"Sri Aurobindo is neither an impotent moralist nor a weak pacifist."

'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ ( 'স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা', নবম খণ্ড ) শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর প্রশ্ন মনে পড়ে, স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জিগেস করেন—"মহাশয় ঠাকুর যে পূর্ণব্রহ্ম ভগবান, একথা তিনি আপনাকে নিজ মুখে কখনও বলিয়াছিলেন কি?" বিবেকানন্দ বলেন—"কতবার বলেছেন। আমাদের সবাইকে বলেছেন। তিনি যখন কাশীপুরের বাগানে—যখন তাঁর শরীর যায় তখন আমি তাঁর বিছানার পাশে একদিন মনে মনে ভাবছি এই সময়ে যদি বলতে পারো 'আমি ভগবান' তবে বিশ্বাস করব—তুমি সত্য সত্যই ভগবান। তখন শরীর যাবার দুদিন মাত্র বাকি। ঠাকুর তখন হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললেন, 'যে রাম, যে কৃষ্ণ—সেই ইদানীং এ শরীরে রামকৃষ্ণ, তোর বেদান্তের দিক থেকে নয়।' আমি শুনে অবাক হয়ে রইলুম।"

৮

এসব কথার পরেও সংশয়ের সম্পূর্ণ নিরসন ঘটে কি? শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী জিগেস করেছিলেন সে-কথা। বিবেকানন্দ বলেছিলেন—"দুর্যোধনও বিশ্বরূপ দেখেছিল, অর্জুনও দেখেছিল। অর্জুনের বিশ্বাস হল, দুর্যোধন ভেল্কিবাজি ভাবলে। তিনি না বুঝালে কিছু 'বলবার বা বুঝাবার জো নেই।...সার কথা হচ্ছে,—তাঁর কৃপা; তবে লেগে থাকতে হবে, তবে তাঁর কৃপা হবে।"

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে—এই কৃপার কি কোনো নিয়ম আছে? স্বামীজী বলেছিলেন—'হ্যাঁ বটে, নাও বটে।' রামকৃষ্ণদেবের নিজের মন্তব্য শুনিয়েছিলেন তিনি—ঠাকুর কখনও বলতেন, 'তাঁর প্রতি নির্ভর কর্।—ঝড়ের এঁটো পাতা হয়ে যা'; আবার কখনও বলতেন, 'তাঁর কৃপাবাতাস তো বইছেই, তুই পাল তুলে দে না।' এই কথার ধারাতেই বেদান্তসূত্র থেকে স্বামীজী বলেন—'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং'—'কৃপাটা হচ্ছে তাঁর খেয়াল'—'এই জগৎসৃষ্টিটাই তাঁর খেয়াল!'

অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ—এই পঞ্চতত্ত্বের সমন্বয়েই আমাদের ব্যক্তি-

সত্তা। আত্মা বা বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে যুক্ত আছে মানুষমাত্রেরই সেই ব্যক্তিবোধ। কিন্তু পঞ্চেন্দ্রিয় ও মনের অধিকারী জীবসত্তা নিজের অনন্ত সংযোগ নিজেই জানেনা। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ —ব্যক্তির এই সব যন্ত্র ও তার ইন্দ্রিয়-অবলম্বনগুলি বিজ্ঞান বা বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। মন, প্রাণ, শরীর—এদের অন্বিত করে সেই বিজ্ঞান বা বুদ্ধি। কিন্তু আসল আশ্রয়ের আশ্রয় হোলো আত্মা—যার নামান্তর——অনাদি অশেষ বিশ্বচৈতন্য। এদিকে দৃশ্যমান এই শরীরেরই একদিকে স্থূলদেহ, অন্যদিকে সূক্ষ্মদেহ। সূক্ষ্ম শরীরে মন ও প্রাণ,—আবার কারণ-শরীরে বুদ্ধি বা বিজ্ঞান। এই বিভিন্ন শব্দের প্রয়োগ সকলেই জানেন। কিন্তু এই ধরনের নাম-জ্ঞান, শ্রেণী-ভাবনা ইত্যাদির চর্চায় কি আত্মলাভ ঘটে? যাকে 'অহং' বলা হয়, তার স্মৃতিশক্তি আছে; সেই স্মৃতিসূত্রে সে নিজের বিচিত্র অভিজ্ঞতা গ্রথিত করে রাখে, কিন্তু সব কথা কি মনে রাখা যায়? অনেক ঘটনা ডুবে থাকে মগ্নচৈতন্যে। জীবমানব শুধু দেহ-মন প্রাণের অস্থির সমষ্টিমাত্র নয়। অনন্ত বিশ্বচৈতন্যের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সম্পর্ক কীরকম, সে-বিষয়ে দার্শনিকরা নানাভাবে ভেবেছেন,—শঙ্করাচার্যের মতে জীবাত্মা-পরমাত্মা অদ্বৈত; রামানুজের মতে জীবাত্মা নিত্য স্বতন্ত্র হয়েও পরমাত্মার সঙ্গে নিত্য অভেদ; মধ্বাচার্য বলেন, পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার প্রভেদ নিত্যস্থায়ী; সাংখ্যদর্শনে জীবাত্মার অসংখ্যতা স্বীকৃত; উপনিষদেও ব্যক্তিসত্তার অজস্রতা অস্বীকার করা হয়নি। তবে, বিশ্বচৈতন্য বা সমগ্রতা থেকে যখন আমরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন বা অনন্বিত ভাবি, সেখানেই অবিদ্যার খেলা চলছে। অহংকার তার লক্ষণ। যদি বলা হয় পরমের নাম 'ঈশ্বর', তাহলে সেই ঐশী বুদ্ধির দ্বারা নিজের বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত হতে দেবার পথ চিনে নেওয়া এবং সেই পথে এগিয়ে যাওয়াই হবে আমাদের যথার্থ নৈতিক ও পারমার্থিক গতিপথ। সে-বিষয়ে আমাদের সংকল্পের স্বাধীনতা আছে,—আমরা জড়পদার্থ বা নিম্নজীবের মতন অবস্থার দাস মাত্র নই।

৯

মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ফ্রয়েড, অ্যাডলার, ইয়ুং, অটো র‍্যাঙ্ক—আধুনিক কালের প্রসিদ্ধ ব্যক্তি এঁরা। মনের কথা বলতে-বলতে অ্যাড্‌লার এবং ইয়ুং ব্যক্তিমনের অতিশায়ী ক্ষেত্রে এগিয়ে গেছেন যেন। ইয়ুং-এর একখানি বইয়ের নাম—'মডার্ন ম্যান ইন সার্চ অফ এ সোল'। অটো র‍্যাঙ্কের একটি বই হোলো—'সাইকলজি অ্যাণ্ড দি সোল'। সজ্ঞান মন আর গভীর মন—এই ভেদের দিকটিও বিবেচ্য। 'ডেপ্‌থ্‌

সাইকলজি', 'কলেকটিভ আন্‌কন্‌শাস্‌' ইত্যাদি শব্দগুলিও পরিচিত এখন। যদি দ্বিতীয়টির বঙ্গানুবাদ হিশেবে 'সামগ্রিক নির্জ্ঞান' প্রযোগটি মেনে নেওয়া যায়, তাহলে ব্যাপারটি ইয়ুং-এর উদ্ভাবনাব দিক থেকে এইভাবে সূচিত করা চলে যে, তিনি 'ব্যক্তিগত নির্জ্ঞান' আর 'সামগ্রিক নির্জ্ঞান',—নির্জ্ঞানেব এই দুটি বিভাগ মেনে নিয়েছেন। ব্যক্তিমনের প্রথম তলে আছে সজ্ঞান স্তর—তার নীচে ব্যক্তিগত নির্জ্ঞানের স্তর,—তারও নীচে আছে সামগ্রিক-নির্জ্ঞান। কিন্তু স্তরেব কল্পনাটা ইয়ুং-এর পছন্দ হয়নি শেষ পর্যন্ত। সব স্তব মিলিযে মনেব অখণ্ড ঐক্যের কথাটাই প্রধান। থাক্‌ সেসব কথা। মনস্তত্ত্ব, সাহিত্য, ধর্ম, ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ এসে যায় অরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তার ক্রমবিকাশেব নানা কথা-সূত্রেই। এখানে সেটাই প্রধান কথা। সাহিত্যেও মনের তত্ত্ব নানাভাবে ভাবা হয়েছে। সে সব ভাবনা অল্পবিস্তর সকলেবই পরিচিত। লেখকবা বলেন, মনেব কি আর সীমা আছে? আবার, 'আত্মজ্ঞান' কথাটা মনকেও ছাডিযে যাবাব ইঙ্গিত। মন যেটুকু ধারণার পাত্র, আমাদের সত্তা কি সেইটুকুতেই আবদ্ধ? 'নৈবেদ্য' বইযের একটি কবিতায় (৮০ সংখ্যক) রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—

হে অনন্ত, যেথা তুমি ধারণা অতীত
সেথা হতে আনন্দের অব্যক্ত সংগীত
ঝরিযা পডিছে নামি, অদৃশ্য অগম
হিমাদ্রিশিখর হতে জাহ্নবীর সম।

ধারণা-অতীত ক্ষেত্র থেকে ধাবণা-যোগ্য আনন্দ আসছে, কবির এই উপলব্ধি আমাদের মতন সাধারণ মানুষেব কাছে 'শোনা কথা' মাত্র। তবু 'আত্মজ্ঞান' সম্বন্ধে যাঁরা জিজ্ঞাসু, এসব ভাবনা তাঁবা এড়িযে চলতে পারেন না। গোচরে-অগোচরে সারা জীবনই আমাদের প্রত্যেকের জীবনেই আত্মজ্ঞানেব সাধনা চলেছে।

সাধু-সন্ন্যাসীরা প্রায় সকলেই নিবৃত্তির কথা বলে থাকেন। কিন্তু নিবৃত্তি কি সহজ কথা? চিত্তবিক্ষেপকারী ইন্দ্রিয়ের তাডনা কি তুচ্ছ ব্যাপার? ভীরুর পক্ষে, স্বার্থপরের পক্ষে নিবৃত্তি অসম্ভব। ভীরুতা থেকে পরিত্রাণ,—সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি—ধর্মভ্রষ্টতা থেকে সনাতন ধর্মে আশ্রয়—এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের আত্মনিরীক্ষার সে-পর্বের ফল। যাঁরা তাঁকে বিপ্লবপন্থা থেকে 'পলাতক' বলেন, সেই আত্মসন্তুষ্ট স্ববুদ্ধিমুগ্ধ ব্যক্তিদেব জন্যেই ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের এই কথাগুলি এখানে তুলে দেওয়া হোলো—"শ্রীঅরবিন্দ একখানি পত্রে তাঁহার স্ত্রীকে লিখিয়া-

ছিলেন : ‘যদি একটা রাক্ষস মায়ের রক্তপানে উদ্যত হয় তাহা হইলে সন্তান কি করে ? নিশ্চিন্ত মনে আহার করিতে বসে, স্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আহ্লাদ করিতে বসে, না মাকে রক্ষা করিতে যায় ?’ এই আদর্শ অরবিন্দ অক্ষরে অক্ষরে নিজে পালন করিলেন।” রমেশচন্দ্রের ঐ নিবন্ধেই অতঃপর আছে—“১৯০৪ সনে শ্রীঅরবিন্দ তিলকের সঙ্গে দেখা করিলেন এবং কংগ্রেস যাহাতে নূতন কার্যপদ্ধতি অর্থাৎ সক্রিয় প্রতিরোধ অবলম্বন করে তাহার জন্য চেষ্টা করিতে অনুরোধ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে “ভবানীমন্দির” ও “No compromise” নামে এক প্রচারপত্র সহ কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকে বাংলায় পাঠাইলেন। ১৯০৫ সনে অরবিন্দ নিজে বাংলায় আসিলেন এবং ‘বন্দেমাতরম্’ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সংগ্রামে প্রস্তুত হইবার জন্য দেশবাসীকে আহ্বান করিবার প্রস্তাব নেতাদের সম্মুখে উপস্থিত করিলেন। ‘সঞ্জীবনী’ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র তাঁহার মেসোমহাশয় ছিলেন—তাঁহার মারফৎ সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করিলেন এবং কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে প্রস্তাব করিলেন যে যদি জনমত অগ্রাহ্য করিয়া ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট বঙ্গবিভাগ করে তবে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ (Passive Resistance), অসহযোগ, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, সরকারী বিদ্যালয়সমূহ বর্জন, এবং স্বদেশী গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই পরে সম্পূর্ণ আকারে প্রচারিত Doctrine of Passive Resistance মতবাদের প্রথম সূচনা।” এ কিন্তু আরো পরের পর্বে গান্ধীজীর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ এবং অসহযোগ নয়। এ বিষয়ে বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষই পথ-প্রদর্শক।

১০

গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন—যাঁরা আমার অনন্যভক্ত, তাঁরাই হন ইন্দ্রিয়-বিজয়ী। গভীর প্রশ্নের সরল উত্তর এটি। এরই সঙ্গে পাওয়া যায় সরল বিশ্লেষণ—বিষয়-চিন্তার ফলে মানুষ বিষয়ে আসক্ত হয়, আসক্তি বা কামনা প্রতিহত হলে ক্রোধ দেখা দেয়, ক্রোধ থেকে মোহ জন্মায়,—মোহ থেকে স্মৃতিভ্রংশ,—স্মৃতিভ্রংশ থেকে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধিনাশের ফলে সর্বনাশ ঘটে। প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে অরবিন্দ যোগ-সাধনায় সরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাকে বুদ্ধিনাশের উদাহরণ বলা ধৃষ্টতা, মূঢ়তা, ছোটো মুখে বড়ো কথা মাত্র! যে মমতাবোধ আমাদের ব্যবহারিক জগতের বুদ্ধির সঙ্গে জড়িত, পুরোপুরি সেই মমতাকেই

মেনে নিয়ে 'আত্মজ্ঞানী' হওয়া সম্ভব নয়। বুদ্ধিমার্গের মুস্কিল এইখানেই। পথটা কতকটা দেখা যাচ্ছে বটে, কিন্তু ত্যাগের শক্তি নেই, তাই ঐ পথ ধরবারও উপায় নেই। গুরু, আচরণ, সতর্কতা এবং তৃষ্ণা—এই চারটির মধ্যে চতুর্থটিই সর্বাগ্রে আবশ্যক। সেই তৃষ্ণাবশেই ভারতীয় ঐতিহ্য, বিশ্বের পরিস্থিতি এবং দেশের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সর্বদা সজাগ ছিলেন তিনি।

গীতা সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দ নিজেও নানা নিবন্ধ লিখেছেন। সে-প্রসঙ্গ এই আলোচনার প্রথম খণ্ডেও কিছু কিছু উল্লেখ করা হয়েছে। নিবৃত্তির চেষ্টা ও মনুষ্যত্বের সাধনা নীরস নয়। এই পথ শুষ্কতার পথ বলে আশঙ্কা হয়। কিন্তু যথার্থ সত্য-সাধক যাঁরা, তাঁরাই বলতে পারেন এই পথের সরসতার তত্ত্ব। শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতির পথেও শুষ্কতা ছিল না। বাইরে থেকে যতোটুকু আমরা দেখতে পাই, তাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে কি শুকনো মানুষ বলে মনে হয়? প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নামে শ্যামপুকুরের এক গৃহী ভক্তকে তিনি বলেছিলেন— "আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী। তিনি যেমন করান, তেমনি করি। যেমন বলান, তেমনি বলি।" তিনি আরো বলেছিলেন গানে গানে—

প্রসাদ বলে ভবসাগরে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলা
জোয়ার এলে উড়িয়ে যাবো, ভাঁটিয়ে যাবো ভাঁটার বেলা।

তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতেই তাঁর আর একটি কথা ছিল: তাঁতী বললে—রামের ইচ্ছায় ডাকাতি হোলো, রামের ইচ্ছায় আমাকে পুলিশে ধরলে,—আবার রামের ইচ্ছায় ছেড়ে দিলে।

মহেন্দ্র মুখুজ্যে জিগেশ করেছিলেন—লোকে কেন যোগভ্রষ্ট হয়?

তার উত্তরে তিনি বলেন—'পূর্বজন্মে ঈশ্বরচিন্তা করতে হয়ত হঠাৎ ভোগ করবার লালসা হয়েছে। এরূপ হলে যোগভ্রষ্ট হয়।'

ডেপুটি অধর বলেছিলেন—শ্রীচৈতন্যও ভোগ করেছিলেন।

বিস্মিত হয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ জিগেশ করেন—'কি ভোগ করেছিলেন?'

অধর বলেন—কত পণ্ডিত। কত মান।

শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিয়ে বলেন—'অন্যের পক্ষে মান। তাঁর পক্ষে কিছু নয়।'

নবদ্বীপ গোস্বামীকে তিনি বলেন—শাস্ত্রের সার জেনে নিতে হয়। তারপর আর গ্রন্থের কি দরকার। সারটুকু জেনে ডুব মারতে হয়—ঈশ্বর লাভের জন্য। আমায় মা জানিয়ে দিয়েছেন বেদান্তের সার—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা।

বলেছিলেন — গীতার সার মানে—হে জীব, সব ত্যাগ করে ভগবানকে পাবার জন্য সাধনা কর।

তা কি সম্ভব?

তাঁর জীবনই তো তাই।

অল্প বয়সেই সেই আত্মজ্ঞানের উপলব্ধি ঘটেছিল শ্রীঅরবিন্দের জীবনে। সেকথা অনেকেই লিখেছেন এবং এই আলোচনার প্রথম খণ্ডেও তা বলা হয়েছে। 'শ্রীঅরবিন্দ জীবন ও যোগ' গ্রন্থের (তৃতীয় সংস্করণ: জুলাই, ১৯২১) চতুর্থ অধ্যায়ের সূচনাতেই প্রমোদকুমার সেন লেখেন—"শ্রীঅরবিন্দ সাত বৎসর বয়সে বিলাতে যান, এগার বছর বয়সের আগেই তিনি উপলব্ধি করেন যে, অদূর ভবিষ্যতে একটা বিরাট আলোড়ন হইবে এবং অভূতপূর্ব পরিবর্তন ঘটিবে, যাহাকে বিশ্ববিপ্লব বলা যায় এবং তাহাতে বিশেষভাবে তাঁহাকে অনেক কিছু করিতে হইবে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াই তিনি তাঁহার শিক্ষাদীক্ষা নিয়ন্ত্রণ করেন।" তিনি আরো লেখেন—"১৯১৪ হইতে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত 'আর্য্যে' তাঁহার যে লেখাগুলি বাহির হয় তাহার সহিত যাঁহারই কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তিনিই উপলব্ধি করিবেন শ্রীঅরবিন্দের দৃষ্টি কি ব্যাপক ও গভীর।" ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আই. সি এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সুভাষচন্দ্র বসু প্রকাশ্যভাবে সে চাকরি পরিত্যাগ করেন; অরবিন্দ সেভাবে তা পরিত্যাগ করেন নি, তার কারণ, প্রমোদকুমারের মতে— "প্রথমত, তখনকার দিনে ওরূপ প্রকাশ্যভাবে একক কাহারও দাঁড়ান একান্ত অবিমৃষ্যকারিতা হইত, দ্বিতীয়ত, শ্রীঅরবিন্দ তাঁহার নিজের কোন বিষয় প্রচার করিতে পরাঙ্মুখ। তাহার উপর তিনি গূঢ় কারণ প্রকাশ্যে বিবৃত করিলে আত্মীয়-বর্গ তাঁহার উপর একান্ত নারাজ হইতেন।"[১২]

প্রমোদকুমারের আর একটি মন্তব্য—"যে কালে শ্রীঅরবিন্দ বিলাতে ছিলেন তাহা ইংরাজ ইতিহাসের একটা বিশেষ পর্ব। ঐকালেই গ্ল্যাডস্টোন তাঁহার উদার নীতির জন্য জগতের প্রশংসাভাজন হন। শাসনতন্ত্রে জনকর্তৃত্ব ব্যাপকতা লাভ করে, বহু লোক নির্বাচন-অধিকার লাভ করে। রাজার কর্তৃত্ব একেবারে হ্রাস পাইয়া পার্লামেণ্টেই একদল সর্বেসর্বা হয়। আইরিশ জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম নূতন রূপ ধারণ করে। পার্নেলের নাম চারদিকে ছড়াইয়া পড়ে। গবর্ণমেণ্ট

জনসাধারণের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়। মজুরদিগের অবস্থার উন্নতি-প্রচেষ্টা স্বরু হয়। শ্রীঅরবিন্দ যখন বিলাতে, কার্ল মার্কস পরলোক গমন করেন। মার্কসের প্রচারের ফলেই পাশ্চাত্ত্যের সকল দেশেই মজুর-জীবনের পরিবর্তন ঘটিতে আরম্ভ হয় ”[১৩]

১১

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। মানুষের পৃথিবী ক্রমেই আরো ব্যক্তিকেন্দ্রিক, জাতিকেন্দ্রিক ও সম্প্রদায়কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। অনুন্নত দেশগুলিতে লোকসংখ্যা প্রবল হারে বাড়ছে। ভারতের উপস্থিত সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিমণ্ডল ভয়াবহ। আমরা মহাপুরুষদের নিয়ে যতোই অহংকার করি, জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশেরই অসুখ এখন। সেই অসুখের অন্যতম প্রধান লক্ষণ দেখা যাচ্ছে স্বার্থপরতা। হিংসা না অহিংসা,—অপ্রেম না প্রেম,—মানুষের প্রবৃত্তি-পরায়ণাতেই মানুষের চূড়ান্তসমাপ্তি, নাকি তা থেকে উত্তরণ সম্ভব?—কোন্ দিকে আমাদের গতি এখন? বর্তমানের দুর্যোগ ও সংশয়াচ্ছন্নতা কাটবে কি?

শ্রীঅরবিন্দের কালেই বটে, কিন্তু কিছু পরে দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে গান্ধীজীর অভ্যুদয় ঘটেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিজ্ঞানী আইনস্টাইন যে অস্ত্র ধারণের বিরুদ্ধে আবেদন জানান, ১৯৩১-এর ৩১এ ডিসেম্বরের 'ইয়ং-ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় গান্ধীজী তা উল্লেখ ক'রে লেখেন—"আইনস্টাইন ঐ পথটা আমার কাছ থেকে চুরি করেছেন।" —এবং—"বিষয়টাকে যদি বিশদভাবে ব্যাখ্যা করতে বলা হয়, সেক্ষেত্রে আমি বলবো, সামরিক চাকুরী প্রত্যাখ্যান করাটাই সব নয়।" তাহলে সত্যিই কোন্ পথে কী ভাবে এগুতে হবে? গান্ধীজী বলেছিলেন, সর্বপ্রকারে হিংসার সঙ্গে যোগ বর্জন করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গের 'গান্ধী শতবার্ষিকী সমিতি' কর্তৃক প্রকাশিত 'গান্ধী-রচনাসম্ভার'-এর তৃতীয় খণ্ডে ১১৬ পৃষ্ঠায় এই বঙ্গানুবাদ পাওয়া যাবে। ১২০ পৃষ্ঠায় দেখা যায় ৮ ৮ ৪২ তারিখে নিখিল-ভারত-কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রদত্ত তাঁর ভাষণের বঙ্গানুবাদ—"আমি যখন জেলে ছিলাম, তখন আমি কার্লাইলের ফরাসী বিপ্লব পড়েছি। পণ্ডিত জওহরলাল আমাকে রুশ বিপ্লবের কথাও কিছু কিছু বলেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস যেহেতু এই সংগ্রামগুলি পরিচালিত হয়েছে হিংসাত্মক অস্ত্র দ্বারা সেই হেতু এর দ্বারা গণতান্ত্রিক আদর্শ ব্যর্থ হযেছে। আমি যে গণতন্ত্রের কথা

---

১৩। তদেব, পৃঃ ৩৬ ৩৭ দ্রষ্ট

ভেবেছি তা প্রতিষ্ঠিত হবে অহিংস উপায়ে। সেই গণতন্ত্রে প্রতিটি মানুষের সমান স্বাধীনতা থাকবে। প্রত্যেকেই হবে তার নিজের প্রভু। এই ধরনের গণতন্ত্র অর্জনের সংগ্রামেই আমি আপনাদের আহ্বান জানাচ্ছি। এই গণতান্ত্রিক আদর্শের কথা যদি আপনারা উপলব্ধি করতে পারেন তবে দেখবেন আপনারা আর নিজেদের হিন্দু বা মুসলমান ব.ল ভাবতে পারছেন না, দেখবেন আপনারা নিজেদের সর্বজনীন স্বাধীনতা-সংগ্রামে ব্যাপৃত ভারতীয় বলে ভাবছেন।" সাধারণ মানুষের কাছে গান্ধীজীর এই 'সর্বজনীন স্বাধীনতা' শ্রীঅরবিন্দের 'বিশ্বজনীন দিব্যতার' মতোই স্বপ্নবৎ মনে হয় না কি ?

শ্রীঅরবিন্দ যে দিব্যজীবনের কথা লিখেছেন তা তাঁর দেশবাসীর মনে এবং বিশ্ব-মানবের মনে ছড়িয়ে পড়তে সময় লাগা স্বাভাবিক। তাঁর 'পূর্ণযোগ' সাধারণ মানুষের কাছে সহজে বোধগম্য নয় বলে যদি কোনো পক্ষ অভিযোগ করেন, তাহলে এই প্রশ্নও করা যেতে পারে যে, গান্ধীজীর মৃত্যুর বহুদিন পরে আজও কি আমরা তাঁর 'স্বাধীনতা', 'গণতন্ত্র', 'অহিংসা' ইত্যাদি সত্যিই মানতে পেরেছি ? নাকি, মুখে যাই বলি, কার্যত সে-সব বাতিল করেছি ? তিনি জনযুদ্ধের সৈনিক ছিলেন এবং যেরোড়া জেলে যাবার সময়ে সঙ্গে পাঁচখানি বই নিয়ে গিয়েছিলেন। সেই বইগুলি হোলো ভগবদ্গীতা, আশ্রম-ভজনাবলী, রামায়ণ, কোরাণের রডওয়েল-কৃত অনুবাদ ও গিরিপ্রবচন। জেলের বিচিত্র সব অপরাধের কথাও তিনি লিখে গেছেন। জেলে তাঁকে পর্বে পর্বে জীবনের অনেকটাই কাটাতে হয়েছে। জেলের বাইরেও তিনি যে জীবন ভোগ করে গেছেন, সেখানে নারীর প্রতি যথার্থ মর্যাদা জাগিয়ে তোলা, দেশের দীন-দরিদ্র সর্বসাধারণের নৈতিক মান উন্নয়নের সংগ্রাম চালানো, শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা ও শিক্ষার বিস্তার ঘটানো ইত্যাদি বিষয়ে তিনি অনেক কথা লিখেছেন, অনেক চেষ্টাও করেছেন। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এবং তার আগে গোল-টেবিল-বৈঠকে তিনি নিপীড়িত শ্রেণীর জন্যে পৃথক নির্বাচনের ঘোর বিরোধিতাও করেছেন। সার স্যামুয়েল হোর, র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড্ প্রভৃতিকে লেখা তাঁর ১৯৩২-এর চিঠিগুলিতে সে সব প্রসঙ্গ আছে।

শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তিনি সাধনার কথা-প্রসঙ্গে লিখে গেছেন—নিখুঁৎ শোধনই হোলো জাতির নিখুঁৎ সিদ্ধির পথ। স্বামী বিবেকানন্দও বলে গেছেন - মানুষের সেবা করো, মানুষকে ঈশ্বর মনে করো।—গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাও,—শিববোধে জীবের সেবা করো। আমরা কি কথায় এবং কাজে উভয় ক্ষেত্রেই সমভাবে সেসব নির্দেশ পালন করতে পেরেছি ?

১২

শ্রীঅরবিন্দকে যাঁরা রাজনীতি থেকে 'পলাতক' বলেছেন, তাঁদের অন্যতম হলেন লোকান্তরিত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। বিপিনচন্দ্র পাল সম্বন্ধে লিখতে গিয়েই ৪ঠা কার্তিক ১৩২৮ তারিখে তিনি সে-মন্তব্য করেন।[১৪] 'জীবন-প্রসঙ্গ" [ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ ; ডি. এম্. লাইব্রেরী ] নামে বইটিতে সত্যেন্দ্রনাথের এই ছটি প্রবন্ধ ছাপা হয়—'স্বামী বিবেকানন্দ', 'স্বামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' 'স্বামী সারদানন্দ', 'বিপিনচন্দ্র পাল', 'দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন' ও 'দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন'। এই প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। 'ভূমিকা'-য় সত্যেন্দ্রনাথ জানিয়ে দেন যে, "অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জন পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়"—এবং পূর্বোক্ত 'জীবন-প্রসঙ্গ' বইয়ের অন্তর্ভুক্ত "ঐ দুইটি প্রবন্ধ ঐ পুস্তিকাদ্বয়ের অংশ বিশেষ।

স্বামী ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের [ ১৮৬১-১৯০৭ ] আসল নাম ছিল ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথের জন্মবর্ষেই ১৮৬১-র ১১ই ফেব্রুয়ারি হুগলী জেলার খন্যান গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা ছিলেন দেবীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পিতৃব্য ছিলেন রেভারেণ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। হুগলী কলিজিয়েট স্কুল থেকে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি যখন কলকাতায় জেনারেল অ্যাসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশনে এফ. এ. পড়েন, তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত ( পরে স্বামী বিবেকানন্দ ) তাঁর সহাধ্যায়ী ছিলেন। কিছুদিন তিনি শিক্ষকতা করেন। রামকৃষ্ণ পরমহংস ও কেশবচন্দ্র সেন উভয়েরই সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। ১৮৮৭-তে ৬ই জানুয়ারি তিনি 'নববিধান'-ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন। সিন্ধুর হায়দ্রাবাদে গিয়ে তিনি সেখানেও

১৪। খেলাফৎ আন্দোলন, গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলন ইত্যাদি প্রসঙ্গে উচ্চারিত। বইটির পৃঃ ৩৮-৩৯ দ্রষ্টব্য।

শিক্ষকতা করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আগে প্রোটেস্টান্ট ও পরে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান হন। ১৮৯৪-এ তিনি করাচী থেকে মাসিক 'সোফিয়া' পত্রিকা প্রকাশ করেন যেটি ১৮৯৯-এর মার্চ পর্যন্ত চলে বন্ধ হয়ে যায়। ইতিমধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের শিকাগো আন্তর্জাতিক ধর্মমহাসভায় বক্তৃতার কাছাকাছি সময়ে তিনি 'ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়' নাম গ্রহণ করেন। 'সোফিয়া' পত্রিকায় তাঁর স্বাধীন মতামত প্রকাশিত হতে দেখে ক্যাথলিক খ্রীষ্টান সম্প্রদায় সে-পত্রিকার প্রচার নিষিদ্ধ করেন। ব্রহ্মবান্ধব তখন কলকাতায় ফিরে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন থেকে সাপ্তাহিক 'সোফিয়া' প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্যাথলিকরা সেটিরও প্রচার নিষিদ্ধ করেন। এই সাপ্তাহিক 'সোফিয়া'র এক সংখ্যায় ব্রহ্মবান্ধব রবীন্দ্রনাথকে 'ওয়ার্ল্ড্ পোয়েট' বলে অভিহিত করেন। ১৯০১-এর ৩১এ জানুয়ারি তিনি নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সঙ্গে 'Twentieth Century' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০০-১৯০২-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর নৈকট্য ঘটে এবং শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় পত্তনের সময়ে ব্রহ্মবান্ধব বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে বিলেতে গিয়ে অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজে হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন তিনি। দেশে ফিরে, ১৯০৩-এ তিনি সারস্বত আয়তন বিদ্যালয় পুনর্গঠিত করেন এবং ১৯০৪-এর ১৬ই ডিসেম্বর দৈনিক 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ থেকে সাপ্তাহিক 'স্বরাজ' সম্পাদনা করেন তিনি। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে তিনি 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় ইংরেজ সংস্রব পরিত্যাগ ও ভারতের আত্মকর্তৃত্বের দাবি প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ শক্তির উষ্মার ফলে তিনি রাজদ্রোহের অপরাধে অভিযুক্ত হন এবং ১৯০৭-এর ২৭এ অক্টোবর ক্যাম্বেল হাসপাতালে এক অস্ত্রোপচারের ফলে মৃত্যুবরণ করেন।

শৈব ব্রাহ্মণ পরিবারের সন্তান দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-৮৩) আরো আগেকার মানুষ। তাঁর আসল নাম 'মূলশংকর'। তিনিও ধর্মচিন্তায় অগ্রণী এবং নানা সংস্কার-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তাঁর জন্মস্থান ছিল কাথিওয়াড়ার মোরভি শহর। সংসারে অনাসক্তি এবং ইংরেজি-শিক্ষা-বর্জিত সংস্কৃত শাস্ত্রে অসামান্য পাণ্ডিত্য তাঁর বৈশিষ্ট্য। ১৮৪৫ থেকে ১৮৬০ পর্যন্ত সারা ভারতে তিনি পর্যটন করেন; তারপর ১৮৬০ থেকে ১৮৭৫ পর্যন্ত ভারতের নানা স্থানে বৈদিক হিন্দু ধর্মের প্রচারকল্পে বক্তৃতা ও বিচার চালিয়ে ১৮৭৫-এর ১০ই এপ্রিল বোম্বাইয়ে 'আর্যসমাজ' প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে এই সমাজের গঠনতন্ত্র ও ধর্মমত পুনর্নির্ধারিত হয়। শ্রীঅরবিন্দ যে তাঁর সম্বন্ধে লিখে গেছেন, সেকথা আগেই

বলা হয়েছে। সোজাসুজি রাজনীতিতে না থাকলেও দয়ানন্দের প্রচারিত 'আর্য সমাজে'র আদর্শে উত্তর-ভারতের তখনকার চরমপন্থী স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা প্রভাবিত হন। ১৮৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে অরবিন্দ যখন শিশু,—তখন দয়ানন্দ বঙ্গভূমিতে আসেন এবং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি ব্রাহ্ম-সমাজের নেতাদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ও আলোচনা হলেও বাংলার ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গে তাঁর মতাদর্শের মিল হয়নি। অরবিন্দ পূর্বোক্ত পুস্তিকায়—তাঁর 'Bankim-Tilak-Dayananda'-তে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের নিবন্ধে দয়ানন্দ কে আমাদের 'নেশন'-বোধ জাগিয়ে দেবার অন্যতম দিক্‌পাল বলে অভিহিত করে গেছেন।[১৫]

কলকাতার 'শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির' থেকে প্রকাশিত 'শ্রীঅরবিন্দ জন্ম-শতবার্ষিকী স্মারক গ্রন্থ' ( ১৫, অগাষ্ট, ১৯২১ ) বইটিতে 'শ্রীঅরবিন্দের কর্মজীবন' নিবন্ধে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার লেখেন—"স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি কেন সশস্ত্র বিপ্লব ও এই উদ্দেশ্যে গুপ্ত বিপ্লব সমিতি প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন সেটা বোঝাবার জন্য লিখেছেন যে তিনি ইউরোপের পরাধীন জাতিরা কি উপায়ে স্বাধীনতা অর্জন করে ছিল তার বিবরণ বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়তেন; মধ্যযুগে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ফ্রান্সের এবং আধুনিক যুগে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে ইতালী ও ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আমেরিকার মুক্তিসংগ্রাম এবং বিশেষ করে ফরাসী নেত্রী জোয়ান অফ আর্ক ও ইতালীর নায়ক ম্যাৎসিনির [Mazzini] বিপ্লব-কাহিনী তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল।"[১৬] ১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তিনি তখনকার ভারতের

১৫। শ্রীঅরবিন্দ দয়ানন্দের বেদব্যাখ্যানের সমালোচকদের কথার চুল-চেরা বিচার নিষ্প্রয়োজন মনে করে এবং দয়ানন্দের মধ্যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতদের মতন তুলনাভিত্তিক ভাষাজ্ঞানের অভাব মেনে নিয়েও তাঁর বিরুদ্ধে বেদ-ব্যাখ্যানের আন্তরিকতার অভাব প্রবলভাবে অস্বীকার করেন।

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের কথা: "যে যুবকশক্তি লইয়া বাঙ্গালার স্বদেশী নেতারা খেলা করিতেছিল এবং যখন একে একে এই সমস্ত নেতারা সময় বুঝিয়া সরিয়া পড়িতেছিলেন, তখন এই রাজনৈতিক যুবক-শক্তির বেশির ভাগ রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের সেবাকর্মের পতাকাতলে আসিয়া আত্মনিয়োগ করিয়াছিল। এমন কি অগ্নকার শ্রীঅরবিন্দও পণ্ডিচেরিতে পলাইবার প্রাক্কালে ধর্ম' ও 'কর্মযোগ' পত্রিকাদ্বয়ে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বাণী ও তাহার ব্যাখ্যা জাতীয়তার আদর্শস্বরূপ প্রচার করিয়া এবং পরিশেষে উত্তরপাড়ায় রাজনীতি ক্ষেত্রে চতুর্দিকে 'বাসুদেব' দেখিয়া তবে ক্ষান্ত হন। এমন কি ব্রাহ্মনেতাগণও সময় সময় 'পৌত্তলিক' হইবার উপক্রম করিতেন। বিপিনচন্দ্রও রাজনীতি ছাড়িয়া 'স্বরাজের যে ব্যাখ্যা ছান্দোগ্য উপনিষদে অন্বেষণ করিতে গিয়াছিলেন তাহা ধর্ম না রাজনীতি এখনও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারি নাই।" রচনাকাল: ৪ঠা কার্তিক, ১৩২৮।

১৬। উল্লেখিত বইয়ের ১১৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

জাতীয় কংগ্রেসের নেতাদের এবং কংগ্রেসের আদর্শ, লক্ষ্য ও কার্যপদ্ধতির তীব্র নিন্দা করেন,—আগে যেমন বলা হয়েছে—রমেশচন্দ্র অন্যত্র, এবং এখানেও সেসব লিখেছেন। এই সূত্রেই রমেশচন্দ্র লেখেন—"অরবিন্দ কেবল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ লিখেই ক্ষান্ত হননি—যাতে কংগ্রেস পুরানো নেতাদের বদলে তিলকের নেতৃত্বে নূতন আদর্শে প্রণোদিত দেশসেবকেরা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে প্রাধান্য লাভ করেন তার জন্যও চেষ্টা করেন।[১৭] অরবিন্দ যে তিলকের সঙ্গে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দেই দেখা করেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। ইংরেজিতে 'বঙ্কিম-তিলক-দয়ানন্দ' নামে [ প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর, ১৯০৪ ; দ্বিতীয় সংস্করণ : মার্চ, ১৯৪৭ ] ৬৩, কলেজ স্ট্রীটের 'আর্য পাবলিশিং-হাউস' থেকে প্রকাশিত অরবিন্দের পুস্তিকাটিতে প্রকাশকের সংক্ষিপ্ত স্বীকৃতিতে 'গণেশ অ্যাণ্ড কোম্পানি'-কে এবং 'বেদিক ম্যাগাজিন'-এর সম্পাদককে তিলক-সম্পর্কিত নিবন্ধ—যা 'Speeches of Bal Gangadhar Tilak'-এর ভূমিকা হিসেবে ছাপা হয়,—এবং দয়ানন্দ-সম্পর্কিত নিবন্ধগুলির জন্যেও কৃতজ্ঞতা জানানো হয়। ঐ পুস্তিকায় ২০এ নভেম্বর, ১৯০৯-এর 'কর্মযোগীন্' থেকে 'বন্দেমাতরম্' গানের ইংরেজি অনুবাদ ছাপা হয়, ১৬ই এপ্রিল ১৯০৭-এর 'বন্দেমাতরম্' থেকে অরবিন্দের ইংরেজি নিবন্ধ 'Rishi Bankim Chandra'ও ছাপা হয়; ১৯১৮-র 'Speeches and Writings of Tilak'-এর ভূমিকা 'Bal Gangadhar Tilak'ও গ্রন্থভুক্ত হয়—এবং ১৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দের 'Vedic Magazine' থেকে দুটি নিবন্ধের মধ্যে 'Dayananda',—আর ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯০৯-এর 'Karmayogin' থেকে 'The Men that Pass' নিবন্ধে রমেশচন্দ্র দত্ত [ ১৮৪৮-১৯০৯ ] সম্পর্কে শেষ নিবন্ধটি এই পুস্তিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রকে 'ঋষি' বলার তাৎপর্য—তাঁর নিজের কথায়—"The Rishi is different from the saint. His life may not have been distinguished by superior holiness nor his character by an ideal beauty. He is not great by what he was himself but by what he has expressed." আধুনিক ভারত-নির্মাতাদের অন্যতম তিনি। অরবিন্দের কথায়—"The earlier Bankim was only a poet and stylist—the later Bankim was a seer and nation-builder". আবার, বালগঙ্গাধর তিলক [ ১৮৫৬-১৯২০ ] অনেকবার দেখানো হয়েছে। এখন সম্বন্ধে তাঁর এই নিবন্ধে তিলকের অদম্য, সুস্পষ্ট, সরল, তেজস্বী ব্যক্তিত্ব ও অসামান্য

---

১৭। তদেব, পৃষ্ঠা ১১২ দ্রষ্টব্য।

পাণ্ডিত্যের উল্লেখ ছাড়া তাঁর আইন-জ্ঞান,—তাঁর 'কেশরী' সম্পাদনা, মারাঠী ভাষায় ও সাহিত্যে তাঁর দানের কথা এবং রাজনীতিক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র থেকে সর্বভারতীয় নেতৃত্বে তাঁর ক্রমাগ্রগতির প্রসঙ্গে তিনি অনেক কথা বলেন। কথাসূত্রে শ্রীমতী বেসান্টের কথাও ওঠে, গান্ধীজীর কথাও ওঠে। এই নিবন্ধের তারিখ আগেই বলা হয়েছে, ১৯১৮; অর্থাৎ তখন শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরি-পর্ব চলেছে। প্রবন্ধটির মাঝামাঝি জায়গায় কয়েক ছত্রে তিনি লেখেন—"But Mr. Tilak has never been an academical politician a "student of politics" meddling with aetion ; his turn has always been to see actualities and move forward in their light. It was impossible for him to view the facts and needs of current Indian politics of the nineteenth century in the pure serene of the dim religious light of the *Witenagemot* and the *Magna Chart ι* and the constitutional history of England during the past seven centuries, or to accept the academic sophism of a gradual preparation for liberty or merely to discuss or isolate omnibus grievances and strive to enlighten the darkness of the official mind by luminous speeches and resolutions as was the general practice of congress politics till 1905." তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, দয়ানন্দ এই সূত্রে তিনজনের প্রসঙ্গই বিবেচ্য।

রাণাডে, গোখেল, বিপিনচন্দ্র, তিলক, দয়ানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতির উল্লেখ আগেও করা হয়েছে শ্রীঅরবিন্দের কথাপ্রসঙ্গে এসবই অনিবার্য।

১৩

বিপিনচন্দ্র পাল [ ১৮৫৮-১৯৩২ ] জন্মগ্রহণ করেন শ্রীহট্ট জেলায়। ১৮৭৪-এ শ্রীহট্ট থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতায় এসে, প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন, কিন্তু অচিরেই সেকালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগ দেন এবং পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর [ ১৮৪৭-১৯১০ ] প্রভাবে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি অল্পকাল পরেই আবার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর [ ১৮৪২-১৯০০ ] অনুসৃত ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে তাঁর কাছে দীক্ষিত হন। তিনি যে একাধারে ভাবুক ও কর্মী ছিলেন তাতে

সন্দেহ নেই। বিপিনচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবনের দীক্ষাগুরু ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় [ ১৮৪৮-১৯২৫ ] এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সূচনাকাল [ ১৮৮৫ ] থেকেই বিপিনচন্দ্র ছিলেন প্রগতিপন্থী। আধ্যাত্মিকতা ও রাজনীতির সমন্বয় তাঁর জীবনে কখনো কোথাও ছিন্ন হয়নি। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে 'নিউ ইণ্ডিয়া' নামে তিনি যে ইংরেজি সাপ্তাহিক পত্রিকা শুরু করেন,—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনে তিনি যে নেতৃত্ব দেন,—১৯০৬-এর ৬ই অগষ্ট থেকে তাঁর সম্পাদনায় যে ইংরেজি দৈনিক পত্র 'বন্দেমাতরম্' প্রকাশিত হতে থাকে,—পরে সেই 'বন্দে-মাতরম্' পত্রিকার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দানে অস্বীকৃত হওয়ায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে যে ছ'মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়,—শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক রচিন্তার নৈকট্য ইত্যাদি,—তাঁর সম্পূর্ণ ভারতীয় স্বরাজের ধ্যান,—স্বাধীনতা-আন্দোলনে শ্রীঅরবিন্দও বিপিনচন্দ্রের 'প্যাসিভ রেজিস্‌টেন্‌স্' ও 'বয়কট' প্রথার প্রবর্তনা,—আবার মহাত্মা গান্ধী ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে যখন খিলাফত-আন্দোলনকে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত করে অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত করেন, তখন তার প্রবল বিরোধিতা—এ-সবই বিপিনচন্দ্রের প্রবল ব্যক্তিত্ব ও অকৃত্রিম আন্তরিকতার লক্ষণ। তিনি বাংলায় বৈষ্ণব মত সম্বন্ধেও লিখে গেছেন, আবার, রাষ্ট্র-চিন্তার সঙ্গে অধ্যাত্ম-মানসিকতার পরিচয়ও তাঁর অন্যান্য রচনায় সুস্পষ্ট। ১৯৪০-এ প্রকাশিত তাঁর 'The Soul of India' বইটির তৃতীয় সংস্করণ থেকে ১৯১১-র প্রথম সংস্করণের লেখকের ভূমিকার এই কথাগুলি এইসূত্রে স্মরণযোগ্য যে, তিনি শ্রীকৃষ্ণকেই ভারতের আত্মা,—ভারতের আদর্শ ব্যক্তিত্বের প্রতীক বলে মেনেছিলেন। —"In presenting Shree Krishna as the Soul of India, I may be accused of sectarian prepossessions. But Krishna is not here presented as a sectarian ideal, but as the Principle and Personality in and through whom, as in the past so also in the present and even in the future, the great Indian synthesis was, is being, and will be worked." তিনি লেখেন —"The Soul of Europe and America is Christ: the Soul of India is, in the same way, Shree Krishna."

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে ইউরোপীয়দের আলোচনা বিপিনচন্দ্র তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেন—প্রথমত প্রাচীন ভারত সম্পর্কে ম্যাক্‌সমুলার, মনিয়ের উইলিয়াম্‌স্, ম্যাকডোনাল্‌ড্, রীজ ডেভিস্ প্রভৃতির বই—যেগুলিকে তিনি তাঁদের সারাজীবনের

সংস্কৃত সাহিত্য ও ভারতীয়-আর্যসভ্যতা সম্বন্ধে অধ্যয়নের ফল বলে মনে করেন ; সেই সঙ্গে অষ্টাদশ শতকের সার উইলিয়ম্ জোন্স্, হোরেস হেম্যান উইলসন এবং মুইর-এর আলোচনাও একই রকম শ্রদ্ধেয় বলে তিনি মনে করেন। দ্বিতীয়ত কেরী সাহেবের আমল থেকে কেরী, মার্শম্যান ওয়ার্ড প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় যাজকদের লেখা ভারতের ধর্মজীবন ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলির আলোচনা। তৃতীয়ত এদেশে ইঙ্গ-ভারতীয় সরকারী কর্মচারীরা তাঁদের দীর্ঘ কর্মজীবনে এদেশের যেসব স্মৃতিচারণা রেখে গেছেন সেইগুলি। এই তিন শ্রেণীর উল্লেখ করে বিপিনচন্দ্র লেখেন—"The best of these are like Max Muller's 'India what It can Teach us'—the worst, I think, are like Sir J. D. Rees's "Real India."

ভারতবাসীর চেতনায় জন্মভূমি যে জননীকল্পা অনুভূতি হয়ে উঠেছে, সেকথা বিস্তৃতভাবে বিপিনচন্দ্র তাঁর এই বইয়ের 'India : The Mother' অধ্যায়ে আলোচনা করেন। প্রাচীন রোমের অধিবাসীরা স্বদেশ সম্বন্ধে পিতৃসম্বোধনে অভ্যস্ত ছিল। একালে জার্মানদের কাছে জার্মানীও পিতৃপ্রতিম। ভারত যে ভারতবাসীর কাছে মাতৃপ্রতিম. তুলনাভিত্তিক ইঙ্গিতে সেই দিকটি দেখিয়ে তিনি লেখেন যে, স্বদেশ-কে 'পিতা' বা 'মাতা' সম্বোধন এক রূপক প্রয়োগের নিদর্শন বটে, কিন্তু ভারতবাসীর কাছে দেশকে জননীবোধে সম্ভাষণ ব্যাপারটি তুচ্ছ রূপক মাত্র নয়। কারণ, তাঁর মতে ইউরোপে স্বদেশপ্রেমের যথার্থ বিশ্বমানবপ্রেমে উত্তরায়ন ঘটেনি। 'দেশমাতা', 'ধর্ম', 'নীতি'—পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ও প্রথার প্রভাবে এই তিনটি শব্দ আমরা যে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহার করে থাকি, পূর্বোক্ত প্রবন্ধে বিপিনচন্দ্র তাঁর সেই বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁর সেই কথাগুলি শ্রীঅরবিন্দের দেশপ্রেম ও বিশ্বমানবপ্রেম,—এবং তাঁর ধর্ম ও রাজনীতিবোধের উপলব্ধির পক্ষে সহায়ক হবে বলেই এখানে তুলে দেওয়া যেতে পারে। বিপিনচন্দ্র লেখেন—"When, for instance, we talk of Dharma we do not understand it to mean either law of being or sacrifices and rituals or duty, the three different senses in which the word was always used among us, but the imported concept religion. Similarly, we use the word Niti, which really means strategy and statecraft for European morals. With the Europeanisation of our mind and modes of thinking even our words have been imperceptibly

Europeanised. It is not at all surprising, therefore, that the original signifcance of the word Mother as applied to our country, has also been largely lost to many of our educated countrymen, who see nothing more sacred or serious in it than a very tender and beautiful metaphor."[১৮]

দেশ-কে 'জননী'-সম্বোধন পাশ্চাত্য প্রাণারোপ-কল্পনা বা animism নয়। ভারতের প্রাচীন বৈদিক ধারণা থেকেই এই বিশেষ মাতৃভাব দেখা দিয়েছে আমাদের দেশে—এই ছিল বিপিনচন্দ্রের বিশ্বাস। কথাসূত্রে সাংখ্য-দর্শনের পুরুষ-প্রকৃতি দ্বৈত-ভাবনার কথা তোলেন তিনি। একটি স্থায়ী, অন্যটি অস্থায়ী—বেদান্তদর্শনে এই দুইয়ের নাম যথাক্রমে ঈশ্বর এবং প্রকৃতি বা মায়া—প্রথমটি মৌল সত্য, দ্বিতীয়টি মায়িক। বৈষ্ণব মতে, শ্রীকৃষ্ণই 'পুরুষ' এবং রাধা হলেন 'প্রকৃতি'। শৈবমতে, শিব-ই পুরুষ এবং শক্তি-ই প্রকৃতি।[১৯] অতঃপর বিপিনচন্দ্র দেখান যে আমরা স্বদেশকে এই প্রকৃতির অভিব্যক্তি হিসেবে দেখি—এবং তা দেখি বিশেষত শক্তিস্বরূপা বোধে। তিনিই জগদ্ধাত্রী। তিনিই দুর্গা।[২০] মহারাষ্ট্রের জাতিনির্মাতা বীর শিবাজী তাঁকেই ভবানী দেবী বলে মেনে তাঁর উপাসনা করে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দের "দুর্গা স্তোত্র' এই ধ্যানেরই স্তোত্র নয় কি? বিপিনচন্দ্র তাঁর ভারতাত্মা সম্পর্কিত আলোচনার মধ্যে শক্তিপূজার যে বিবর্তন দেখিয়ে গেছেন, যার খুবই সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে দেওয়া হোলো, সেই বৈদিক কাল থেকে আধুনিক কাল অবধি নানা জন ও জাতি-উপজাতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে আসা দেবী-বন্দনা হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের' মাতৃবন্দনার রূপ পরিগ্রহ করে এবং সেই একই প্রেরণায় হয়তো শ্রীঅরবিন্দ সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রী, নৃমুণ্ডমালিনী কালী, শিবপ্রিয়া শক্তি ও যোগশক্তিস্বরূপা দুর্গাকে আপন অন্তরলোকে পুনঃপুনঃ আবাহন করেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ই তাঁর সেই দেশমাতৃকা বন্দনার নিকটতম ঋষিপ্রতিম প্রেরণাদাতা ছিলেন হয়তো! বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তের যাচনা ও সমর্পণ মনে পড়ে শ্রীঅরবিন্দের দুর্গাস্তোত্রের ছত্রে ছত্রে। সর্বসমেত চোদ্দটি গদ্য-অনুচ্ছেদের শেষ দুটি এইসূত্রে স্বতই পাঠকের মনে মনে ধ্বনিত হয়—

> "মাতঃ দুর্গে। তোমাকে পাইলে আর বিসর্জন করিব না, শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের ডোরে বাঁধিয়া রাখিব। এস মাতঃ, আমাদের মনে প্রাণে শরীরে প্রকাশ হও।

১৮। ঐ বইয়ের ১২২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা ১২৮ দ্রষ্টব্য।
২০। ঐ, পৃষ্ঠা ১৪৯ দ্রষ্টব্য।

"বীরমার্গপ্রদর্শিনি, এস! আর বিসর্জন করিব না। আমাদের অখিল জীবন অনবিচ্ছিন্ন দুর্গাপূজা, আমাদের সর্ব কার্য অবিরত পবিত্র প্রেমময় মাতৃসেবাব্রত হউক, এই প্রার্থনা, মাতঃ, উর বঙ্গদেশে প্রকাশ হও॥"

১৪

বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত'—একাদশ সংখ্যা থেকে এই অংশটুকু শ্রীঅরবিন্দের 'দুর্গাস্তোত্র' লেখাটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য এতে স্বদেশজননী বা ভারতমাতার প্রসঙ্গ নয়—বিশেষভাবে 'বঙ্গভূমি'র কথাই জানান—

"দেখিলাম—অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবলবেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া ভাসিয়া যাইতেছি। দেখিলাম—অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গসঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা—একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃহীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা। কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি। এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্নভূষিতা—একণে কালগর্ভে নিহিতা। রত্নমণ্ডিত দশভুজ—দশদিক—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত; পদতলে শত্রু-বিমর্দিত বীরজন কেশরী শত্রু নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু একদিন দেখিব—দিগভুজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠ বিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যা-বিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!"

বঙ্কিমচন্দ্রের উপলব্ধিতে এই মাতৃরূপ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। রচনাটির শেষদিকে মাতৃস্তোত্র দেখা দেয় উদাত্ত গম্ভীর সুললিত সাবলীল সংস্কৃত ভাষায়—

জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি।
জয় জয় জয় বঙ্গভূগদ্ধাত্রি।।
জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে।
জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে।।
জয় জয় জয় শুভে শুভঙ্করি।
জয় জয় জয় শান্তি ক্ষেমঙ্করি।।
দ্বেষকদলনি, সন্তানপালিনি।
জয় জয় দুর্গে দুর্গতিনাশিনি।। ইত্যাদি

এই সূত্রেই 'কমলাকান্তের' দ্বাদশ সংখ্যার কয়েকটি কথা শ্রীঅরবিন্দের ধর্ম-দর্শন-রাজনীতির পূর্বকাণ্ড রূপে স্মরণযোগ্য। এই লেখাটিতে বঙ্কিমের কমলাকান্ত জীবনযন্ত্রণার কথা স্বীকার করেও মনুষ্যজন্মের বৃহত্তর সার্থকতার দিন গণনার সুখের কথাই গভীর আবেগে লেখেন—"১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যেদিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ জয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব। দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাত বার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণ সেন কই? আর কি মিলিবে না? হায় সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?"

দুর্গা সম্বন্ধে ১২৮০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—"শ্রীকৃষ্ণ এবং দুর্গা এই বঙ্গদেশের প্রাচীন আরাধ্য দেবতা। ইঁহাদের পূজা না করে এমত হিন্দু প্রায় বঙ্গদেশে নাই।" এবং তিনি প্রশ্ন করেন—"এই দেবী কোথা হইতে আসিলেন? ইনি কে? আমাদিগের হিন্দুধর্মকে সনাতন ধর্ম বলিবার কারণ এই যে, এই ধর্ম বেদমূলক।" তৎসূত্রে ঐ প্রবন্ধেই তাঁর বক্তব্য—"ইহা এক প্রকার নিশ্চিত যে কোন বৈদিক সংহিতায় এই দেবীর বিশেষ কোন উল্লেখ নাই।" এবং—"ঋগ্বেদ সংহিতার দশম মণ্ডলের অষ্টমাষ্টকে "রাত্রি পরিশিষ্টে' একটি দুর্গাস্তব আছে মাত্র। কিন্তু তাহাতে যদিও

দুর্গা নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে আমাদের পুজিতা দুর্গা বলা যাইতে পারে না। উহা রাত্রি-স্তোত্র মাত্র।" প্রাসঙ্গিক স্তোত্রটি ছেপে দিয়ে ডাক্তার জন মিয়োর ইংরেজি অনুবাদের বঙ্গানুবাদ দেন তিনি এবং লেখেন—"ইহার সকল স্থলে অনুবাদ হইয়া উঠে নাই, এবং যাহা অনুবাদ হইয়াছে তাহার সকল স্থলের কেহ অর্থ করিতে পারে না। কিন্তু এত দূর বুঝা যাইতেছে যে, যদি এই দেবী আমাদের পূজিতা দুর্গা হয়েন, তবে দুর্গা রাত্রির অন্যতর নাম।" এই প্রবন্ধেই তাঁর আরো একটি মন্তব্য—"ইহা ভিন্ন যজুর্বেদের ( বাজসনেয় ) সংহিতায় এক স্থানে অম্বিকার উল্লেখ আছে। কিন্তু সেখানে অম্বিকা শিবের ভগিনী।" অন্য কোনো সংহিতায় নয়, ব্রাহ্মণে নয়,—কেনোপনিষদে উমা হৈমবতী-র উল্লেখ দেখিয়ে সায়নাচার্যের প্রদর্শিত অর্থ 'ব্রহ্মবিদ্যা'র উল্লেখ করেন বঙ্কিমচন্দ্র। মুণ্ডকোপনিষদে কালী ও করালীর উল্লেখ অগ্নির সপ্তজিহ্বার দুই জিহ্বা-বাচক তৈত্তিরীয় আরণ্যকে দুর্গাগায়ত্রী-র মধ্যে স্ত্রীলিঙ্গান্ত 'দুর্গা' শব্দের পরিবর্তে পুংলিঙ্গান্ত 'দুর্গী' শব্দের ব্যবহার দেখিয়ে দেন তিনি।

১৫

'দুর্গা', 'ধর্ম' 'হিন্দু'—এই তিনটি শব্দ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাক্ষেত্রে কী বিচিত্র অর্থবৃত্তময় বা কীরকম ব্যঞ্জনাধ্বনিত ছিল, সে-বিষয়ে কোনো বিস্তৃত অনুসন্ধান বা চর্চার লক্ষণ সুস্পষ্টভাবে অরবিন্দের কোনো রচনায় চোখে পড়েনি। কিন্তু তিনি যে বঙ্কিমের অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণার উত্তরাধিকারী ছিলেন, সে কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে। বঙ্কিমের 'বঙ্গভূমি' অবশ্য অরবিন্দের ভারতভূমি-তে বিস্তার লাভ করেছিল। সে তো কালধর্মানুযায়ী দৃষ্টিবিস্তারের স্বাভাবিক নিদর্শন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর প্রবীণতর সমসাময়িক বঙ্কিমচন্দ্রের ও স্বামী বিবেকানন্দের [ ১৮৬৩-১৯০২ ] অনুভূতি ও প্রত্যয়ের ধারাতেই স্বদেশজননী, বিশ্বমানবপ্রেম ও ধর্মজিজ্ঞাসার ধ্যানে অগ্রসর হন, একথা বললে তাঁর নিজস্ব সহজাত সত্যানুসন্ধানী অসামান্য ব্যক্তিত্বকে অনুমাত্র সঙ্কুচিত করা হয় না। বিপিনচন্দ্র পাল ও তিনি, দুজনে একসঙ্গে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা পরিচালনা করেছেন। সেকথা আগেই বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্ত্বের 'অনুশীলন'-এর আঠারোর এবং 'দেবী চৌধুরাণী' উপন্যাসের পনেরোর পরিচ্ছেদে ভগবদ্গীতা-কে যে জগতের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলে গেছেন, সেকথা বঙ্কিমানুরাগী পাঠকমাত্রেই জানেন এবং

'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বইটির দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়েই তা উল্লেখ করেছেন। 'ধর্মতত্ত্বে'র পঞ্চদশ অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য—"ঈশ্বর জানিব কিসে?"—এই প্রশ্নের উত্তর তাঁর নিজের কথায়—"হিন্দু শাস্ত্রে। উপনিষদে, দর্শনে, পুরাণে, ইতিহাসে—প্রধানত গীতায়।"

১৬

অধ্যাপক অমূল্যভূষণসেন তাঁর 'বিবেকানন্দের ইতিহাস-চেতনা' [ ১৩৭২ বঙ্গাব্দ ] বইটিতে মূলত যা লিখেছেন, ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখিত ,ভূমিকা, থেকে তার এই পরিচয়টুকু লক্ষণীয়—"গ্রন্থকার প্রথমেই আমাদিগকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে স্বামীজী ঐতিহাসিক গবেষণার বাঁধানো রাস্তায় চলেননি—তিনি রাজনীতিক ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে না ফেলে প্রাচীন হিন্দু-জাতির 'জাতীয়ত্বের কেন্দ্র ও বিশেষত্ব কি সে দিকেই লক্ষ্য করেছেন। ধর্ম ও সমাজের আলোচনায় যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি স্বামীজী আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকেই ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তনের মূলসূত্র জানতে পেরেছেন। স্বামীজীর মতে প্রত্যেক জাতিরই একটা বৈশিষ্ট্য বা বিশেষ ধর্ম আছে।...রোম-সভ্যতার এই [ জীবন মরণের ] জাদুকাঠি ছিল—রাজশক্তি—তাই রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই রোমের পতন হল। হিন্দুদের জাদুকাঠি হল ধর্ম, তাই পুনঃ পুনঃ বহিরাগত শত্রুর আঘাতে বিপর্যস্ত হলেও হিন্দুজাতি—প্রাচীন সভ্যতাগুলির মত পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে যায়নি। আর এই কারণেই ভারতের ইতিহাস—গঠন ও পঠন প্রণালীর দিকে—অন্যান্য দেশের ইতিহাস থেকে স্বতন্ত্র। এই জন্যই ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজধানী হস্তিনাপুর, পাটলিপুত্র, কান্যকুব্জ প্রভৃতি ভারতের ইতিহাসে যত প্রাধান্য লাভ করেছে তার চেয়েও বড় স্থান দিতে হবে কাশী, মিথিলা, কাঞ্চী, নালন্দা, তক্ষশিলা প্রভৃতি সভ্যতার কেন্দ্রে। মিশর আসিরিয়া, রোম জগতের কতটা অংশ দখল করার জন্য কত নরবলি দিয়েছিল তাদের ইতিহাস সেই আখ্যানে পূর্ণ—কিন্তু হিন্দু সন্ন্যাসীরা জগতের কত স্থানে ধর্ম ও ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতির প্রচার করেছিলেন ভারতের ইতিহাসে সেটাই হবে প্রধান কথা।" এই কথাগুলি শ্রীঅরবিন্দের ভারত-ঐতিহ্যের বিশেষত্ব উপলব্ধির দিক থেকেই বিশেষ স্মরণীয়। কারণ, তাঁর রাজনীতিচিন্তা ও রাজনৈতিক বিপ্লব সাধনের কর্মপ্রবাহ তো ভারত-পথিক হিসেবেই তাঁর নিজস্ব ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্রের এই কথাগুলিও এখানে বিবেচ্য—"কিন্তু যে ধর্মকে স্বামীজী হিন্দুর প্রাণশক্তি বলে পরিচয় দিয়েছেন তার স্বরূপ

কি, স্বামীজী তাও বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। আচার-বিচার অনুষ্ঠানের ঊর্ধ্বে এই ধর্ম যখনই খর্ব বা কলুষিত হয়েছে তখনই জাতীয় জীবনে ঘুণ ধরেছে—হিন্দু ধ্বংসের মুখে চলেছে—কিন্তু আবার নির্মল ধর্মের প্রভাবে বাধা বিপত্তি কাটিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে যে উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ দিয়ে জাতীয় জীবনের রথের চক্র চলেছে—রাজনীতিক ইতিহাসের সুপরিচিত কার্য-কারণ সম্বন্ধের দিক থেকে বিচার না করে ধর্মের উন্নতি ও অবনতির দিক থেকেই তিনি তার ব্যাখ্যা করেছেন। ঐ একই দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি ভারতে মুসলমানদের প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্বন্ধেও আলোচনা করেছেন। হিন্দুরা মুসলমানদের ঠেকাতে পারল না—আবার মুসলমানরাও অন্যান্য অনেক দেশের ন্যায় গোটা ভারতবর্ষে ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করতে পারল না। আকবরের ঔদার্যে যে সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, ঔরংজেবের আমলে তার ধ্বংস—এই সকল ঐতিহাসিক সমস্যারও স্বামীজী তাঁর মতবাদের অনুযায়ী সমাধান করেছেন।” রমেশচন্দ্র আরো লিখেছেন—“ভারতে ইংরেজ শাসন সম্বন্ধেও স্বামীজীর ঐতিহাসিক চেতনা খুবই তীক্ষ্ণ ও জাগ্রত। যে যুগে ইংরেজের বিরুদ্ধে দেশের অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে আমাদের দৃষ্টিকে ম্লান করেছিল সে যুগেও স্বামীজী স্পষ্টভাবে ইংরেজ শাসনের সুফলের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে এসে গ্রীক-সভ্যতার প্রভাবে এদেশে যে কত সুফল ফলেছে এবং বহুকালের জড়তা ভেঙে যে নবজীবনের সূত্রপাত হচ্ছে, স্বামীজীর ইতিহাস-চেতনা সে দিকে জাগ্রত ছিল।”

রমেশচন্দ্রের বিশেষ প্রশংসিত অমূল্যভূষণের এই বইটিরে প্রথম পর্বে ‘ভারত-ইতিহাসের মূলতত্ত্ব’ নামে মাত্র উনিশ পৃষ্ঠার নিবন্ধে অধ্যাপক সেন লেখেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের শক্তিতে শক্তিমান, ভারত-পরিব্রাজক স্বামীজী “লোকোত্তর সাধনা বলে” ভারতাত্মার দর্শন পান; “তাঁর ধ্যান-নেত্রের সম্মুখে আবির্ভূত হয়েছেন ভুবনমনোমোহিনী স্বদেশজননী, উদ্‌ঘাটিত হয়েছে মাতৃভূমির থরে থরে সাজানো বহুকালের সঞ্চিত রত্নরাজি।” অধ্যাপক সেন আরো উল্লেখ করেছেন যে, স্বামীজীর কার্যকালে অর্থাৎ উনিশ শতকের শেষ ভাগে কলকাতায় রাজেন্দ্রলাল মিত্র [ ১৮২২-৯১ ] এবং পুণায় রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর [ ১৮৩৭-১৯২৫ ] বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস-গবেষণা শুরু করেছিলেন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য প্রতিভা যে তাঁকে ইতিহাসাশ্রয়ী প্রবন্ধ ও ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাস রচনায় অনুপ্রেরিত করেছিল, সে-কথার উল্লেখ করে তিনি লেখেন—“লোকোত্তর মনীষা, সূক্ষ্ম বিচার

এবং অপূর্ব বিশ্লেষণী শক্তি দ্বারা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এদেশের ইতিহাসের ওপর স্বচ্ছ আলোকপাত করেছেন স্বামীজীর দেহত্যাগের পরে, যদিও তিনি স্বামীজীর চেয়ে দু-বছরের বড় ।" তাঁর মতে, স্বামীজীর মৃত্যুর বছরেই [ ১৯০২ ] রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত ভারতবর্ষের ইতিহাসপর্যালোচনা শুরু করেন। অধ্যাপক সেনের নিজের কথায়—"ভারতীয় ঐক্যের রাজনৈতিক দিকটা মুখ্য নয়, ভারতের ভাবগত আদর্শগত এবং ধর্মগত ঐক্য যুগে যুগে আবর্তিত হয়েছে রাজনৈতিক অনৈক্যের শর্ত জটিলতাকে উপেক্ষা করেও।" তাঁর পরবর্তী মন্তব্য—"এই পরিপ্রেক্ষিতেই স্বামীজী প্রাচীন ভারতকে একটি 'নেশন' বা জাতি বলেছেন। তাঁর ইংরেজিতে লেখা 'Historical Evolution of India' ( ভারতের ঐতিহাসিক বিবর্তন ) নামক নিবন্ধে তিনি জানান—"In ancient India the centres of national life were always the intellectual and spiritual and not political. The outburst of national life was round cottages of sages and spiritual teachers."[২১] তিনি আরো লেখেন—"স্বামীজীর এ নিবন্ধটি যখন প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের 'ভারতবর্ষে ইতিহাসের ধারা' প্রবন্ধটি রচিত হয়নি। তত্ত্বের দিক দিয়ে এ-দুটি প্রবন্ধের আশ্চর্য মিল রয়েছে, ভিন্ন পথে থেকেও এই দুই মহামানব আশ্চর্য কাছাকাছি।" বিভিন্ন স্বনামধন্য ঐতিহাসিকের মন্তব্য তুলে তুলে অধ্যাপক সেন তাঁর এই স্বল্পায়তন বইটিতে হিন্দুর বিনম্রতা ব্যাখ্যা করেছেন, স্বামীজী যে একজন revivalist মাত্র ছিলেন না, পক্ষান্তরে বেদান্ত ছিল তাঁর নখদর্পণে, রামকৃষ্ণের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন "বেদান্তের পরম সত্যের অপূর্ব রূপায়ণ', সেসব জানিয়ে তিনি K. M. Pannikar-এর "The Determining Periods of Indian History" ( ভারতীয় বিদ্যাভবন, বোম্বাই ) বই থেকে এই মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেন—"The Arya Samaj, the Bramo Samaj, the Deva Samaj and other movements ( before Vivekananda's advent ), very valuable in themselves, only tended further to emphasise the provincial character of the reform movements. It is Vivekananda who first gave to the Hindu movements its sense of nationalism and provided most of the movements with a common all India outlook."

২১। পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৫৩-৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

১৭

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি-চিন্তার কথাসূত্রে দেশের মনে স্বামী বিবেকানন্দ ও বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির নেশনবোধ জাগিয়ে তোলার ঐতিহাসিক গুরুত্ব দেখা গেল। রবীন্দ্রনাথের আগেই বিবেকানন্দ ভারত-শক্তির যে বিশেষত্ব দেখিয়ে গেলেন, তাও দেখা গেল। পুনরায় বিবেকানন্দ প্রসঙ্গ উঠবে। এবার শ্রীঅরবিন্দের নিজের এক আলোচনার প্রসঙ্গ সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক্।

'দি হিউম্যান সাইক্ল্'-এর মোট চব্বিশ পরিচ্ছেদের প্রবাহে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, জীবন সম্বন্ধে আত্মগত বা আত্মপ্রধান ধারণা (Subjective views of Life) সামাজিক পরিণতির আদর্শ, সভ্যতা ও অসভ্যতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতি, সৌন্দর্যতাত্ত্বিক ও নৈতিক সংস্কৃতি, জীবনযাত্রার নিয়ন্তা হিশেবে যুক্তিবাদের ভূমিকা, যুক্তিবাদ ও ধর্ম, যুক্তির অতিশায়ী সৌন্দর্যবোধ, যুক্তির অতিশায়ী মঙ্গলবোধ ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ বিশ্লেষণের পরে শেষ চার অধ্যায়ে জীবনের আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও তদুপযোগী রূপান্তর সাধনের আলোচনা পাওয়া যায়। আবার, 'দি আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটি'তে-তে মোট পঁয়ত্রিশ পরিচ্ছেদের পরেও এক 'পুনশ্চ' অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। ১৯১৯-এ প্রথম প্রকাশিত এই বইয়ের ভূমিকায় দেখা যায়, ১৯১৫-র শেষ থেকে ১৯১৮-র জুলাইয়ের মধ্যে বিশ্বের দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনামালার নানা প্রতিফলন আছে সেই সব রচনায়। 'লীগ অফ নেশন্স্' বা জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠার কথা আছে এই দ্বিতীয় বইটিতে। মুষ্টিমেয় বড়ো বড়ো সাম্রাজ্যশক্তিকে বিশ্বমানবের ঐক্যের আদর্শে যূথবদ্ধ করা যে কী কঠিন কাজ, সে-বিষয়ে তাঁর নিজেরও মন্তব্য পাওয়া যায় এবং অসংখ্য স্বাধীন জাতির অস্তিত্বের সঙ্গে ধনতন্ত্র ও শ্রমিক আন্দোলনের আসন্ন সংঘর্ষের দিকও তিনি দেখিয়ে দেন। আবার লীগ যদি উগ্র বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলির বিরুদ্ধে পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রশক্তিকে প্রয়োগ করার নেতৃত্ব দেয়, তাহলে বিপদ যে খুবই ঘনীভূত হবে সেই সংকটের দিকটিও দেখিয়ে দেওয়া হয়। প্রাকৃতিক নানা ঘটনা ও তাড়নার ফলে কিন্তু পৃথিবীর নানা জাতিতে, রাষ্ট্রে, বিশ্বাসে, আদর্শে ছড়িয়ে থাকা মানুষের অনিবার্য ঐক্য সুগঠিত হবার ভবিতব্য সম্বন্ধে গভীর বিশ্বাসও ব্যক্ত হয়েছে দ্বিতীয় বইটিতে। কেবল

ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠিগত স্বাধীনতা মানুষের চূড়ান্ত ভবিতব্য হতে পারে না, একথাও তিনি জানান। 'মানুষের ধর্ম' বলে যে চেতনার কথা রবীন্দ্রনাথের 'Religion of Man'-এ এবং আরো আগে উচ্চারিত হয়, শ্রীঅরবিন্দ সেই বৃহত্তর ও উপায়ান্তরহীন অন্ত ঐক্যাদর্শের আবশ্যিকতাই দেখিয়ে দেন। পূর্বোক্ত 'পুনশ্চ' অধ্যায়টি লেখা হয় শতাব্দের প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি বিশ্বযুদ্ধের কঠোর অভিজ্ঞতার চাপে। 'জাতিসংঘ' বা 'লীগ অফ নেশন্‌স্' যে ব্যর্থ হয়ে বিদায় নিয়েছে এবং সে জায়গায় 'সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ' বা 'ইউনাইটেড নেশন্‌স্ অরগ্যানিজেশন' তখন দেখা দিচ্ছে, সেকথা উল্লেখ করে শ্রীঅরবিন্দ জানান যে, দুই মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত বিশ্বপরিস্থিতি থেকে একথা অনুভব করা যাচ্ছে যে, আরো মারাত্মক, আরো ভয়াবহ অস্ত্রাদি সহযোগে তৃতীয় এক যুদ্ধের সম্ভাবনা যদি সত্য হয়, তাহলে পৃথিবী থেকে মানবসভ্যতা নিশ্চিহ্ন হবার সম্ভাবনা বিদ্যমান। যাতে শান্তি স্থাপিত হয় সেই উদ্দেশ্যেই প্রকৃতি এরকম বিপজ্জনক পরিস্থিতি ঘটিয়ে তোলেন।

কোনোরকম সংকীর্ণতার মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চায় না যে মন, শ্রীঅরবিন্দের সেই মনই জানিয়ে গেছে যে, রাজনীতি, পল্লীসংগঠন, গণতন্ত্র, আধ্যাত্মিকতা—এসব হোলো আলাদা আলাদা ব্যাপার। স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে এসব ক্ষেত্রে তাঁর বিচার ও বিশ্বাসের সাদৃশ্য দেখা যায়। ১৯২৩-এর ৯ই এপ্রিলের সান্ধ্য-বৈঠকে শ্রীঅরবিন্দকে বলা হয়েছিল—"ডক্টর ভগবান দাস এবং আরো কয়েকজন চেষ্টা করেছেন যাতে আমাদের মধ্যে পাশ্চাত্য ধরনের রাজনীতিতে আধ্যাত্মিকতা আনা যায়, তা ছাড়া পল্লী-সংগঠনের কাজও তার মধ্যে থাকবে। এ বিষয়ে আপনার কি মতামত?" পর পর বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে শ্রীঅরবিন্দ জানান—রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্যে কাজ আর পল্লী-সংগঠনের কাজ—এ দুটি সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।—"রাজনৈতিক কর্মীর পথ একেবারে সোজা। গঠনমূলক কিছু তার করবার নেই। পল্লী-অঞ্চলে তার যা কাজ তা হবে আয়ার্ল্যাণ্ডের চাষী সম্মেলনের মতো। ভালো করে গড়ে উঠলে তখন তারা রাজনীতির ক্ষেত্রে যথেষ্ট চাপ দিতে পারবে।" তিনি সেই উনিশ-শ কুড়ির দশকে ভারতের কোথাও কোথাও পল্লী-সংগঠনের প্রতি উৎসাহ লক্ষ্য করে এই সূত্রেই জানান—"আজকাল পল্লীসেবার উপরেই কোথাও কোথাও খুব ঝোঁক দেওয়া হচ্ছে। আমি জানি ভারতে এ কাজের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশি। কিন্তু কেবল পল্লীগুলিকে নিয়েই সকলে ভবিষ্যৎ ভারত গড়ে তুলতে

চেষ্টা করুক এ আমি চাই না। পল্লী-অঞ্চলের জীবন-সমস্যা অনেক, জীবন্মৃত অবস্থা থেকে পল্লীবাসীদের বাঁচিয়ে তোলা দরকার। কিন্তু চিন্তার ক্ষেত্রে তারা নেতা হতে পারে না।" তিনি পল্লীতে সংগঠনের কাজ অবশ্যই হওয়া উচিত বলে মনে করেন, কিন্তু পল্লী যথার্থ বৃহৎ কোনো ভাবকর্মের সৃষ্টিকার্যের কেন্দ্র হতে পারে কি না, সেই উনিশ-শ কুড়ির দশকে সে-বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিলই এবং তিনি বলেন—"অন্ততপক্ষে অতীতে তা কখনই হয়নি। পল্লীসমাজ অতীতেও ছিল কিন্তু তা কোনো সৃষ্টির কেন্দ্র ছিল না। কারণ পল্লীতে বাসকরা মানুষের জীবনদৃষ্টি থাকে একটুখানি জমি ও একটু জিনিস নিয়েই সীমাবদ্ধ। বড়োরকম সৃষ্টিকার্যের পক্ষে যে মুক্ত ও উদার আবহাওয়া থাকা চাই সেটা তার মেলে না। তাই অতীতকালেও দেখা গেছে যে, নেতাদের অভ্যুদয় হয়েছে শহর থেকেই। ভারতেরই হোক বা জগতের অন্য দেশেই হোক, পল্লীগ্রামের দ্বারা রাজ্যশাসন চলবে এমন আমার মনে হয় না, এমনকি গণতন্ত্রের বেলাতেও না। আর সৃষ্টিকার্য করতে খানিকটা মুক্ত অবসর চাই ও মনের প্রসার চাই।"

তাঁর আগেই স্বামী বিবেকানন্দ আমাদের ধর্ম, জাতিগত বৈশিষ্ট্য, পাশ্চাত্ত্য জাতিগুলির সঙ্গে আমাদের মজ্জাগত পার্থক্য ইত্যাদি ব্যাপার সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করে গেছেন এবং তাঁর নিজস্ব স্পষ্ট ও সরল ভঙ্গিতে খুবই তেজের সঙ্গে তিনি যা জানান, শ্রীঅরবিন্দের মতামতের সঙ্গে তার সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি' (১৯৩০) প্রকাশিত হবার প্রায় সাতবছর আগে ১৯২৩-এর এপ্রিলে তাঁকে জিগেস করা হয়েছিল রাশিয়াতে কি তখন গণ-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল? ডঃ পশুপতি ভট্টাচার্যের অনূদিত 'সান্ধ্য বৈঠক' প্রথম খণ্ডের (নভেম্বর, ১৯২১) ৩৭-৩৯ পৃষ্ঠা থেকে শ্রীঅরবিন্দের উত্তর দেখা যেতে পারে। তিনি বলেন—"ইউরোপে বরাবরই গণতন্ত্র স্থাপনের চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্র জিনিসটা সেখানে বরাবরই ব্যর্থ হয়েছে কারণ তা মানব-চরিত্রের বিরোধী। এমন কতকগুলি শাসনদক্ষ লোক থাকে যারা শাসন করবেই। যা বাস্তব, তাকে মানতেই হবে। গণতন্ত্রের মধ্যেও সেই লোকেরাই আইন গড়ে, সবাই জানে যে সাধারণ পল্লীবাসীদের তাতে কোনোই হাত থাকে না। কেবল তাদের নাম নিয়ে প্রকৃতপক্ষে ঐ লোকেরাই শাসনকার্য চালায়, অনেক সময় তাতে তারা আরো বরং বেশি বেপরোয়া হয়ে নিজেদের ইচ্ছামত কাজ করে। রাশিয়াতে কেমন জিনিস এখন হচ্ছে তা ঠিক জানা নেই—কিন্তু সেখানে চেষ্টা

করা হয়েছিল যাতে পল্লীর লোকদের দ্বারাই প্রকৃত গণতন্ত্রের শাসন অনুষ্ঠিত হয়। তার কি ফল হোলো দেখলে তো? আবার সেই লেনিনের দলের বিশেষ কয়েকজনের রাজ্য স্থাপিত হোলো। প্রশ্ন এই যে রাশিয়া শেষপর্যন্ত কি করলে? পুঁজিবাদ ঘুচিয়ে দিতে গিয়ে শেষপর্যন্ত নাগরিক জীবন জিনিসটা নষ্ট হয়ে গেল। সেখানে:যান্ত্রিকভাবে চেষ্টা বন্ধ করা হচ্ছে যাতে সকল মানুষ সমান হয়। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয়নি। পাশ্চাত্ত্য সামাজিক জীবন ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অধিকারের উপব প্রতিষ্ঠিত। সেখানে মানুষেব প্রাণধর্মী অস্তিত্ব তাদের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি সুযোগ নিয়ে তাদের বাস্তববাদী মনেব দ্বাবাই নিরূপিত। মানুষেব যা যুক্তি বুদ্ধি রয়েছে তার দ্বাবা তাদের মধ্যে একটা অদম্য শ্রেণীবিভাগ এসে যায়, যাতে তাদেব মনের মধ্যে গড়ে ওঠে আপন আপন স্বার্থ ও অধিকার নিরূপণ করে নেবাব তত্ত্ব ও তার ন্যায্যতা আর বিজ্ঞান ও তার শক্তি ও ক্রিয়াকুশলতার দ্বাবা তাদের সেইরূপ দক্ষতা এনে দেয়।"

বলা বাহুল্য, উনিশ-শ কুড়ির দশকে রুশ সমব্যবস্থার আভ্যন্তরীণ খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া পণ্ডিচেরি থেকে সম্ভব ছিল না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁব উত্তরে গণতন্ত্র ও একনায়কত্বের প্রসঙ্গই যথোচিত স্পষ্টতা ও সতর্কতা রক্ষা করে কতকটা ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেন। শ্রেণীবৈষম্য সম্বন্ধেও তাঁর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য এখানে পাওয়া গেল। পাশ্চাত্ত্য জীবনাদর্শ সম্বন্ধে কতকটা ব্যাপকভাবেই তিনি এই সূত্রে জানান—"তুমি বলতে পারো যে এমন সুনিয়ন্ত্রিত ও কার্যকরী হলেও ইউরোপীয় জীবন সর্বসম্পূর্ণ নয়। মানুষেব সম্বন্ধে তাদের দৃষ্টিভঙ্গিও অপূর্ণ এবং মানুষের আদর্শ সম্বন্ধে তাদেব ধারণাও অপূর্ণ। সেইজন্যই দেখা যায় যে তাদের মধ্যে শ্রেণীযুদ্ধ লেগে আছে এবং বাস্তববুদ্ধি-প্রণোদিত অধিকারবোধের লড়াইও লেগে আছে। ইউরোপীয় জীবন সর্বদা শক্তিময় কারণ মুহূর্তমাত্রে সমবেতভাবে তারা তৎক্ষণাৎ সমস্ত শক্তিটাকে প্রয়োগ করতে পারে। প্রাচীনকালে ছিল স্বতন্ত্র আদর্শ। তখনকার লোকদের সমাজ গঠিত ছিল ধর্মের ভিত্তি নিয়ে। সংকীর্ণ কোনো ধর্মের কথা বলছি না, আমাদের সম্ভাব যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম তার কথাই বলছি।" এসব মতামতের অনেক আগেই 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ তাঁর প্রবন্ধগুলি বেরিয়ে গেছে; 'ভবানীমন্দির'ও আগেকার ঘটনা—এবং 'কর্মযোগিন'-এর লেখাগুলিও পূর্বপ্রসঙ্গ।

১৮

এইভাবে তাঁর রাজনীতি-সম্পর্কিত মতামতের মধ্যে 'ধর্মে'র কথা উঠে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তাধারার বস্তুগত দিক থেকেও বটে এবং রীতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও বটে, শ্রীঅরবিন্দের ভাবনার সাদৃশ্য দেখা দেয় বারবার। অতীতের ব্যবস্থা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের এই উত্তরে দেখা যায়—"এখনকার দিনে যেমন ব্যক্তিগত স্বাধীনতার জন্য দাবী করা হয়, তখনকার দিনে সে প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু যা ছিল তা সম্পূর্ণ সমাজগত স্বাধীনতা। প্রত্যেক সমাজ তার আপন আপন ধর্ম স্বাধীনভাবে ঠিক করে নেবে, আর তাই হবে তার সত্তার বিধি।" অপেক্ষাকৃত অতীতের ভারতীয় সমাজ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য—" একজন যদি অপরজনকে কিংবা এক সম্প্রদায় যদি অন্য সম্প্রদায়কে পরিচালিত করতে থাকে, তাহলেই যে তাতে পীড়ন করা হয়, এমন আমার মনে হয় না। ব্রাহ্মণেরা কখনই রাজ্যশাসন করেনি, কিন্তু তাদের কেউ কখনো পীড়নও করেনি, বরং তারাই অন্যদের উপর পীড়ন করেছে। রাজ্যশাসন তখনই হয় মন্দ ও অযোগ্য যখন এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায় বা জাতিকে পদানত করে রেখে নিজেদের লাভের দিকটাই দেখে, সেই সম্প্রদায় জাতিকে তাদের নিজস্ব সত্তার ধর্ম থেকে বিচ্যুত করে।"

পল্লী, নগর, ব্যক্তি, সমাজ সকল ক্ষেত্রেই প্রাচীনকাল থেকে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ভারতীয় জীবনাদর্শের পরিবর্তনের কথাসূত্রে তিনি জানিয়েছেন যে, অতীতে আমাদের—"কোনো একটা রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। তার চেষ্টা অবশ্য অনেকবারই হয়েছে কিন্তু কখনো সফল হয়নি। ভারতের গোটা মানবসমাজ ছিল অতি বৃহৎ, আর তাদের ধর্মগত সংস্কৃতি এমন সমাজবন্ধন শেখেনি যাতে বাইরের কোনো আক্রমণ ঘটলে সকলে মিলে তার প্রতিরোধ করবে, তার থেকেই আমরা এই বর্তমান অবস্থাতে এসে পড়েছি।" ডক্টর ভগবান দাসের পূর্বোক্ত মন্তব্যসূত্রেই তাঁকে প্রশ্ন করার ফলে শ্রীঅরবিন্দের এইসব কথা পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গের জের টেনেই তাঁর আর তিন-চারটি বাক্য (বঙ্গানুবাদে) এখানে স্মরণীয়। সেই উনিশ-শ কুড়ির দশকের প্রথমার্ধে

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি জানান—"এখনকার সমস্যা এই যে কেমন করে দেশের ভবিষ্যৎ জীবন সুগঠিত করে তোলা যায়। আমি কতক বিষয়ে কম্যুনিস্ট, কিন্তু রাশিয়ার পদ্ধতির সঙ্গে আমার মত মেলে না। রাশিয়া কতটা কি করতে পেরেছে? আর বর্তমানে আমাদের ভারতীয় কর্মীদের মধ্যেও কোনো সুস্পষ্ট ধারণা নেই যে তারা কি করতে যাচ্ছে আর কি তারা চাইছে।" আমাদের অস্পষ্ট দৃষ্টি ও ক্ষীণ সামর্থ্যের দিকই এতে সূচিত হয়।

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি-চিন্তার আরো অনেক দিক আছে, কিন্তু সেসব দিকে এগিয়ে যাবার আগে স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য (প্রথমে 'উদ্বোধন' পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত) থেকে 'ধর্ম' ও মোক্ষ', 'স্বধর্ম বা জাতিধর্ম', 'শরীর ও জাতিতত্ত্ব', 'উভয় সভ্যতার তুলনা' ইত্যাদি অংশগুলির মূলকথা সংক্ষেপে দেখে নিলে ভাল হয়। আগেই বলা হয়েছে যে, শ্রীঅরবিন্দ নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই আধ্যাত্মিকতা আর রাজনীতিকে পৃথক পৃথক পথ বলে মেনেছেন। এদিক দিয়ে তাঁদের ভাবগত মিল ছিল বটে। বিবেকানন্দ তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য' বইয়ের প্রথম নিবন্ধেই লেখেন—"প্রত্যেক মানুষের মধ্যে একটা ভাব আছে, বাইরের মানুষটা সেই ভাবের বহিঃপ্রকাশ মাত্র—ভাষা মাত্র। সেইরূপ প্রত্যেক জাতের একটা জাতীয় ভাব আছে। এই ভাব জগতের কার্য করছে—সংসারের স্থিতির জন্য আবশ্যক। যেদিন সে আবশ্যকতাটুকু চলে যাবে সেদিন সে জাত বা ব্যক্তির নাশ হবে। আমরা ভারতবাসী যে এত দুঃখ-দারিদ্র্য, ঘরে-বাইরে উৎপাত সয়ে বেঁচে আছি, তার মানে আমাদের একটা জাতীয় ভাব আছে যেটা জগতের জন্য এখনও আবশ্যক।" ইউরোপীয়দেরও তেমনি পৃথক পৃথক জাতিগত ভাবের বিশেষত্ব তিনি মানেন। এইসূত্রেই তাঁর পরমাশ্চর্য ব্যঙ্গোক্তি এই—"তবে বিদেশী, তুমি যত বলবান নিজেকে ভা'বো ওটা কল্পনা। ভারতেরও বল আছে মাল আছে—এইটি প্রথম বোঝ। আর বোঝ যে আমাদের এখনও জগতের সভ্যতা-ভাণ্ডারে কিছু দেবার আছে তাই আমরা বেঁচে আছি। এটি তোমরাও বেশ করে বোঝ—যারা অন্তর্বহিঃ সাহেব সেজে বসেছ এবং 'আমরা নরপশু হে ইউরোপীয় লোক আমাদের উদ্ধার কর' বলে কেঁদে কেঁদে বেড়াচ্ছ। আর যীশু এসে ভারতে বসেছেন বলে হাঁসেন হোঁসেন ক'রছ। ওহে বাপু, যীশুও আসেন নি, জিহোবাও আসেন নি, আসবেন না। তাঁরা এখন আপনাদের ঘর সামলাচ্ছেন, আমাদের

দেশে আসবার সময় নাই। এদেশে সেই বুড়ো শিব বসে আছেন, মা কালী পাঁঠা খাচ্ছেন আর বংশীধারী বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঐ বুড়ো শিব ষাঁড়ে চড়ে ভারতবর্ষ থেকে একদিকে সুমাত্রা, বোর্ণিও, সেলিবিস, মায় অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার কিনারা পর্যন্ত ডমরু বাজিয়ে এককালে বেড়িয়েছেন, আর একদিকে তিব্বত চীন জাপান সাইবেরিয়া পর্যন্ত বুড়ো শিব ষাঁড় চরিয়েছেন, এখনও চরাচ্ছেন। ঐ যে মা কালী—উনি চীন জাপান পর্যন্ত পূজা খাচ্ছেন, ওঁকেই যীশুর মা মেরী ক'রে ক্রীশ্চানরা পূজো করছে। ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড-কুড়িহাত রাবণ নাড়াতে পারেননি, ও কি এমন পাদ্রী ফাদ্রীর কর্ম!! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশি বাজাবেন—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন?"

এইভাবে ভারতীয় হিন্দু-মানসিকতার গভীর আশ্রয়ের ওপর জোর দিয়ে তিনি লেখেন—"আমাদের দেশে 'মোক্ষলাভেচ্ছার' প্রাধান্য, পাশ্চাত্ত্যে ধর্মের। আমরা চাই কি?—মুক্তি। ওরা চায় কি?—ধর্ম। ধর্ম কথাটা মীমাংসকদের মতে ব্যবহার হচ্ছে। তারপর 'ধর্ম' আর 'মোক্ষ' কথা দুটির তিনি এই ইঙ্গিত দেখিয়ে দেন—

> "ধর্ম কি?—যা ইহলোক বা পরলোকে সুখভোগের প্রবৃত্তি দেয়। ধর্ম হচ্ছে ক্রিয়ামূলক। ধর্ম মানুষকে দিনরাত সুখ খোঁজাচ্ছে, সুখের জন্য খাটাচ্ছে।
>
> মোক্ষ কি?—যা শেখায় যে, ইহলোকের সুখও গোলামি পরলোকেরও তাই।...এই মোক্ষমার্গ কেবল ভারতে আছে অন্যত্র নাই।"

তাঁর মতে—"এককালে এই ভারতবর্ষে ধর্মের আর মোক্ষের সামঞ্জস্য ছিল। তখন যুধিষ্ঠির, অর্জুন, দুর্যোধন, ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতির সঙ্গে ব্যাস, শুক, জনকাদিও বর্তমান ছিলেন। বৌদ্ধদের পর হতে ধর্মটা একেবারে অনাদৃত হ'ল, খালি মোক্ষমার্গই প্রধান হল। এই চিন্তাধারাতেই তিনি জানান, বৌদ্ধধর্মের বিস্তারের ফলেই অতীতে দুর্গতির সূচনা ঘটে। তাঁর কথায়—"যদি দেশশুদ্ধ লোক মোক্ষধর্ম অনুশীলন করে সে তো ভালই, কিন্তু তা হয় না, ভোগ না হলে ত্যাগ হয় না, আগে ভোগ কর, তবে ত্যাগ হবে।...যখন বৌদ্ধ রাজ্যে এক এক মঠে এক এক লাখ সাধু, তখনই দেশটি ঠিক উৎসন্ন যাবার মুখে পড়েছে।

বৌদ্ধ ক্রিশ্চান মুসলমান জৈন—ওদের একটা ভ্রম যে সকলের জন্য সেই এক আইন, এক নিয়ম। ঐটি মস্ত ভুল, জাতি-ব্যক্তি-প্রকৃতি ভেদে শিক্ষা-ব্যবস্থায় নিয়ম সমস্ত আলাদা। জোর ক'রে এক করতে গেলে কি হবে? বৌদ্ধরা বললে, 'মোক্ষের মতো আর কি আছে দুনিয়াসুদ্ধ মুক্তি নেবে চল।' বলি, তা কখন হয়? তুমি গেরস্থ মানুষ তোমার ওসব কথায় বেশি আবশ্যক নাই, তুমি তোমার স্বধর্ম কর,—এ কথা বলছেন হিন্দুর শাস্ত্র। ঠিক কথাই তাই। এক হাত লাফাতে পার না, লঙ্কা পার হবে। কাজের কথা? দুটো মানুষের মুখে অন্ন দিতে পার না—মোক্ষ নিতে দৌড়ুচ্ছ!! হিন্দুশাস্ত্র বলছেন যে, 'ধর্মে'র চেয়ে মোক্ষ'টা অবশ্য অনেক বড়, কিন্তু আগে ধর্মটি করা চাই। বৌদ্ধরা ঐখানটায় গুলিয়ে যত উৎপাত করে ফেললে আর কি। অহিংসা ঠিক, 'নির্বৈর' বড় কথা, কথা তো বেশ, তবে শাস্ত্র বলছেন—তুমি গেরস্থ, তোমার গালে এক চড় যদি কেউ মারে, তাকে দশ চড় যদি না ফিরিয়ে দাও, তুমি পাপ করবে। 'আততায়িন-মায়ান্তং' ইত্যাদি ( গুরুং বা বালবৃদ্ধৌ বা ব্রাহ্মণং বা বহুশ্রুতম্। আততায়িন-মায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন।—মনু ৮।৩৫০ )। হত্যা করতে এসেছে এমন ব্রহ্মবধেও পাপ নাই—মনু বলেছেন। এ সত্য কথা, এটি ভোলবার কথা নয়। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা—বীর্য প্রকাশ কর। সাম-দান-ভেদ-দণ্ড-নীতি প্রকাশ কর, পৃথিবী ভোগ কর, তবে তুমি ধার্মিক। 'ধর্ম' কার্যমূলক, কাজ করতে গেলেই কিছু 'পাপ' আসতে পারে। কিন্তু তিনি বলেন, তাতে কী? জড়তার চেয়ে সক্রিয়তা শ্রেয়। বিবেকানন্দ এই সূত্রেই জানান—"গরুতে মিথ্যা কথা কয় না, দেয়ালে চুরি করে না, তবু তারা গরুই থাকে, আর দেয়ালই থাকে। মানুষে চুরি করে মিথ্যা কয়, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়। সত্ত্বপ্রাধান্য অবস্থায় মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, পরম ধ্যানাবস্থা প্রাপ্ত হয়, রজঃপ্রাধান্যে ভালমন্দ ক্রিয়া করে, তমঃপ্রাধান্যে আবার নিষ্ক্রিয় জড় হয়।"

স্বামীজীর উপলব্ধিতে এবং শ্রীঅরবিন্দের উক্তিতেও ধর্মের সকর্মকতার তত্ত্ব সুপরিস্ফুট। ধর্ম কখনোই নিষ্ক্রিয়তা নয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, সাত্ত্বিক নিষ্ক্রিয়তা আর তামসিক নিষ্ক্রিয়তা-র মধ্যে পার্থক্য কোথায়? স্বামীজীর কথায়—"সত্ত্বপ্রাধান্যে মানুষ নিষ্ক্রিয় হয়, শান্ত হয়। কিন্তু সে নিষ্ক্রিয়ত্ব মহাশক্তির কেন্দ্রীভূত হয়ে হয়। সে শান্তি ( শান্তভাব ) মহাবীর্যের পিতা। সে মহা-পুরুষের আর আমাদের মতো হাত পা নেড়ে কাজ করতে হয় না। তাঁর ইচ্ছামাত্রে অবলীলাক্রমে সব কার্য সম্পন্ন হয়ে যায়। সেই পুরুষই সত্ত্বগুণপ্রধান

ব্রাহ্মণ, সর্বলোকপূজ্য।"—"সেই মহাপুরুষই 'অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' ইত্যাদি।" এই সাত্ত্বিকতার লক্ষণের সঙ্গে তামসিক নিষ্ক্রিয়তার তুলনা-প্রয়াসে তিনি লেখেন—"আর ঐ যে মিনমিনে পিনপিনে ঢোঁক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়া ন্যাতা সাতদিন উপবাসীর মতো সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না—ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ। ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন। ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ। অর্জুন ঐ দলে পড়েছিলেন বলেই তো ভগবান এত ক'রে বোঝাচ্ছেন না গীতায়? প্রথম ভগবানের মুখ থেকে কি কথা বেরুল দেখ—"ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ"; শেষ—"তস্মাত্তমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব"। ঐ জৈন বৌদ্ধ প্রভৃতির পাল্লায় পড়ে আমরা ঐ তমোগুণের দলে পড়েছি—দেশসুদ্ধ পড়ে কতই 'হরি' বলছি ভগবানকে ডাকছি, ভগবান শুনছেনই না আজ হাজার বৎসর। শুনবেনই বা কেন? আহাম্মকের কথা মানুষই শোনে না, তা ভগবান।"

আগে 'ধর্ম' তারপরে 'মোক্ষ' কামনা। এই কথার সমীচীনতা বুঝিয়েছেন তিনি। তাঁর মতে কেবল বৈদিক ধর্মেই ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ সাধনের উপায় আছে। তিনি জানিয়ে গেছেন—"বুদ্ধ করলেন আমাদের সর্বনাশ, যীশু করলেন গ্রীস-রোমের সর্বনাশ!!! তারপর ভাগ্যফলে ইউরোপীগুলো প্রটেষ্টাণ্ট ( Protestant ) হয়ে যীশুর ধর্ম ঝেড়ে ফেলে দিলে, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। ভারতবর্ষে কুমারিল্ল ফের কর্মমার্গ চালালেন, শঙ্কর আর রামানুজ চতুর্বর্গের সমন্বয় স্বরূপ সনাতন বৈদিক মত ফের প্রবর্তন করলেন। দেশটার বাঁচবার আবার উপায় হল।" অর্থাৎ যাঁরা বিবেকানন্দকে বুদ্ধদেবপ্রদর্শিত নির্বাণ-মার্গের সর্বাত্মক প্রশস্তিকারী বলে মনে করেন, তাঁরা স্বামীজীর প্র্যাকটিকাল বেদান্তবাদ ঠিক ঠিক অনুভব করেছেন বলা যায় না; স্বামীজী জানান—"বৌদ্ধধর্মের আর বৈদিকধর্মের উদ্দেশ্য এক। তবে বৌদ্ধ-মতের উপায়টি ঠিক নয়। উপায় যদি ঠিক হত তো আমাদের এ সর্বনাশ কেন হ'ল? কালেতে হয় বললে কি চলে? কাল কি কার্যকারণ সম্বন্ধ ছেড়ে কাজ করতে পারে?" 'স্বধর্ম বা জাতিধর্ম' অংশে তাঁর মন্তব্য—"উদ্দেশ্য এক হলেও উপায়হীনতায় বৌদ্ধরা ভারতবর্ষকে পাতিত করেছে। বৌদ্ধ বন্ধুরা চটে যাও, যাবে, ঘরের ভাত বেশি করে খাবে। সত্যটা বলা উচিত। উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়—"জাতিধর্ম স্বধর্ম যেটি বৈদিক ধর্মের—বৈদিক সমাজের ভিত্তি।" তিনি বলে গেছেন—এই জাতিধর্ম স্বধর্মই সকল দেশে সামাজিক

কল্যাণের উপায়—মুক্তির সোপান।—তবে নিধুরাম সিধুরাম যা জাতিধর্ম স্বধর্ম বলে বুঝেছেন, ওটা উল্টো উৎপাত।" তিনি গ্রাম্য আচারকে জাতিধর্ম বলেন নি। ফরাসী চরিত্রে যেমন রাজনৈতিক স্বাধীনতার প্রতি সহজাত আকর্ষণ, ইংরেজ চরিত্রে যেমন ব্যবসাবুদ্ধি, হিন্দুর তেমনি পারমার্থিক স্বাধীনতা। মোক্ষ চাই বটে, তবে তা ধর্মের পথ দিয়েই চাই। এই ধর্ম-চিন্তার এবং রাজনীতি-চিন্তার সমন্বয়ের মধ্যেই দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণের যথার্থ প্রতিনিধিত্বভিত্তিক সংস্থা গড়ে তোলায় অনিবার্য প্রয়োজনীয়তার দিকটি তিনি ১৮৯০-এর দশকেই দেখিয়ে গেছেন। কেবল শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও কিছু ধনীর প্রতিষ্ঠান মাত্র নয়, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে তিনি প্রলেতেরিয়েতের সংগ্রামী সংস্থা করে তুলতে চেয়েছিলেন। সে-কথা পরে আলোচিত হচ্ছে।

১৯

আজকাল অনেকেই জানেন এবং এই আলোচনায় আগেই বলা হয়েছে, ১৮৫০-এর দশকে কার্ল মার্কস ভারতের জনজীবনের বিষাদ বা 'melancholy-র দিকে বিশেষ ইঙ্গিত করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নিজের পথে স্বাধীনভাবে এগিয়ে ভারত-ভাগ্যের অর্থনৈতিক সংকট ও ব্যাপক বিষাদ কি না দেখেছেন? স্বধর্ম ও জাতিধর্ম পালন ব্যতিরেকে এই ব্যাপক বিষাদব্যাধি থেকে নির্ভরযোগ্য অন্য কোনো পরিত্রাণের উপায় নেই। এই কথাই খুঁটিয়ে বিচার করে গেছেন বিবেকানন্দ। জনজীবনের বিষাদ দূর করার চেষ্টা গান্ধীজী ও অন্যান্য বড়ো নেতারাও করে গেছেন বটে, কিন্তু সে আরো পরের ঘটনা।

তাঁর জীবনের প্রথমার্ধে স্পষ্টতই অরবিন্দ ছিলেন সহিংস বিপ্লবপন্থী, কিন্তু ১৯১০-এর পরে তিনি কি বলেছেন, তাও ভেবে দেখা দরকার। এ. বি. পুরানির মূল বইয়ের (Evening Talks) পশুপতি ভট্টাচার্য রচিত বঙ্গানুবাদে —শ্রীঅরবিন্দের 'সান্ধ্য বৈঠক'-এর প্রথম খণ্ডের' অবতরণিকা অধ্যায় থেকে তৃতীয় অংশের বেশ কিছু অংশ এখানে সোজাসুজি উদ্ধৃত হচ্ছে—যা থেকে অরবিন্দের পণ্ডিচেরি-পর্বের আগেকার মন-মেজাজের কতকটা ধারণা পাওয়া যাবে— "শ্রীঅরবিন্দ তেমন সামাজিক মানুষ ছিলেন না। ভিড়ের মধ্যে কখনই মেলামেশা করতেন না। তাঁর প্রকৃতি স্বভাবত গম্ভীর ছিল বলেই এমন, নতুবা

তিনি নিজেকে কখনো বড়োও মনে করেননি বা জগতের মানুষকে অবজ্ঞাও করেননি। বরোদায় অবস্থানকালে যদিও তিনি মহারাজার পারিষদবর্গের ক্লাবের সভ্যশ্রেণীভুক্ত ছিলেন তথাপি দৈবাৎ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধুদের সংসর্গই তিনি পছন্দ করতেন। ফুরসৎ থাকলে সন্ধ্যার সময়টা তাদের সঙ্গে বসেই কাটাতেন। বরোদা ছেড়ে যখন কলকাতায় আসেন তখন বৈপ্লবিক রাজনীতির ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্যে এমনই ব্যাপৃত হয়ে পড়লেন যে "সামাজিক জীবন" যাপনের কোনো সুযোগই তাঁর মিলল না। যেটুকু সময় পেতেন সেটুকু কাটতো রাজা সুবোধ মল্লিকের বাড়িতে কিংবা তাঁর গ্রে ষ্ট্রীটের বাসায়। "কর্ম্মযোগিন্" পত্রিকার কার্যালয়ে যখন থাকতেন তখন অফিস বন্ধের পরে অনেক রাত্রি পর্যন্ত কয়েকটি নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ করতেন কিংবা প্ল্যান্ চেটে স্বয়ংলেখনের চেষ্টা করতেন।...চন্দননগর থেকে শ্রীঅরবিন্দ যখন পণ্ডিচেরিতে এলেন তখন তিনি তীব্র সাধনায় রত হয়ে কয়েক মাস কারো সঙ্গে সাক্ষাৎই করলেন না। কিছুকাল পরে তিনি সন্ধ্যার সময়ে কারো সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলতেন কিংবা সেই স্বয়ংলেখনের প্রয়াস নিয়ে থাকতেন। সেই প্রয়াসের ফলেই "যৌগিক সাধন" নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক তখন লিখিত হলো। ১৯১৩ সালে শ্রীঅরবিন্দ উঠে গেলেন রু্য ফ্রাঁসোয়া মারত্যাঁ-র ৪১ নং বাড়িতে, সেখানে তিনি লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন সকাল ৯টা থেকে ১০॥০টার মধ্যে।"

পুরানি জানিয়েছেন, সেখানে স্থানীয় কয়েকজন ও অন্যান্যেরা তাঁর ঘরোয়া আলাপ শুনেছেন সন্ধ্যার দিকে। সেখানে বসবাসের সময়েই বিকেল্ চারটে-তে নিয়মিতভাবে উপস্থিত সকলেরই ধ্যানে বসা শুরু হয়। ধ্যানের পরে অরবিন্দের অবকাশ অনুসারে কতকটা অনিয়মিতভাবে সান্ধ্যবৈঠক বসতো। তারপর—"১৯২২ সালে শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা একত্রে গিয়ে উঠলেন রু দ্য লা মেরিনের ৯নং বাড়িতে, সেখানেও এমনি ধ্যান ও সান্ধ্য বৈঠকের ব্যবস্থা পূর্ববৎ চলেছিল। ১৯২৩ সালে আমি এলাম পণ্ডিচেরিতে সাধনের উদ্দেশ্য নিয়ে। তখন থেকেই চার পাঁচজন ভক্তকে নিয়ে সান্ধ্য বৈঠক বসতো। তাঁর দামী দামী কথাগুলি আমি খাতায় লিখে রাখতাম। গুরু সে সময়ে যা বলতেন তা আমি বিশদভাবে লিখে নিতাম, যদিও তাঁর অনুমতি নিয়ে নয়।"

উপস্থিত আলোচনায় এই সান্ধ্য বৈঠকের নানা প্রসঙ্গই আগে ব্যবহার করা হয়েছে, পরে আরো দেখা যাবে। এখানে প্রধানত এইটুকুই ভেবে দেখা দরকার

যে, শ্রীঅরবিন্দ রক্তমাংসের মানুষের জীবনই যাপন করেছেন,—এক অভিজ্ঞতা থেকে অন্য অভিজ্ঞতার দিকে এগিয়ে গেছেন তিনি। বিষাদ তাঁকে তার গতি-পথে কোথাও ক্লান্ত করতে পারেনি। তাঁর পথে ছিল নিত্য-উত্তরণের প্রেরণা। তাঁর জীবনী আলোচনা করতে গেলে এই প্রসঙ্গ বারবার এসে পড়ে। ১৮৯৩ থেকে ১৯০৭-০৮ পর্যন্ত একরকম, আলিপুর কারাপর্বে ও তারপরে অন্যরকম, তাঁর গতি কি পরস্পর-বিযুক্ত এই দুই অভিমুখীনতায় বিভাজ্য? স্থিরভাবে ভেবে দেখলে বলতেই হয়, পরবর্তীকালে বা প্রায় সমকালে গান্ধীজীর জীবনে যেমন 'সত্য' সম্পর্কিত নিজস্ব পরীক্ষা চলছিল, শ্রীঅরবিন্দের ক্ষেত্রেও কতকটা সেইরকমই ঘটে। পূর্বোক্ত 'সান্ধ্য বৈঠকে' (নভেম্বর ১৯৬৩) থেকে ২০-২১ পৃষ্ঠার এই অংশটুকুও পুরোপুরি তুলে দেওয়া হোলো—"১৯০৭ সালে সুরাটে যেবার কংগ্রেস ভেঙে যায়, শ্রীঅরবিন্দ তাতে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছিলেন। সুরাট থেকে তিনি আসেন বরোদায়, সেখানে বংকানের থিয়েটারে ও ডাণ্ডিয়া বাজারে প্রফেসর মানিক রাও-এর পুরোনো আখড়াতে তিনি যে বক্তৃতাগুলি করেন তাতে শ্রোতাদের কেবল মন হরণ করেই নেয়নি কিন্তু অনেকের জীবনের ধারাই তার দ্বারা পাল্টে গিয়েছিল। আমিও সে বক্তৃতা শুনেছিলাম যদিও তার সবটা বুঝতে পারিনি। কিন্তু তারপর থেকে আমার মধ্যে একটা নিত্যকার প্রত্যয় রয়ে গেল যে তিনি আমার পূর্বজানিত মানুষ, যদিও ঠিক কখন থেকে জেনেছি তা বলা শক্ত। তবে একথা বলতে পারি যে ভারতের রাজনৈতিক জীবনে জাতীয় আন্দোলনের জোয়ারের সঙ্গেই তার সূত্রপাত। এর পরের যুগের লোকেরাও বিপ্লবের দুই তিন প্রস্থ প্রবল বন্যা প্রত্যক্ষ করেছে। কিন্তু সেই প্রথম বন্যাটাই ছিল অনন্যসাধারণ। ভারতের জাতীয় চেতনার সেই প্রথম মহাজাগরণেই দেশের রাজনৈতিক লক্ষ্য সুস্পষ্ট হলো—চাই স্বাধীন রাষ্ট্র। তারপর থেকে চলেছিল আন্দোলনের জোয়ার-ভাঁটা, শেষে ১৯৪৭ সালে তার ফল মিলল।"

পূর্বোক্ত মূল রচনার বঙ্গানুবাদে আরো দেখা যায়, "এই স্বাধীনতার আন্দোলনে নেতারা তাঁদের সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। তার মধ্যে কেউ কেউ মাত্র রাজনৈতিক মুক্তির দিগন্ত ছাড়িয়ে মানবে পূর্ণতার আদর্শ দৃষ্টিগোচর করেছিলেন। কারণ, স্বাধীন হওয়াই ভারতের শেষ কথা নয়, যদিও তার আত্মিক আদর্শ বিকাশের পক্ষে অধীনতামুক্ত অবস্থায় আসা খুব প্রয়োজন। মানব-মুক্তির জন্যে আগে বন্ধনমুক্তি চাই। স্বামী শ্রদ্ধানন্দ, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য,

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি এঁরা সকলে দুই ভাবেরই প্রেরণাতে উদ্‌বুদ্ধ হয়েছিলেন। জগতে মানব-আত্মার মুক্তির ও পরিণতির অনেকে অনেক রকম কল্পনা করেছেন, তার মধ্যে আমার মনে হলো যে শ্রীঅরবিন্দের সর্বসমন্বয়কারী পূর্ণ পরিণতির আদর্শ ও ভবিষ্যৎ দৃষ্টি সর্বাপেক্ষা যুক্তিগ্রাহ্য ও সন্তোষজনক।"

২০

এ-সবই পৃথক পৃথক ব্যক্তির ব্যক্তিগত ধারণা। ভারতের 'মানবমুক্তি' বা বিশ্বের 'মানবমুক্তি' একরকম স্বপ্নকল্পনা বটে। অর্থনৈতিক বৈষম্য থেকে, শিক্ষা ও অশন-বসনের অভাব থেকে মানুষকে মুক্ত করা শুধু উচ্চ স্বপ্নে সম্ভোগের কাজ নয়। যোগ্য সংগঠন, যাবতীয় বাধা অপসারণ ইত্যাদি চিরজাগ্রত কর্মসূচী ব্যতিরেকে সে স্বপ্ন কখনো সফল হয়? শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগে এ. বি. পুরানির সাক্ষাৎও হয়নি। পশুপতি ভট্টাচার্যের অনুবাদে পুরানির নিজের কথা—"কিন্তু যদিও আমি এতোকাল দূর থেকেই তাঁকে দেখেছি এবং অহেতুক তাঁকে নিতান্ত আপনজন বলেই জ্ঞান করেছি, তথাপি কাছে গিয়ে কখনো আলাপ করিনি। ১৯০৭ সালে বরোদায় থাকতে তিনি আমার অগ্রজ স্বর্গত সি. বি পুরানিকে বিপ্লবী কাজের কিছু পরিকল্পনা দিয়েছিলেন, তা যখন বাস্তবে পরিণত করার কথা উঠল তখন আমি ভাবলাম এ বিষয়ে আগে শ্রীঅরবিন্দের সমর্থন গ্রহণ করা দরকার। তাঁর ভাই বারীন্দ্র আমার ভাইকে বোমা তৈরী করার ফর্মুলা শিখিয়ে দিয়েছিলেন। আর আমিও কাজে নামবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলাম। অর্থাৎ তাঁর এই সংকল্প বা বাসনা ১৯১৮-র। সেই ১৯১৮-তে পণ্ডিচেরিতে ৪১ নম্বর র‍্যু ফ্রাঁসোয়া মার্ত্যায় শ্রীঅরবিন্দ বাস করতেন এবং আর্য পত্রিকার আপিশ ছিল সেখানে। সেই সময়ে তিনি পুরানিকে স্পষ্টই বলেন—"স্বাধীনতার জন্য কোনো বিপ্লব প্রচেষ্টা করার দরকার না হতে পারে।" সেই ১৯১৮তে ১৯০৭-এর পরিচিত বিপ্লবী অরবিন্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেনি বলেই বিষয়টিকে অসংগত ভাবা কি যুক্তিযুক্ত?

এ. বি. পুরানিকে তিনি তখন সোজাসুজি বলেন—"ভারত নিজেই এখন স্বাধীন হতে মনস্থ করেছে। সুতরাং তার জন্য আপনা হতেই কত নেতা ও কর্মী এসে তাদের হয়ে যা করবার তাই করবে। কিন্তু যোগের পথে সকলকেই ডাকা

হয় না। তোমার কাছে যখন সে ডাক এসে গেছে,তখন তাতেই নিজেকে নিয়োগ কর না কেন? অবশ্যই তুমি যদি বিপ্লবের কাজই করতে চাও সে তোমার ইচ্ছা, কিন্তু আমার তাতে সমর্থন নেই।"

সেদিন পুরানি এইটুকু শুনেই ক্ষান্ত হননি। এব পরবর্তী সংলাপ চিন্তাকর্ষক।

পুবানি বলেন—"কিন্তু আপনিই আমাদেব এই কাজে প্রেরণা দিয়েছেন। এখন তাতে সমর্থন দান কবতে নারাজ হচ্ছেন কেন?

"—তাব কাবণ আমি নিজেই একাজ করে দেখেছি, এব যে কতরকম বিপত্তি সে আমি জানি। আদর্শ পেয়ে আর উৎসাহ নিয়ে যুবকেরা দলে দলে এসে জোটে এই আন্দোলনে; কিন্তু তাদের মধ্যে নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা অতি কঠিন হয়। তাদেব উৎসাহ বেশিদিন টেকে না। নিজেদেব মধ্যেই আলাদা আলাদা দল পাকায়, পরস্পরের মধ্যে রেষারেষি চলতে থাকে এমন কি একজন আর একজনের শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। নেতা হবার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা লেগে যায়। গভর্ণমেণ্টের চর এসে ওদের মধ্যে ঢুকে পড়ে। তাতেই সব ফেঁসে যায়। কখনো কখনো তাদের মধ্যে এমন হীনতা আসে যে তাবা সামান্য পয়সাকড়ি নিয়ে ঝগড়া বাধায়।"

এই সব আলোচনার অনেক আগে তাঁব প্রথম ইংবেজিতে লেখা রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলির মধ্যে ১৮৯৩-এর ৭ই আগষ্ট বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তাঁব কেমব্রিজের বন্ধু কে. জি. দেশপাণ্ডের অনুরোধে 'পুবোনো আলোর বদলে নতুন আলো' পর্যায়ের যে প্রবন্ধটি লেখা হয়, তাতে তিনি জানান যে যদি কেউ বলেন তৎপূর্বেই কংগ্রেস বা আমাদের জাতীয় মহাসভা দেশকল্যাণের কিছু কিছু অবাক কাণ্ড ঘটিয়েছে, তর্কের খাতিরে তা অংশত মেনে নিয়েও বলেন যে, কংগ্রেস তখন এক উৎসাহের কেন্দ্র ছিল বটে, কিন্তু 'অবাক কাণ্ড' কিছুই ঘটেনি—"if he goes on and tells me that the Congress has achieved miracles, I shall certainly take leave to deny the truth of his statement." তাঁর মতে রাজনীতির ক্ষেত্রে সেকালের কংগ্রেসের সর্বাধিক কৃতিত্ব ছিল ব্যবস্থাপক সভাগুলিব আয়তন বা পরিধি বাড়ানো—"in the sphere of active politics its greatest success is to befound in the enlarge-

ment of the Legislative Councils. দ্বিতীয় রচনা ১৮৯৩-এর ২১এ অগস্টে প্রকাশিত হয় এবং তাতে তিনি জানান যে, ফিরোজ শা মেহেতার মতন জনপ্রিয় বাগ্মী বলেছেন বটে যে, কংগ্রেস আমাদের একযোগে কাজ করবার প্রেরণা দিয়েছে, কিন্তু তা মোটেই সত্য নয়—"there is not the slightest evidence to show that we have at all learned to act together the one lesson we have learned is to talk together, and that is a rather different thing." এই প্রবন্ধেই তিনি কংগ্রেস পত্তনের ন'বছর পরে তার আত্মসমালোচনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হবার সংগত দাবি উত্থাপন করেন। ২৮এ অগস্টের তৃতীয় প্রবন্ধে আরো তীব্রভাবে কংগ্রেসের অপূর্ণতা বা 'inadequacy' সম্পর্কিত' অভিযোগ তুলে ধরেন। তিনি জানান—"the National Congress was not really national and had not in any way attempted to become *national.* কলকাতার মনোমোহন ঘোষ বোম্বাইয়ের ফিরোজ শা মেহেতার মন্তব্যই সমর্থন করে জানান যে, কংগ্রেস তখনকার চিন্তাশীল ভারতীয়ের প্রতিনিধিত্ব করেছে এবং সেই সংস্থার দায়িত্ব ছিল দেশের অবোধ-অজ্ঞানদের পরিচালিত করা,—তাতেই কংগ্রেস হয় 'জাতীয়' সংস্থা। এই বিষয়টি দেখিয়ে শ্রীঅরবিন্দ লেখেন—"the National Congress may be as national as you please, but it is not a popular body and has not in any way attempted to become a popular body." তাঁর বক্তব্য ছিল—তখনকার কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের প্রতিষ্ঠান ছিল না, —ছিল সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীরই প্রতিষ্ঠান। ব্রিটিশ উপকরণের আমদানীতে অভ্যস্ত ব্রিটিশ শাসনাধীন অল্পবিত্তর কৃতিত্বজয়ী সাংবাদিক, ব্যারিস্টার, ডাক্তার প্রভৃতি মধ্যবিত্তের দলই ইংরেজি কায়দায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মতাদর্শ গড়ে তুলছিলেন। ১৮৯৩-এর ১০ই সেপ্টেম্বরের 'ইন্দুপ্রকাশ'-এর চতুর্থ প্রবন্ধে ফিরোজ শা মেহেতা, উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রিটিশের ন্যায়-বোধের ওপর নির্ভর করে ভারত বনাম ঈঙ্গ-ভারতীয় বিবাদের ফয়সালা চেয়ে-ছিলেন মাত্র। ইংলণ্ডের রাজনৈতিক প্রগতি সাত শতাব্দে যাহা হয়েছে তার তুলনায় পাঁচটি বছরে ফ্রান্সের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো কি অনেক বেশি বদলায়নি ? এই ছিল অরবিন্দের প্রশ্ন। এইসূত্রেই তিনি লেখেন—Rather we know that the first step of that fortunate country towards progress was not through any decent and orderly expansion.

but through a purification by blood and fire. It, was not a convocation of respectable citizens, but the vast and ignorant proletariate, that emerged from a prloonged and almost coeval apathy and blotted out in five terrible years the accumulated oppression of thirteen centuries.' ফরাসী জাতির সংগ্রামের এই উল্লেখের সঙ্গে সঙ্গে তিনি আয়ার্ল্যাণ্ডে কেল্ট ও টিউটন জাতিবৈরের উদাহরণ সহযোগে খুবই ব্যঙ্গদিগ্ধ ভঙ্গিতে আমাদের কংগ্রেসী বার্ষিক মিলনের একেবারে বিপরীত দৃষ্টান্ত—ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে আইরিশদের আন্দোলনের প্রসঙ্গ তুলে ধরেন। আমেরিকা ও ইটালির কথাও উঠেছিল। আলোচনার তীব্রতায় তাঁর সেই লেখাগুলি খুবই স্মরণীয়। মাধব গোবিন্দ রানাডে তাতে শঙ্কিত হন এই ভেবে যে ব্রিটিশ সরকার সেসব লেখা দেখে স্বদেশী আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করতে পারে। ১৮৯৩-এর ৩০শে অক্টোবরের পঞ্চম প্রবন্ধে তিনি ইংরেজের তুলনায় ফরাসী জাতির সাংস্কৃতিক বোধের শ্রেয়ত্বের কথা আলোচনা করেন। ১৮৯৩-এর ১৩ই নভেম্বরের ষষ্ঠ নিবন্ধে ফরাসী জাতির ইংরেজের রাজনৈতিক যন্ত্রের অনুসরণের প্রসঙ্গও দেখান। ঐ বছর ৪ঠা ডিসেম্বর বেরোয় সপ্তম নিবন্ধ। তারপর অষ্টম ও নবম নিবন্ধ। ১৮৯৩-এর মার্চের মধ্যেই এসব বেরিয়ে গেছে। অরবিন্দের অন্তরে তখনো ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের প্রেরণা এবং অন্যান্য ঐতিহ্য-সূত্রের মধ্যে বিশেষভাবে গীতার পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের বাণী। আয়ার্ল্যাণ্ডের সংগ্রামী শক্তি তিনি নিজেই বিলেতে অনুভব করে এসেছেন। পারনেল সম্বন্ধে তাঁর পূর্বোল্লেখিত কবিতা এই সূত্রেও মনে পড়ে। সেই সঙ্গে গীতার প্রেরণাও ভোলা যায় না।

২১

রামকৃষ্ণ সংঘের সন্ন্যাসী স্বামী প্রভবানন্দ তাঁর 'দি স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ অফ ইণ্ডিয়া' সম্পর্কিত আলোচনার সূচনাতেই যা লেখেন, শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রমের শ্রীমাধব পুণ্ডলিক পণ্ডিত তাঁর 'শাইনিং হারভেষ্ট'-এর বিশেষ একটি অধ্যায়ে ( দি স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ অফ ইণ্ডিয়া : পৃষ্ঠা ১১২-১৬৬ ) তারই প্রতিধ্বনি করে জানান যে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের মতন নয়, ভারতীয় দর্শন সত্যিই দর্শন, উপলব্ধি, প্রত্যক্ষ জ্ঞান। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপনিষদ হোলো যথাক্রমে ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস স্তরের বেদ-বিভাগ। বেদ অপৌরুষেয় অর্থাৎ তা পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মমতের মতন বিশেষ কোনো মহাপুরুষের বাণী নয়। উপনিষদ-গুলি ঋষিদের উপলব্ধিরই বিবরণ। তাতে ঋষিরা কী ভাবেন সেকথা নয়, তাঁরা কী জেনেছেন, সে-কথাই বলা হয়েছে।

গীতাও উপলব্ধির সাক্ষ্য। আলোচক এই সূত্রে অরবিন্দের উক্তি তুলে দেখিয়েছেন—এবং সেখানে তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—"One who perhaps of all the modern intepreters of the Gita has best caught the spirit of the poem." গীতার কর্মযোগ প্রসঙ্গে যথার্থ স্বধর্ম পালনের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। যোগীর মানসিকতা নিয়েই তা করা দরকার। শ্রীমাধব পণ্ডিতের পূর্বোক্ত গ্রন্থে অরবিন্দের উক্তি পুনরায় তুলে দেখানো হয়েছে—"An inner situation may even arise, as with the Buddha, in which all duties have to be abandoned, trampled on, flung aside in order to follow the call of the Divine within. I cannot think that the Gita would solve such an inner situation by sending Buddha back to his wife and father and the Government of the Sakya State or would direct a Ramakrishna to become a pandit in a Vernacular school and disinterestedly teach little boys their lessons, or bind down a Vivekananda to support

his family and for that to follow dispassionately land or medicine or journalism."

ব্রহ্মবোধের প্রেরণায় পার্থিব সংস্কার যে সম্পূর্ণ ঘুচে যেতে পারে, অরবিন্দের রাজনীতি-সম্পর্কিত এই ধ্যান-ধারণার কথা ভাবতে গেলে তাঁর এই বিশ্বাস ভোলা যায় না। গতানুগতিক ভাবে তাঁর মতামতের অনুস্যূত সংগতি খুঁজবেন যাঁরা, তাঁদের পক্ষে এই কথাগুলি স্মরণযোগ্য। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দ, রামমোহন ও রবীন্দ্রনাথ এবং তিলক প্রভৃতি দেশনেতাদের চিন্তা পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেন নি। কিন্তু তাঁর নিজস্ব উপলব্ধিই এক্ষেত্রে দেখা দরকার। রামমোহন যে নতুন ভারতের অন্যতম নেতৃস্থানীয় নির্মাণকর্তা ছিলেন সেকথা রবীন্দ্রনাথ তো বলেইছেন, অন্যান্য ঐতিহাসিকেরাও লিখেছেন। কিন্তু প্রত্যেক আলোচকেরই নিজস্ব বিচারপদ্ধতি থাকে। এখানে এই সূত্রেই রামমোহনের কথা পুনরায় ওঠা স্বাভাবিক।

উপস্থিত আলোচনার প্রথম খণ্ডের তৃতীয় প্রসঙ্গে রামমোহনের জীবনকথা প্রধানত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা অনুসরণে বিবৃত হয়েছে। সেই সূত্র ধরেই রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলা দেশের ইতিহাস' (আধুনিক যুগ: তৃতীয়-খণ্ড; দ্বিতীয় সংস্করণ, মাঘ, ১৩৮১) থেকে এখানে কয়েকটি মন্তব্য উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। রমেশচন্দ্রের ভাষায়—"রামমোহনের বাল্যকাল সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ বিশেষ কিছু জানা যায় না। কথিত আছে যে তিনি বাড়ীতে ফার্সী, পাটনায় আরবী এবং কাশীতে সংস্কৃত শিক্ষা করেন। ইহা কতদূর সত্য বলা যায় না, তবে তিনি যে এই তিনটি ভাষাই জানিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।" ষোলো বছর বয়সে হিন্দু প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে একখানি বই লেখার জন্যে তাঁর পিতার সঙ্গে মনোমালিন্য এবং তারই ফলে রামমোহনের গৃহত্যাগ ও চারবছর দেশবিদেশ-ভ্রমণ সম্পর্কিত কাহিনী এবং তাঁর তিব্বত যাত্রার কাহিনী,—ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে রমেশচন্দ্র লেখেন—"এই দুইটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীর সামঞ্জস্য করা কঠিন।" তিনি আরো লেখেন—"এমন কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নাই যাহাতে বলা যায় যে, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বে রামমোহনের ধর্মমতের পরিবর্তন হইয়াছিল। প্রায় ত্রিশ বৎসর বয়সে (১৮০৩-০৪ সনে) লিখিত তুহফাৎ-উল-মুয়াহ্‌হিদীন নামক আরবি ও ফার্সী ভাষায় লিখিত একখানি গ্রন্থে ইহার

প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে তিনি হিন্দুগণের প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেন। ভাল করিয়া ইংরেজি শেখার এবং কলিকাতায় আসার পর তিনি সর্বপ্রথম ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ করেন। এই আন্দোলনের মূল সূত্র ছিল যে প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, সুতরাং বহু দেব-দেবীতে বিশ্বাস ও তাঁহাদের প্রতিমা পূজা করা প্রকৃত হিন্দুধর্মের বিরোধী। এই উদ্দেশ্যে তিনি বেদান্তের ভাষ্য রচনা করেন এবং 'ঈশ', 'কেন', 'কঠ' প্রভৃতি উপনিষদ প্রকাশ করেন। গ্রন্থ রচনা ছাড়া ব্রহ্মসম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৮১৫ সনে তিনি 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন। এই সভায় বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা, শাস্ত্র আলোচনা ও ব্রহ্মসংগীত হইত।"

রামমোহনের ধর্মমতে প্রথমে অনেকে আকৃষ্ট হন কিন্তু ক্রমে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজে তাঁর বিরোধিতা শুরু হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে 'ইউনিট্যারিয়ান কমিটি' নামে খ্রীষ্টান ধর্মমত অবলম্বনে গৃহীত আর এক সভা স্থাপন করেন তিনি। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭-এ আগষ্ট তাঁর 'ব্রহ্মসমাজ' 'তথা 'ব্রহ্মসভা'র প্রথম অধিবেশন হয়। ১৮৩০-এর ২৩এ জানুয়ারি এই শেষোক্ত সভার নতুন বাড়ি তৈরী হয়। রমেশ-চন্দ্রের কথায়—"প্রতি শনিবার সন্ধ্যাকালে এই সভার অধিবেশনে বেদ ও উপনিষদ পাঠ, বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা এবং সংগীত হইত।"—এবং—"বস্তুতঃ রামমোহন কোনদিনই একটি বিশিষ্ট স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করিবার কল্পনা করেন নাই—হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, ইহুদী সকলেই এই উপাসনায় যোগ দিতেন।"—"পৌত্তলিকতা বর্জন ও একেশ্বরবাদ যে হিন্দুশাস্ত্রসম্মত তিনি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন এবং যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিমাত্রেরই চিন্তার স্বাধীনতাকে প্রাধান্য দিয়া সামাজিক অনুশাসন ও প্রচলিত শাস্ত্রবিধি ইহার বিরোধী হইলে তাহা অমান্য করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া হিন্দুসমাজে যেমন নবপ্রতিষ্ঠিত সমাজেও তেমনি প্রবল আকারে দেখা দিল। ইহার ফলে একদিকে যেমন হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট পরিবর্তন হইল, তেমনি তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসমাজ সার্বজনীন উদার ধর্মমতের আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া একটি স্বতন্ত্র ধর্মসম্প্রদায়ে পরিণত হইল।"[২২]

রামমোহনের জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের পরেই মোহিতলাল মজুমদার রামমোহন সম্পর্কে প্রচলিত 'যুগ প্রবর্তক মহাপুরুষ' ধারণার প্রতিবাদ করেন, হিন্দুসমাজ

---

২২। রমেশচন্দ্রের পূর্বোক্ত গ্রন্থের পৃষ্ঠা ১৬৭-৬৭ দ্রষ্টব্য।

সম্বন্ধে ব্রাহ্মদের উপেক্ষার দিকটিই যে রামমোহনের অতিবন্দনার কারণ, তিনি তাও জানান এবং লেখেন যে, ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ পর্যন্তই ছিল রামমোহনের কীর্তিকাল; সেকালের বাঙালি রামমোহনকে গ্রহণ করেননি,—"পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যে একেশ্বরবাদ তিনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহার বৈদান্তিক ব্যাখ্যা তাঁহার স্বকপোলকল্পিত কিন্তু হিন্দুর ধর্মসাধনার ইতিহাসে এই সেমিটিক ঈশতত্ত্ব কুত্রাপি নাই—উপনিষদেও নাই। ব্রহ্মবাদ একেশ্বরবাদ নহে—অদ্বৈততত্ত্ব Monotheism নহে।"—"তিনি পৌত্তলিকতার যে ধারণা করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ বিজাতীয় মনোভাবের পরিচায়ক।"—তিনি কোনোরকম ধর্মসাধক ছিলেন না।—তাঁর সমাজসংস্কার পুরোপুরি অস্বীকার্য নয়, তবে বিদ্যাসাগরের মতন সমাজের দুঃখে দুঃখী হয়ে তাঁর সমাজসংস্কারকর্ম সমাজের ভিতরের কাজ নয়, এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তনে তিনিই আদি ও একক ব্যক্তি ছিলেন না, রাজা রাধাকান্ত দেব, গোপীমোহন ঠাকুর প্রভৃতিও কম স্মরণীয় নন। রামমোহনকে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের স্রষ্টা বলতেও মোহিতলাল নারাজ। মোহিতলালের মতে,—রামমোহন রাষ্ট্রচিন্তার ক্ষেত্রেও মোটেই দূরদৃষ্টির পরিচয় রেখে যাননি।[২৩]

## ২২

রামমোহন-প্রসঙ্গে এখানে এতদধিক বিস্তারের প্রয়োজন নেই। বরং অরবিন্দের গীতাচর্চা, যোগ ও রাজনীতি ভাবনার কথাসূত্রে প্রথম খণ্ডের ১৩-৩৫ পৃষ্ঠায় যেসব কথা লেখা হয়েছে সেই সূত্র ধরে ১৯০৬-০৭ সালের দিকে এই সুযোগে আর একবার চোখ ফেরানো যাক। ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষের 'ঋষি অরবিন্দ' বইটির কথা আগেই বলা হয়েছে। সেই বইয়ের ৮৫-৮৬ পৃষ্ঠা থেকে কয়েকটি অংশ তুলে দেখলে সংক্ষেপে অরবিন্দের তখনকার রাজনৈতিক-আধ্যাত্মিক মনোভাব ও কর্মপন্থা এবং তখনকার কিছু কিছু ঘটনাও এখানে নজরে আনা যাবে। 'বন্দে-মাতরম্' পত্রিকায় 'নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ' সম্পর্কিত শ্রীঅরবিন্দের প্রবন্ধগুলির বিষয়ে ডঃ ঘোষের উল্লেখ এইরকম—"বন্দেমাতরম্"-এ লেখা শ্রীঅরবিন্দের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে প্রবন্ধগুলি পড়ে চিত্তরঞ্জন প্রমাণ করতে চাইলেন যে এই ছিল 'তাঁর রাজনৈতিক মত এবং তা মোটেই রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অপরাধ বলে

২৩। 'বিবিধকথা' (ভাদ্র, ১৩৪৮): মোহিতলাল মজুমদার প্রণীত; 'রামমোহন রায়' দ্রষ্টব্য।

গণ্য নয়। শ্রীঅরবিন্দ এই নীতির কোন বাস্তব প্রয়োগ করেননি।" ডঃ ঘোষের পুনরপি মন্তব্য—"নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে প্রবন্ধ নিছক রচনা মাত্র। সশস্ত্র বিপ্লবের পথে তিনি বিশ্বাস করতেন সে সময়। এই বোমার মামলার এক আসামী বন্ধুর কাছে শুনেছি এই বোমা তৈরী ইত্যাদি ব্যাপারে তাঁর পুরা সমর্থন ছিল। তাঁর ব্যারিস্টার (চিত্তরঞ্জন দাস) তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তা শ্রীঅরবিন্দেরই অস্বীকৃতি। ইহা সত্য নয়। হিংসাত্মক পথ অবলম্বন করলে মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয়।" অতঃপর ডঃ ঘোষ শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের 'স্মৃতির পাতা' থেকে নলিনীকান্তের এই মন্তব্য দেখিয়েছেন—"জেলে বসে শ্রীঅরবিন্দের লেখা সম্বন্ধে বলতে গেলে একটি গূঢ় গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করতে হয়। তিনি একটি প্রবন্ধমালাই লিখেছিলেন বোমা সম্বন্ধে। কাগজপত্রে বোমাতন্ত্রীদের গালাগালি দেওয়া হত তাদের সম্বন্ধে ভুল মিথ্যা অভিযোগ সব আনা হত, তাই তাদের স্বপক্ষের উকিল হয়ে যেন তিনি কলম ধরলেন। বোমাতন্ত্রের বিশদ ব্যাখ্যা তিনি দিলেন চারটি প্রবন্ধে, তাদের নাম এখনো আমার মনে আছে: 1. The Message of the Bomb. 2. The Morality of the Bomb. 3. The Psychology of the Bomb, 4. The Policy of the Bomb. লেখাগুলি আমার কাছে ছিল এবং তা বাইরে পাঠিয়ে দিই আমার এক বন্ধুর হাত দিয়ে। কিন্তু বাইরে পুলিশের শ্যেনদৃষ্টি, খানাতল্লাস প্রভৃতি নিত্যনৈমিত্তিক বিপদআপদ থেকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য বন্ধুবর লেখাগুলি একটি বাঁশের চোঙায় বন্ধ করে মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিলেন। কিছুদিন পরে খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন সব উইপোকার কল্যাণস্পর্শে ধূলিমুষ্টিতে পরিণত হয়েছে।"

এসব ঘটনার আগের—জেলখানার বাইরের আর এক পর্বের প্রসঙ্গে ডঃ ঘোষের উক্তি—"১৯০৬ সালে কলকাতা কংগ্রেসে দুই দলই (নরম ও চরম) একমত হয়ে প্রস্তাব পাশ করে। কিন্তু ক্রমে দুই দলের মধ্যে তফাৎ দেখা দেয়। ১৯০৭ সালে নভেম্বর মাসে মেদিনীপুরে বাংলা প্রাদেশিক সম্মিলনে সে ভেদ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। নরম দলের একজন ছিলেন সভাপতি। গরম দল ছিল সংখ্যালঘিষ্ঠ। তারা সভাপতির একটি নির্দেশ যুক্তিযুক্ত নয় বলে বেরিয়ে যায় এবং আলাদা সভা করে। এদের নেতা শ্রীঅরবিন্দ।"

তারপর ১৯০৭-এর ডিসেম্বরে সুরাট কংগ্রেসের দক্ষযজ্ঞ ঘটে যায়। গরম দলের নেতা ছিলেন সেখানে তিলক। সেখানেও গরম দল সংখ্যালঘিষ্ঠ

(প্রতিনিধি সংখ্যা ১১০০) এবং নরম দল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল (প্রতিনিধি সংখ্যা ১৩০০)।

১৯০৪ থেকেই অরবিন্দ প্রাণায়াম আরম্ভ করেন, ১৯০৭-এর সুরাটের ব্যাপারের পরে বরোদায় এসে বারীন ঘোষের অনুরোধে সেখানে উপস্থিত মহারাষ্ট্রের বিবাহিত যোগী বিষ্ণু ভাস্কর লেলের সঙ্গলাভ করেন, প্রথম খণ্ডের পূর্বোক্ত অংশে এসব কথাও বলা হয়েছে। ১৯০৮-এর ১৯এ জানুয়ারি বোম্বাইয়ে 'বর্তমান অবস্থায় কি প্রয়োজন' সম্বন্ধে অরবিন্দ যে বক্তৃতা দেন, সে বিষয়ে ডঃ ঘোষের মন্তব্য—"এই বক্তৃতায় ধর্ম ও রাজনীতির অপূর্ব মিলন।"

## ২৩

অরবিন্দকে যাঁরা ১৯১০-এর পরে রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র থেকে 'পলাতক' মনে করেন তাঁরা আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ভিত্তিতেই যে তাঁর দেশপ্রেম ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্ম,—সেই বিশেষ সত্য খতিয়ে দেখতে চাননা। গান্ধীজীর 'সত্যাগ্রহ' এবং 'ঈশ্বর সত্যস্বরূপ'—এই ধারণার সঙ্গে গান্ধীজীর নানা রাজনৈতিক আন্দোলন ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল না কি? রাজনৈতিকতা কি কূটনীতি মাত্র? গান্ধীজীর 'প্রত্যাদেশ' কি তাঁর অনস্বীকার্য গভীর বোধির ব্যাপার নয়? শ্রীঅরবিন্দ তাঁর একই কালপর্বে রচিত 'দি হিউম্যান সাইক্‌ল্' এবং 'দি আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটি'তে মানুষের রূপান্তর সম্ভাবনার চিন্তা সুনিপুণভাবে প্রকাশ করে গেছেন। চলতি সমাজ-দর্শনের অপূর্ণতা আলোচনা করে তিনি ব্যক্তি ও সমাজের পূর্ণ বিকাশের পথ দেখিয়ে গেছেন তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি অনুসারে। স্বামী বিবেকানন্দের 'স্বদেশমন্ত্র' ও বিশ্বকল্যাণবোধ তাঁকে অবশ্যই অনুপ্রেরিত করে থাকবে—অথবা এই কথাই বলা ভাল যে—গোঁড়ামিবর্জিত যুক্তিবাদী মনের ঊর্ধ্বগতিই তাঁকে দিব্যতানিষ্ঠ রেখেছিল।

শ্রীঅরবিন্দের প্রথম দিকের রাজনীতি সম্বন্ধে David L. Johnson-এর বই 'The Religious Roots of Indian Nationalism' (১৯২১)-এর ভূমিকায় লেখকের এই মন্তব্য দেখা যায় যে, আধুনিক ভারতের ছাত্রদের মধ্যে অরবিন্দকে তাঁর জীবনের এক পর্বে জাতীয় ভাবনার নেতা হিসেবে এবং অন্য পর্বে ধর্ম-

সাধনার সাধক ও দার্শনিক রূপে চিহ্নিত করার প্রবণতা দাঁড়িয়ে গেছে। ১৮৯৩ থেকে ১৯১০ পর্যন্ত তিনি জাতীয়তার ভাবুক ছিলেন—এবং তারপর জাতীয় আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ থেকে বিদায় নিয়ে পণ্ডিচেরিতে যোগী-জীবন-যাপন করেছেন শেষপর্যন্ত। মানে, ১৯১০-এর পরেই তিনি ছিলেন ধর্মভাবনার ভাবুক—এই হোলো প্রচলিত ধারণা। জনসন তাঁর সেই ভূমিকায় লিখেছেন, যিনি অরবিন্দের রচনাবলী পড়েছেন, তিনি এরকম বিভাজন মানতে পারেন না—"Even a cursory examination of the writings of Aurobindo however disproves this sort of bifurcation." করন সিং-এর 'Prophet of Indian Nationalism' (১৯২১) বইয়ের এই মন্তব্য তিনি এই সূত্রে তুলে দেখিয়েছেন যে—"It would not be incorrect to say that Sri Aurobindo's political theory was firmly grounded in and grew out of his deep spiritual convictions." তৎসত্ত্বেও করন সিং রাজনীতি-চিন্তার দিকে জোর দিয়েই তাঁর আলোচনা করে গেছেন এবং জন্সন্ সাহেবের ভাষায় তা' করা হয়েছে এইটুকু মেনে নিয়ে—"admitting only that religious presuppositions generated many ideas." অর্থাৎ ডঃ করন সিংও রাজনীতি আর ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতা—এ দুটিকে দুই পৃথক সামগ্রী বলেই বোধ করেছেন। এই সূত্রেই 'বন্দেমাতরম্', 'কর্মযোগিন্', 'ইন্দুপ্রকাশ', আর্য' প্রভৃতি পত্রিকার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের যোগ,—তাঁর মতামত—এবং আরো আগেকার অনুপ্রেরণাগুলি মনে পড়ে।

পত্রিকা সম্পাদনা সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের অভিজ্ঞতা ও প্রবণতার কথা ভাবতে গেলে প্রথমেই একথা মানতে হয় যে তিনি যে-কোনো সাধারণ পাঠকের চেয়ে অনেক বেশি এবং অনেক বিচিত্র ধরনের পত্র-পত্রিকা অল্প বয়স থেকেই পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। বিলেতে, বিশেষত কেম্ব্রিজের ছাত্র-জীবনেই তিনি ফরাসী ভাষায় পারদর্শী হন। তার আগে ১৮৮৪ থেকে ১৮৮৯-এর ডিসেম্বর, এই পাঁচ বছর লণ্ডনে West Kensington-এর St. Paul's School-এর ছাত্র ছিলেন যে-পর্বে, সে-পর্বে সেণ্ট পল্‌স্ স্কুলের সাহিত্য-সভায় তাঁর বেশ সক্রিয় ভূমিকার খবর পাওয়া যায়। ১৮৮৯-এর ৫ই নভেম্বর সুইফ্‌ট-এর রাষ্ট্রনৈতিক মতামতের অসংগতি সম্বন্ধে এবং ১৯-এ নভেম্বর মিল্টন সম্বন্ধে বিতর্কসভায় তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। লণ্ডনের ছাত্রাবস্থার আগে ১৮৭৯ থেকে ১৮৮৪-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি ছিলেন ম্যাঞ্চেস্টারে। ১৮৯০-এর অক্টোবর থেকে ১৮৯২-এর অক্টোবর

পর্যন্ত তিনি ছিলেন কেম্ব্রিজে। তারপর ১৮৯২-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত লণ্ডনে। আগেই বলা হয়েছে, ১৮৯১এ আয়ার্লাণ্ডের নেতা Parnell-এর মৃত্যু উপলক্ষে তিনি একটি কবিতা লেখেন। কেম্ব্রিজ-মজলিশে তাঁর রাজনৈতিক মতামত গঠনের নিঃসন্দেহে সুযোগ হয়েছিল। তাতে তাঁকে নেতার ভূমিকা নিতে হয়, একথা অনেকেই বলেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি তিনি সেই মজলিশেই বেশ তীব্রভাবে আলোচনা করেন এবং অনেক কবিতা লেখেন সেই পর্বেই। তবে ইংলণ্ডের প্রতি তাঁর কোনো আসক্তি জন্মায়নি, যদিও ইংরেজের চিন্তা এবং ইংরেজি সাহিত্য তাঁর খুবই ভাল লাগতো। তিনি যখন ইংলণ্ড ছেড়ে আসেন, তখন তিনি কোনো পিছটান নিয়ে আসেন নি। 'Sri Aurobindo on Himself' বইয়ে তিনি লিখেছেন যে, তাঁর পিতা ডাক্তার কৃষ্ণধন ঘোষ দেশ থেকে 'The Bengalee' পত্রিকার সেইসব অংশ কেটে পাঠাতেন যেসব অংশে ভারতীয়ের প্রতি ইংরেজের অত্যাচারের খবর থাকতো এবং তাঁর চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারকে নির্মম সরকার বলে নিন্দাও থাকতো। ইংলণ্ড ছেড়ে আসার আগেই তিনি 'পদ্ম ও অসি' নামে এক গুপ্ত সমিতির সদস্য হন যার প্রত্যেক সদস্যই ভারতের মুক্তি সাধনের সংকল্প নিতেন। ১৮৯২-এর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে এই ব্যাপার ঘটেছিল। এসব কথা আগেই বলা হয়েছে।

বরোদায় তাঁর চাকরির সময় গেছে তের বছর পাঁচমাস কয়েক দিন—৮ই ফেব্রুয়ারি ১৮৯৩ থেকে ১৮ই জুন ১৯০৭। এই পর্বেই ৭ই অগষ্ট ১৮৯৩ থেকে ফেব্রুয়ারি, ১৮৯৪ এর মধ্যে বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নীতি সম্বন্ধে তিনি যে প্রবন্ধগুলি লেখেন, তার প্রথম দুটি প্রবন্ধ বেরোবার পরেই মহারাষ্ট্রের নেতা মাধব গোবিন্দ রানাডে সেই পত্রিকার সম্পাদকের কাছে এক সতর্কবাণীতে জানান যে দেশদ্রোহিতার জন্যে ঐ প্রবন্ধগুলি উপলক্ষ করেই সম্পাদক গ্রেপ্তার হতে পারেন। K. G. Deshpande ছিলেন অরবিন্দের কেম্ব্রিজের বন্ধু এবং 'ইন্দুপ্রকাশ' এর সম্পাদক। রানাডে বোধ হয় পত্রিকার মালিককে তাঁর এই আশঙ্কা জানিয়েছিলেন। দেশপাণ্ডে মুস্কিলে পড়েন। অরবিন্দকে তিনি প্রবন্ধের সুর নরম করতে অনুরোধ জানান। মোট প্রবন্ধের এই পর্যায়ের শেষ প্রবন্ধের তারিখ ১৮৯৪-এর ৬ই মার্চ।

বিপিনচন্দ্র পাল যখন বর্তমান শতকের প্রথম দশকে 'বন্দেমাতরম্' নামে

ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন, তখন শ্রীঅরবিন্দকে সহকারী সম্পাদক পদে যোগ দিতে অনুরোধ জানান। শ্রীঅরবিন্দ যোগ দেন। কয়েক মাসের মধ্যেই বিপিনচন্দ্রের সঙ্গে পরিচালক-সমিতির মতান্তর ঘটে এবং তিনি সম্পাদক পদে ইস্তফা দেন। তখন অরবিন্দ অসুস্থ অবস্থায় কলকাতার সারপেণ্টাইন লেনে তাঁর শ্বশুরবাড়িতে ছিলেন। বিপিনচন্দ্রের ইস্তফার পরের দিনই সম্পাদক হিশেবে তাঁর নিজের নাম ছাপা হয়েছে দেখে পরিচালক-সমিতির সম্পাদকের নামে কড়া চিঠি লেখেন অরবিন্দ। পরের দিন থেকে তাঁর নাম আর ছাপা হয়নি বটে, কিন্তু তিনিই ছিলেন সম্পাদক। বিপিনচন্দ্র শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে প্রীতির ভাবই পোষণ করতেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদনা করেন অরবিন্দই। সেই বছরে যখন 'বন্দেমাতরম্'-এর বিরুদ্ধে মামলা হয়, তখন বিপিনচন্দ্র সাক্ষী দিতে অসম্মত হন এবং তাঁর ছ'মাস কারাদণ্ড হয়। সংকার প্রমাণ করতে পারেননি কে সম্পাদক, এবং অরবিন্দ তাতে মুক্তি পেয়ে যান। এই সময়েই রবীন্দ্রনাথ লেখেন 'অরবিন্দ রবীন্দ্রের লহ নমস্কার'। আসল কথা, বাংলা 'যুগান্তর' পত্রিকায় তখন একটি চিঠি বেরোয় এবং তারই ইংরেজি অনুবাদ বেরোয় ইংরেজি 'বন্দেমাতরম্'-এ।

## ২৪

আমাদের বর্তমানের আদর্শবাদী যুবমানসের যন্ত্রণার প্রতিষেধক তিনি তাঁর যোগী, কবি ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী সত্তার বহুস্তর অভিজ্ঞতার পথে, নিজের সুবিপুল অধ্যয়ন, জনসংযোগ, নির্জনতা ও সার্বিক উপলব্ধির মধ্য দিয়েই আবিষ্কার করেন। ১৯১০-এ পণ্ডিচেরিতে গিয়ে স্থায়িভাবে অধিষ্ঠিত হবার প্রায় ষোলো বছর পরে ২৪-এ নভেম্বর ১৯২৬ তারিখে পণ্ডিচেরিতে শ্রীঅরবিন্দ-আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই তারিখের আগে মাত্র কয়েকজন শিষ্য ও অনুরাগী যাঁরা সেখানে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে বেশ খোলাখুলি ভাবেই তিনি নানা আলোচনায় যোগ দিতেন। ১৯২৪-এ, অর্থাৎ সেই আশ্রমপূর্ব পর্বেই দিলীপকুমার রায়ের সঙ্গে তাঁর কথা হয় এবং 'Among the Great' বইয়ে দিলীপকুমার সেই আলাপের কথা লিখে গেছেন। ১৯২৪ থেকে শ্রীঅরবিন্দ পুরোপুরি নির্জনতায় অধিষ্ঠিত হন।

শ্রীমা তখন আশ্রম পরিচালনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়েছেন। ১৯৩৮ থেকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর ব্যক্তিগত কাজকর্মের জন্যে জন-দুয়েক শিষ্যকে কাছে আসতে দেন। সেই পর্বে শ্রীমা হন শ্রীঅরবিন্দের প্রতিনিধি—হয়তো তখন থেকে তাঁকেই আশ্রমের 'প্রধানা' বলা সংগত। শ্রীমা-ই ছিলেন শিষ্য ও অনুরাগীদের সহায়িকা ও আশ্রমের পরিচালিকা। ১৯২৬-এ শিষ্যসংখ্যা হয়তো ছিল জন-কুড়ি, ১৯৫২-তে সেই সংখ্যা ৮০০ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৩৮-এর নভেম্বরের আগে পর্যন্ত বছরে তিনদিন যথাক্রমে ২১-এ ফেব্রুয়ারি মায়ের জন্মদিনে—১৫ই অগষ্ট শ্রীঅরবিন্দের জন্মদিনে—এবং ২৪-এ নভেম্বর আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিনে—অতঃপর ১৯৩৯ থেকে মায়ের স্থায়িভাবে পণ্ডিচেরিতে আসার তারিখ স্মরণ করে ২৪-এ এপ্রিল শ্রীঅরবিন্দ ও শ্রীমা শিষ্য-ভক্ত-তীর্থযাত্রীদের দর্শন দিতেন। কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, যোগ, সংশয়, জিজ্ঞাসা, রাজনীতি, সমাজচিন্তা, বিপ্লব, ঈশ্বর ব্রহ্ম—যাঁর মনে যাই থাকুক, সে পর্বে দর্শনার্থীরা সকলেই তাঁকে নিজেদের সেসব কথা জানিয়েছেন—দুজনকেই! শ্রীমা আশ্রমের কাজকর্মও দেখেছেন। আশ্রম-বাসের একঘেয়েমিতে কারও কারও বিষাদব্যাধি ঘটাও কি অসম্ভব? সেই শ্রেণীর জন্যে—লৌকিক ভাষায় যাকে বলে ইন্দ্রিয়াকর্ষণ ও সুখ-সন্ধানের প্রবৃত্তি—এগুলি যাঁরা কিছুতেই ভুলতে পারেন না, শ্রীঅরবিন্দ তাঁদের শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্তের এই উক্তি উপহার দিতেন—"Depression need not be depressing, rather it should be made a jumping board for the leap to higher poise.' দিলীপকুমার সেই সময়ে শ্রীঅরবিন্দের যোগশক্তির সহায়তা ত্যাগ করে—সুভাষচন্দ্র বসু ও জবাহরলাল নেহেরু যেমন দেশের স্বাধীনতার জন্যে কারাবরণ করেছিলেন, সেই পথে যেতে চান। এগুলি শুধু ঘটনার তালিকা নয়, এই পারিপার্শ্বিকতার মধ্য দিয়েই তাঁকে দেখতে হবে।

২৫

প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, জেলে যাওয়াটাই কি স্বাধীনতা সন্ধানের চূড়ান্ত পরিণতি? জেলই কি স্বদেশ-সাধকের মোক্ষ? রবীন্দ্রনাথের রচনায় স্বদেশ-

ভাবনা সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। 'গীতবিতানে' স্বদেশ-পর্যায়ের গানগুলির প্রথম গানেই পাই, স্বদেশের এই মাতৃমূর্তি—

> আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি
> চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
> আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
>
> * * *
>
> ওমা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে—
> দে গো তোর পায়ের ধুলা, সে যে আমার মাথার মাণিক হবে।

এই ভূমিস্পর্শমুদ্রাই ছিল বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দের স্বদেশ-ধ্যানের আসন। সে শুধু সোনার বাংলাকেই নয়,—দেশকে ছুঁয়ে সারা বিশ্বমনকে ছুঁয়ে থাকার মুদ্রা—

> ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা—
> তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের
> আঁচল পাতা।

অরবিন্দের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের পথেও বিশ্বমায়ের এই ধ্যানই প্রধান। সুদূর অতীত থেকে নিজের যুগ অবধি ইতিহাসের ঘটনাগতি রবীন্দ্রনাথও অনুভব করেছিলেন। কর্মযোগ ও সত্যবোধ,—এই দুয়ের অচ্ছেদ্যতা মানবার নীতিই ছিল তাঁর স্বদেশনীতি। কর্মের দাসত্ব নয়, কর্মের মুক্তি এবং আনন্দের সাধনার দিকটিতেই তিনি বিশেষ জোর দিয়ে শান্তিনিকেতন আশ্রমে ১৩০৯ সালের বৈশাখে লেখেন—"ভারতবর্ষ তাহার তপ্ততাম্র আকাশের নিকট তাহার শুষ্ক ধূসর প্রান্তরের নিকট, তাহার জ্বলজ্জটামণ্ডিত বিরাট মধ্যাহ্নের নিকট, তাহার নিকষ-কৃষ্ণ নিঃশব্দ রাত্রির নিকট হইতে এই উদার শান্তি, এই বিশাল স্তব্ধতা আপনার অন্তঃকরণের মধ্যে লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ কর্মের ক্রীতদাস নহে।" পৃথিবীর সকল মানবজাতির মধ্যে ভারতবর্ষের যে পৃথক এক স্থান আছে, সেই পার্থক্যের কথাপ্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"বিদেশের সংঘাতে ভারতবর্ষে এই প্রাচীন স্তব্ধতা ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে আমাদের বলবৃদ্ধি হইতেছে, একথা আমি মনে করি না। ইহাতে আমাদের শক্তি ক্ষয় হইতেছে।"

আমাদের নিজস্ব আচার ও সমাজ রক্ষার 'ভীষণ শক্তি'র মধ্যেই আমাদের স্বাদেশিকতা প্রকাশিত। এই 'ভীষণ শক্তি' কথা দুটি তাঁরই প্রয়োগ। এই

শক্তি হোলো সংযমশক্তি, আধ্যাত্মিকতার দীপ্তি। একে তিনি বলে গেছেন 'ভারতবর্ষের একাকিত্ব'। এই নিঃসঙ্গতা কিন্তু বিষাদমালিন্য নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায়—এই একাকিত্বের অধিকার বৃহৎ অধিকার। ইহা উপার্জন করিতে হয়। ইহা লাভ করা, রক্ষা করা দুরূহ। পিতামহগণ এই একাকিত্ব ভারতবর্ষকে দান করিয়া গেছেন। মহাভারত রামায়ণের ন্যায় ইহা আমাদের জাতীয় সম্পত্তি।"

২৬

উপস্থিত কালের আন্তর্জাতিক বিনিময়ের দিনে এই প্রসঙ্গ একটু দুর্বোধ্য মনে হতে পারে। রবীন্দ্রনাথই তো অনুভব করেন যে, ভারতবর্ষের মহামানবের সাগরতীরে সকলেই আসবে যাবে,—কেউই ফিরে যাবে না। আবার তিনিই লেখেন—"যুরোপ ভোগে একাকী, কর্মে দলবদ্ধ। ভারতবর্ষ তাহার বিপরীত। ভারতবর্ষ ভাগ করিয়া ভোগ করে, কর্ম করে একাকী।" আবার—"আমাদের সুখসম্পত্তি একলার নহে, আমাদের দানধ্যান, অধ্যাপন, আমাদের কর্তব্য একলার।"

এই কথা থেকেই তিনি একটি তীব্র বাস্তব সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেন—"আমি কেবল ভাবিয়া দেখিতেছি, এই সকল কৃষ্ণধূমশ্বসিত দানবীয় কারখানাগুলির ভিতরে বাহিরে চারিদিকে মানুষগুলোকে যেভাবে তাল পাকাইয়া থাকিতে হয়, তাহাতে তাহাদের নির্জনত্বের সহজ অধিকার, আবরুটুকু থাকে না।"

'রক্তকরবী'র যক্ষপুরীও নয়, 'অচলায়তন'-এর শুষ্কতার প্রাকারও নয়—রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধের কেন্দ্রে এক কঠিন নিয়মের ভিত্তিতে পরম আনন্দ-কুসুমের স্বীকৃতি ছিল। গানে সেই কথারই ইশারা দিয়ে তিনি লেখেন—'চির-কল্যাণময়ী তুমি ধন্য, 'দেশেবিদেশে বিতরিছ অন্ন', আবার—

শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও
হও না যতই বড়ো আছেন ভগবান।

সকল প্রতিকূলতার বিপক্ষে এই অখণ্ড প্রত্যয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বাদে-শিকতার সঙ্গে বিশ্বমৈত্রীর যোগে আস্থা ছিলেন। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস',

'ভারতবর্ষ ও ইতিহাস', 'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা' প্রভৃতি প্রবন্ধে আমাদের এই শতাব্দের সূচনাপর্বে তিনি বারবার আমাদের এই ঐতিহ্য ও প্রগতি ভাবনার অন্বয়সূত্রটি দেখিয়ে দেন। ১৩০৮ সালের জ্যৈষ্ঠে তিনি শেষোক্ত প্রবন্ধে লেখেন—"নেশন শব্দ আমাদের ভাষায় নাই, আমাদের দেশে ছিল না। —য়ুরোপে স্বাধীনতাকে যে স্থান দেয় আমরা মুক্তিকে সেই স্থান দিই।"

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা সমাজ ও ধর্মের ভিত্তিতেই অটুট। তিনি ইউরোপীয় ছাঁচে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়তে দিতে নারাজ ছিলেন। ১৩১৪ সালে তিনি 'আত্মশক্তি ও সমূহ' চিন্তাধারার মধ্যেই লেখেন—"স্বরাজ তো আকাশ-কুসুম নয়, একটা কার্যপরম্পরার মধ্য দিয়া তাহাকে লাভ করিতে হইবে—নূতন বা পুরাতন বা যে দলই হউক তাঁহাদের সেই কাজের তালিকা কোথায়?"

পৌরুষ, কর্তব্যবোধ, শান্ত ও নিষ্কম্প শপথ—এবং নিরলস কর্মযোগের আনন্দই তাঁর স্বদেশ-পূজার লক্ষ্য ও উপায়। তাঁর ভূমা আর স্বভূমি একই বোধের অধীন। তাঁর স্বদেশের সঙ্গে বিশ্বের ব্যবধান নেই, কারণ, ঈশাবাস্যমিদং সর্বম্। 'রাশিয়ার চিঠি'তে তিনি লেখেন—'আমাদের দেশে আমাদের পল্লীতে ধন উৎপাদন ও পরিচালনার কাজে সমবায়নীতির জয় হোক, এই কামনা করি।" শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র নিয়ে রাশিয়ার কর্মশক্তির ব্যস্ততা দেখে স্বদেশের কথা মনে পড়েছিল তাঁর। তখন লেখেন—"আমাদের দেশে কোন এক সময়ে গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ বোধহয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তাঁর বিহার, তাঁর দাদা বলরাম, হলধর। ঐ লাঙল অস্ত্রটা হল মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক। কৃষিকে বলদান করেছে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই—তিনি লজ্জিত—যে দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন"—এবং "শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয় না, যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের ক্ষেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে।" ১৩৩৬ সালের শ্রাবণে সুরুলে হলচালন উৎসবে বৈদিক মন্ত্র সহযোগে লাঙল ধরার কথা-প্রসঙ্গে সেই রবীন্দ্রনাথই লেখেন—"আপন দেহশক্তির সহজ সীমাকে মানুষ মানে না এই কথা নিয়ে চরকা পৃথিবীতে এসেছে, সেই চরকার দোহাই দিয়েই কি মানুষের বুদ্ধিকে বেড়ার মধ্যে আটকাতে হবে?"

তিনি চেয়েছিলেন যথার্থ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন—যন্ত্রশিল্পের সমৃদ্ধির সঙ্গে আত্মিক মুক্তির চরিতার্থতা। তাঁর শান্তিনিকেতন শ্রীনিকেতনও কবির সেই

অভিপ্রায়েরই উদাহরণ। সেই ১৩৩৬ সালেই তাঁকে বলতে হয়—'হায় রে দুরদৃষ্ট শান্তিনিকেতন যে কী সেটা কিছুতেই সুস্পষ্ট হয়ে উঠল না। যারা প্রাচীনপন্থী তারা আমাদের ললাটে সনাতনের স্থাপনা দেখে চটে যায়, যারা তরুণ আমাদের মধ্যে পুরাতনের পরিচয় পেয়ে শ্রদ্ধা হারায়। কেউ আমাদের আমল দেয় না।'

২৭

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধের মধ্যে দেশের জড়তা, নিশ্চেষ্টতা, অনুকরণ-প্রবৃত্তির তামসিকতা সম্বন্ধে এই বেদনাও তাঁর অটুট উদ্দীপনার সহচর ছিল। শ্রীঅরবিন্দের মধ্যেও অনুরূপ বেদনাই দেখা যায় না কি? জ্ঞান-কর্ম-সত্যোপ-লব্ধির পথে সাধক হিসেবে তাঁর জীবনের পৃথক পৃথক সময়ের অনুভূতি উচ্চারিত হয়েছে এবং প্রসিদ্ধ উত্তরপাড়া-ভাষণে তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে খুবই স্পষ্টভাবে জানান যে, রাজনৈতিক কর্মে কৃতিত্বের পক্ষে ঈশ্বরানুকূল্য অবশ্যই চাই। একথাও শোনা যায় যে, ১৯২৫-এ লালা লাজপত রায়কে তিনি বলেছিলেন যে, ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির জন্যেই তিনি যোগসাধনায় নিবিষ্টচিত্ত ছিলেন। একজন লিখেছেন যে, বিবেকানন্দ, দয়ানন্দ ও তিলক-এর মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের রাম বা অর্জুন বা কর্ণের মতো পার্থিব সাফল্যের উদ্দেশ্যে যোগসাধনার সাদৃশ্য নেই, কিন্তু সত্যাগ্রহীর পক্ষে যে আত্মশুদ্ধির লক্ষ্য দেখিয়ে গেছেন গান্ধীজী, তাতে অংশত হঠযোগের ওপরে জোর ছিল। অরবিন্দবাদ ও গান্ধীতত্ত্ব—রাজ-নৈতিক স্বাধীনতা বা সাফল্যের দিক থেকে এই দুটির নৈকট্য ও দূরত্ব যথার্থ পরিশ্রমী গবেষকের কল্যাণে প্রকাশ্য দিবালোকের মতন স্পষ্ট হবে কিনা সন্দেহের বিষয়। কারণ, ঠিক সিঁড়ির পরে সিঁড়ি বানিয়ে কারও অন্তরলোকের পথই বুদ্ধিগ্রাহ্য পরিক্রমার পথ নয়। আত্মা বা দিব্যতা আমাদের বিশ্লেষণী বুদ্ধির গোচর কিনা, সেকথা কি সাধারণ মানুষের তরফ থেকে বলা যায়?

লুই ফিশার প্রণীত 'Gandhi' বইটির তৃতীয় খণ্ডের সূচনায় শিরোনাম হোলো বিজয় ও মহাদুর্যোগ—"Victory and Tragedy'। মানুষের মধ্যে

'দিব্যতা সন্ধানের প্রসঙ্গ আছে এ-বইয়ের তৃতীয় খণ্ডের আদিতে,—যেটি হোলো পুরো বইটির সাতাশতম অধ্যায়। সমাজ ও পরিবারের পক্ষে দুর্বহ বোঝা না হয়ে গান্ধীজী যে একশ পঁচিশ বছর বাঁচতে চেয়েছিলেন, এখানে তার উল্লেখ আছে। এক প্রসিদ্ধ বিদেশী সাংবাদিক রূপেই ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দে লুই ফিশার গান্ধীজীর সঙ্গে প্রথম দেখা করেন এবং পরে আবার ১৯৪৬-এ। এই বইয়ে তিনি মহাত্মার বাল্যশিক্ষা, যৌবন, আফ্রিকায় জীবিকা ও সংগ্রাম, ভারতের জাতীয় আন্দোলনে নেতৃত্ব এবং নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আততায়ীর অস্ত্রে তাঁর নিধনপর্ব পর্যন্ত সমগ্র জীবনেরই নির্যাস পরিবেশন করেছেন। প্রথম খণ্ডের সপ্তম অধ্যায়ে তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকায় গান্ধীজী যে ইউরোপীয় পোশাকে অভ্যস্ত ছিলেন—কড়া ইস্তিরির শাদা কলার, শাদা শার্ট, ডোরাকাটা বাহারে টাই ইত্যাদি পরতেন এবং ১৮৯৭-এ দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর তৃতীয় পুত্র রামদাসের জন্মের পরে প্রসূতিবিদ্যা সম্বন্ধে একখানি বই পড়ে নিয়ে, ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ২২-এ মে তারিখে চতুর্থ পুত্র দেবদাসের জন্মকালে তিনি নিজেই যে ধাত্রীর কাজ করেন,—তাঁর পত্নী কস্তুরবাকে যে অনেকরকম শিক্ষা-পরিকল্পনার অতিশয় অনিচ্ছুক ছাত্রী হয়ে দিন কাটাতে হোতো এবং আদর্শবাদী স্বামীর খেয়ালের তাড়নায় কেঁদে কেঁদে তাঁর চোখ লাল হোতো অনেক সময়ে, সেসব কথাও বলা হয়েছে। অস্পৃশ্যতা বর্জন ও ময়লা সাফাইয়ের ব্যাপারে কস্তুরবা বিরোধিনী হলে একদিন গান্ধী তাঁর হাত ধরে বাড়ি থেকে বের ক'রে ফটক বন্ধ ক'রে দিচ্ছিলেন যখন, তখন রোরুদ্যমানা পত্নী বলেন—কোথায় যাবো আমি ? - লোক হাসিওনা। এখানে আমার আত্মীয়-স্বজন কেউ নেই,—এরকম কোরো না—ইত্যাদি। সেই উত্তর শুনে গান্ধীজীর কাণ্ডজ্ঞান ফিরে আসে। লুই ফিশার এই সূত্রে লিখেছেন যে, গান্ধীর মেজাজ ছিল প্রতাপ-প্রমত্ত। তাঁর জীবনের মহাত্মাসুলভ শান্তির ভাবটা দেখা দেয় সুদীর্ঘ সংযম ও আত্মশাসনের ফলে। দক্ষিণ-আফ্রিকাতেই তাঁর এই রূপান্তরসাধন আরম্ভ হয়েছিল। সঞ্চয় নয়,—ঈশ্বরের প্রত্যাদেশে পূর্ণ সমর্পণের সংকল্প, এসব তাঁর মনের মধ্যে অনেক ক্ষতচিহ্নের মধ্য দিয়ে সুদীপ্ত হয়ে ওঠে। ১৯৪৬-এ দ্বিতীয় ও শেষবার যখন লুই ফিশার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, তখনো তাঁর কৌতুকবোধ ও হাস্যময়তা ছিল অম্লান। ১৯৪৬-এর ২৩-এ মার্চ ব্রিটিশ সরকারের ভারত-সচিব লর্ড পেথিক লরেন্স, বাণিজ্য-সংসদের সভাপতি সার স্টাফোর্ড ক্রিপ্‌স এবং ফার্স্ট লর্ড অফ অ্যাডমিরালটি অ্যালবার্ট ভি-আলেকজাণ্ডার

এদেশে পৌঁছে ভারতের আসন্ন স্বাধীনতার শর্তাবলী সম্বন্ধে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের কাছে পরামর্শ চান, কিন্তু সেই দু'পক্ষের দাবি-দাওয়ার মধ্যে মিল ঘটেনি বলেই ১৬ই মে, ১৯৪৬ ক্যাবিনেট মিশন নিজেদের পরিকল্পনা নিজেরাই প্রকাশ করেন। সেটি খুঁটিয়ে দেখে গান্ধীজী বলেন—উপস্থিত পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ সরকার সর্বোত্তম যা করতে পারতো, এতে তাই-ই করা হয়েছে এবং ইংলণ্ড যে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে চায়, তাতে কোনো সন্দেহ নেই আর। সেই ক্যাবিনেট মিশন ব্রিটিশ সরকারকে ভারত বিভাগ না করার পরামর্শ দেন। দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সারা ব্রিটিশ ভারত ই অবিভাজ্য এক রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীন হোক, তাঁরা এই প্রস্তাব দেন। দ্বিতীয়ত এক সর্ব-ভারতীয় বা ফেডারেল পার্লামেণ্টে হিন্দু মুসলমান প্রতিনিধিদের মতাধিক্য ব্যতিরেকে জাতি-বর্ণ-ধর্মসংক্রান্ত কোনো আইন বা বিধি ব্যবস্থাপনা চলতে পারবে না, এই শর্তও ছিল; তৃতীয়ত প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে প্রভূত ক্ষমতা সমর্পণের প্রস্তাব ছিল এবং কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকারের পক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়-গুলির রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থার প্রস্তাবও ছিল তার অন্তর্ভুক্ত। নয়াদিল্লীতে কনষ্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেমব্লিকে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের জন্যে স্বল্পকালের আহ্বান জানানো হবে। অতঃপর ভারতের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিরা প্রথম শাখায়—পশ্চিম ভারতের মুসলমান প্রাচুর্যময় প্রদেশগুলি এবং পশ্চিমে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, সিন্ধু, পাঞ্জাব দ্বিতীয় শাখায়,—তৃতীয় শাখায় বাংলা ও আসামের প্রতিনিধিরা ভাগ হয়ে যাবে এবং যথাক্রমে পূর্বোক্ত তিন উপ-ফেডারেশনের সংবিধান প্রণয়নে উদ্যোগী হবে। গান্ধীজী ব্রিটিশ পরিকল্পনার এই বিভেদনীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, সেকথা ঐতিহাসিক সত্য। পরবর্তী ইতিহাস সকলেই জানেন।

ভারতের সংগ্রামে ১৯৪৭এ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আগে একরকম, পরে অন্য রকম বিচিত্র সমস্যার কথাই বা কে অস্বীকার করবেন? ভারত যখন স্বাধীনতা-প্রাপ্তির খুব কাছে এসে গেছে, সেই ১৯৪৬-এ বাংলার নোয়াখালিতে, বিহারে ও দেশের অন্যান্য অঞ্চলে সাম্প্রদায়িক বিরোধ বীভৎস হানাহানিতে পর্যবসিত হয়। বিদেশী ব্রিটিশ শক্তি দেশ ছেড়ে চলে যাবে এবং ভারতবাসীর হাতে ভারতের শাসনাধিকার এসে পড়বে,—এই সম্ভাবনা যখন আসন্ন, তখন গান্ধীজী স্বাধীন ভারতের শাসন-প্রকৃতি কী রকম হবে, সেই ভাবনায় নিমগ্ন ছিলেন। তারই মধ্যে

২৭-এ অক্টোবর তিনি নোয়াখালি যাত্রার সংকল্প প্রকাশ করেন এবং ২৮-এ অক্টোবর অসুস্থ শরীরে নোয়াখালির পথে কলকাতা যাত্রা করেন। এর আগে তিনি অনেক অভিযানে গেছেন যেমন লবণ-আন্দোলনে, চম্পারণ-সত্যাগ্রহে, কিন্তু নোয়াখালি অভিযান সেরকম নয়। তখন সংখ্যালঘু হিন্দু সমাজ সেখানে অপরিসীম নিপীড়িত হয়েছেন। 'হরিজন পত্রিকায় 'ধর্মবিশ্বাসের নিঃশঙ্ক অভিযান নামে তিনি ঐ সময়ে এক প্রবন্ধে নোয়াখালি-অভিযানের তাত্ত্বিক ভিত্তি বিশদ করেন। মানুষের রক্ত-পিপাসু সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে গান্ধীজীর আস্তিকতা উদ্বোধনের পরীক্ষাক্ষেত্র হয়েছিল নোযাখালি। মানুষেরই জিঘাংসা বিজয়ের অভিযান সেটি। মানবিকতা, ধর্মবোধ, ব্যবহারিক অহিংসানীতি প্রতিপাদনের বিশেষ উদ্যম ছিল গান্ধীজীর নোযাখালি অভিযান।

২৬-এ এপ্রিল, ১৯২৮ তারিখের 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'-তে মগনলাল গান্ধী সম্বন্ধে গান্ধী তাঁর একটি নিবন্ধে লেখেন যে, দেশের সেবা, মানুষের সেবা, আত্মবোধ ও ঈশ্বরজ্ঞান হোলো সমার্থক শব্দ। শ্রীঅরবিন্দের আদিপর্বের সাধনায়,—পণ্ডিতদের মতে, এ দিকে কোনো পার্থক্য ছিল না। তবে ভগবদ্গীতার ব্যাখ্যায় উভয়ের দৃষ্টির প্রভেদ ধরা পড়ে। শ্রীকৃষ্ণে লোকসংগ্রহের আদর্শে উভয়েই অনুপ্রাণিত ছিলেন। তবে, তিলক ও গান্ধীর মধ্যে সামাজিক ও মানসিক পুনর্গঠনের ওপরেই জোর চোখে পড়ে। নিরাসক্ত কর্মের আদর্শ তাঁরা দুজনেই মেনেছেন। তিলক জোর দিয়ে গেছেন সাম্যবুদ্ধির ওপর, গান্ধী ব্যবহার করেন 'অনাসক্তি শব্দটি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'Essays on the Gita'-তে ঈশ্বরসেবক ভাবে মানুষের রূপান্তর দাবি করেন। গান্ধীজীর আদর্শ বা গান্ধীতত্ত্ব সম্বন্ধে ভাবতে গেলে অনাসক্তিবোধ কখনোই নীরস কাঠিন্য বা শুষ্কতা মনে হয না। তাঁর সংযমচর্চাও শুষ্কতা নয়। তিনি মীরার ভজন ভালবাসতেন, রবীন্দ্রনাথের গানও ভালবাসতেন। তাঁর কৌতুক-পরিহাসের সংক্রামক শুচিতা, তাঁর সারল্যের বহু অবিস্মরণীয় রূপ তাঁর সমসাময়িক নানা সন্নিহিত ব্যক্তির রচনায় ধরা আছে। গান্ধীজীর সত্যবোধ ও গান্ধীতত্ত্বের কথা ভাবতে গেলেও রূপান্তর সাধনের তপস্যার কথা এসে পড়ে। তিনি ছিলেন মানুষের সরসতা, সংযম, কাঠিন্য ও সত্য সন্ধানের পরমাশ্চর্য নিদর্শন।

শ্রীঅরবিন্দও তেমনি সত্যসাধনার আর এক বিস্ময়কর নিদর্শন। অনাসক্তভাবে কর্মস্বীকৃতি তাঁরও পথ। তবে সে পথ ঠিক অক্ষরে অক্ষরে অন্য কোনো পথের পুনরাবৃত্তি বা প্রতিলিপি নয়। গীতার কথা এই সূত্রেই পুনরায় এসে পড়ে। তাঁর মূল বাংলা রচনাবলী যা পাওয়া যায়, শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত সম্পাদিত সেই ১৯৬৯ এ প্রকাশিত সংগ্রহের মধ্যে 'নবজন্ম' নামে লেখাটিতে দেখা যায় সূচনাতেই শ্রীঅরবিন্দ গীতায় অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—'কল্যাণকৃৎ কখনও দুর্গতিপ্রাপ্ত হয় না' ইত্যাদি উল্লেখ করে জন্মজন্মান্তরের সাধনার সত্য সম্বন্ধে নিজের বিশ্বাস প্রকাশ করে লেখেন—"যে পূর্বজন্মবাদ চিরকাল আর্যধর্মের যোগলব্ধ জ্ঞানে অঙ্গবিশেষ, পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রভাবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে তাহার প্রতিপত্তি বিনষ্টপ্রায় হইয়াছিল, শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলার পরে বেদান্তশিক্ষাপ্রচারে ও গীতার অধ্যয়নে সেই সত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতেছে।" "স্থূল জগতে যেমন Heredity প্রধান সত্য, সূক্ষ্ম-জগতে তেমনই পূর্বজন্মবাদ প্রধান সত্য।"—এবং এই আলোচনায় তাঁর এই উক্তিও পাওয়া যায় যে আমাদের দেশে তাঁরই যুগে দেখা দেয়—"নবীনদিগের মধ্যে সত্যযুগ প্রকাশের একটি অপূর্ব লক্ষণ, ধর্মে মতি ও অনেকের হৃদয়ে যোগলিপ্সা ও অর্ধবিকশিত যোগশক্তি। এই সূত্রেই তিনি আরো লেখেন—"আলিপুর বোমার মোকদ্দমায় অভিযুক্ত অশোক নন্দী শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে একজন।...তাঁহার পিতামহ সিদ্ধ তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, তাঁহার পিতাও যোগপ্রাপ্ত শক্তিবিশিষ্ট পুরুষ। গীতায় যে যোগীকুলে জন্ম মানুষের পক্ষে অতি দুর্লভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। অল্পবয়সে তাঁহার অন্তর্নিহিত যোগ-শক্তির লক্ষণ এক একবার প্রকাশ পাইয়াছে।" 'ধর্ম' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দের সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলির একটির নাম 'একটি খাঁটি কথা'। সেই নিবন্ধে বঙ্গভঙ্গের পরে এদেশে রিফর্ম সম্বন্ধে ব্রিটিশ শাসনের সমালোচনা আছে। 'রিফরম্' নামে আর একটি নিবন্ধে ('ধর্ম' একাদশ সংখ্যা ২৯-এ কার্তিক ১৩১৬) লেখা হয়—"আজ সোমবার ১৫ই নভেম্বর—এইদিনে মহামতি লর্ড মরলী ও লর্ড মিণ্টোর গভীর ভারতহিত-চিন্তার রাজনীতিক তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও উদার মতের আসক্তিফলজাত শাসনসংস্কাররূপ মানসিক গর্ভ প্রসূত হইবে। লর্ড মরলী ধন্য, লর্ড মিণ্টো ধন্য, আমরা ধন্য। আজ ভারতে স্বর্গ নামিয়া আসিবে। আজ পারস্য, তুর্কী, চীন, জাপান পর্যন্ত ভারতের দিকে ঈর্ষার চোখে চাহিয়া 'ইংলিশম্যান'-এর সুরে সুর দিয়া গাহিবে "ধন্য ধন্য যাহারা পরাধীন, ধন্য ধন্য যাহারা য়ূরোপীয় জাতির পরাধীন, ধন্য ধন্য যাহারা

উদারনীতিক মরলী মিণ্টোর পরাধীন।"—বলা বাহুল্য, ব্যঙ্গের এই তীক্ষ্ণ ভাষা এবং এদেশে সমকালীন সাংবাদিকতাক্ষেত্রে ব্রিটিশ-স্বার্থের প্রতিভূ 'ইংলিশম্যানের' প্রতি কটাক্ষ তাঁর তেজী মনোভাবেরই নিদর্শন। শ্রীঅরবিন্দ অন্তর্দৃষ্টি, দূরদৃষ্টি, বিচার সংকল্প সবই ব্যবহার করে গেছেন। এইসব প্রসঙ্গ স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, তাঁর রাজনীতি-চিন্তার কথা থেকে অন্য অনেক কথা এসে যায়। এ ঠিক মূল কথা থেকে বারবার সরে যাওয়া নয়। মূল কথাটি সুস্পষ্ট করবার জন্যেই এই প্রয়াস। ১৮৯০-৯২ খ্রীষ্টাব্দের তাঁর পুরোনো পাণ্ডুলিপির মধ্যে তাঁর এই মন্তব্য পাওয়া যায় যে, একটি-মহান জাতির (নেশনের) পরিবর্তন ও প্রবল আলোড়নের মুহূর্তে যদি কোনো দেশপ্রেমিক কোনো পরামর্শ দিতে চান, তাহলে তাঁকে সাহস করে কিছু বলবার আগেই ভেবে নিতে হবে যে, তিনি যা বলতে চান তা যথার্থ মূল্যবান কিনা। কিন্তু প্রবল কোনো সমস্যা বা সংকট সম্বন্ধে যদি তাঁর এমন কিছু বলবার থাকে যা আগে স্পষ্ট করে দেখানো হয়নি অথবা কোনো বিশেষ দিকে তিনি যদি বিশেষ জোর দিতে চান, তাহলে সে বিষয়টি যতোই অন্ধকার বা দুর্বোধ্য হোক্ তাঁর অত্যাবশ্যক কর্তব্য হোলো সে দিকটি ব্যক্ত করা। এবং যে ভারতবাসী স্বদেশসেবার উদ্দেশ্যে তাঁর শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও আস্পৃহা জাগ্রত রেখেছেন, তাঁর কর্তব্য হোলো সে কথা সমুচিত সহিষ্ণুতা সহযোগে বুঝে দেখা। যাঁরা তাঁর 'বন্দে মাতরম' (১৯২১) নামে পৃথক ইংরেজি বইটি দেখেছেন, তাঁর এই উক্তির মূল অংশ ইংরেজি বইটির প্রথম দিকের এক পৃষ্ঠায় অবশ্যই তাঁদের নজরে পড়েছে।

অতঃপর এই সূত্রেই স্মরণীয় যে, 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ প্রকাশিত তাঁর প্রথম সাতটি নিবন্ধের উল্লেখ করা হয়েছে এই আলোচনার এই খণ্ডের ৬২-৬৪ পৃষ্ঠায়। সেই একই ধারায় তাঁর অষ্টম প্রবন্ধটি বেরোয় ১৮৯৪-এর ৫ই ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের রাজনৈতিক সামর্থ্যের কথা তিনি পূর্ববর্তী সপ্তম ও অন্যান্য নিবন্ধেও দেখিয়েছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় ক্ষেত্রের মানুষের মনোগত বিশেষত্বের ভিন্নতার দিকও দেখানো হয়েছিল। জনগণের মানসিক জাগৃতি যে একান্ত আবশ্যক, সেকালে নেতাদের মধ্যে ফিরোজ শা মেহেতা তা মানেন নি কেন? শ্রীঅরবিন্দ সেই সপ্তম নিবন্ধেই জানান যে, ইংলণ্ডের অন্ধ অনুকরণ করেও আমাদের চলবে না, ফ্রান্সের অন্ধ অনুকরণও দুর্গতি ডেকে আনবে। তখনকার ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যতোই গম্ভীর চেহারার ভারতীয় নাগরিক এবং বহু-সংখ্যক আইনবিদ থাকুন না কেন, আসল কাজের পক্ষে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ

অনুপযোগী—"Hence the Congress, a very reputable body, I ha͏sten to admit, teeming with grave citizens and really quite flush of lawyers, but for all that meagre in the scope of its utility and wholly unequal to the functions it ought to exercise. There we have laid the foundations, as the French laid the foundations of political incompetence, political failure ; and of a more fatal incompetence, a more disastrous failure, because the French have at least originality, thought, resourcefulness while we are vainglorious, shallow, mentally impotent : and as if this error were not enough for us, we have permitted ourselves to lose all sense of proportion, and to evolve an inordinate self-content, an exaggerated idea of our own political increase higher than socirl perfection or the advancement, intellectual and economical, of that vast unhappy proletariate about which everybody talks and nobody cares. We blindly assent when Mr. Pherozshah in the generous heat of his temperate and carefully restricted patriotism, assures us after his genial manner that the awakening of the masses from their ignorance and misery is entirely unimportant and any expenditure of energy in that direction entirely premature. There we have laid the foundation as England laid the foundation of social collapse, of social calamities."

এই উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও বঙ্গানুবাদে এর তীক্ষ্ণতা বজায় রাখা দুঃসাধ্য বলেই তাঁর ব্যঙ্গদিগ্ধ, যুক্তিনিষ্ঠ উক্তিগুলি এখানে যথাযথ ভাবে তাঁরই ভাষায় তুলে দেওয়া হোলো। স্বদেশের তিনি যথার্থ জনকল্যাণ চেয়েছিলেন। তিনি ফিরোজ শা মেহেতাকে আইনবিদের স্বভাবমাফিক নিজস্ব ধারণা নির্বিচারে প্রতিষ্ঠিত করবার জেদ ( 'forensic instinct' ) ত্যাগ করে এই ব্যাপারটি বুঝে দেখতে পরামর্শ দেন যে, আমাদের জাতীয়তার প্রয়াস যদি সত্যিই ব্যাপক ও

বরণীয় করে তুলতে হয়, তাহলে আগে তাকে সামাজিক সদিচ্ছাময় ও সত্যিই জনপ্রিয় করে তুলতে হবে—"Our national effort must contract a social and popular tendency before it can hope to be great or fruitful."

আগেই দেখা গেছে যে, ১৯০২ থেকে ১৯১০—সর্বসমেত এই আট বছরেই শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সক্রিয়তার পর্ব গেছে। এই কয়েক বছরের প্রথমার্ধ কালের মধ্যে ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের আগে পর্যন্ত তিনি আয়ার্লাণ্ডের Sinn Fien আন্দোলনের মতন এদেশে স্বদেশী-আন্দোলনের প্রস্তুতিতে কাটিয়েছেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নরমপন্থী গতিবিধি থেকে মহারাষ্ট্রের নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের নেতৃত্বে ও সহযোগিতায় ১৯০৬ থেকে ১৯০৭-এর মধ্যে তিনি নরমপন্থী বা মডারেটদের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে 'জাতীয়তাভিত্তিক' —নামান্তরে 'উগ্রপন্থী' করে তোলেন। 'মডারেট' ও 'ন্যাশনালিস্ট', ইতিহাস-প্রসিদ্ধ এই দুই পক্ষের পার্থক্য তখন থেকেই সুপরিচিত।

ভারতের ধর্মবোধ নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অনেকেই করে থাকেন। সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির প্রসঙ্গ উত্থাপন ক'রে অনেকেই রাজনীতির ক্ষেত্রে কোনোরকম আধ্যাত্মিকতার প্রতি বিশ্বাস হজম করতে নারাজ। তবু প্রসঙ্গক্রমেই এখানে রবীন্দ্রনাথের আলোচনা থেকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির দিকে নজর রাখা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অতঃপর সেই বিষয়টি দেখা যাক্।

## ২৮

ভারতবর্ষের ইতিহাস ঠিক রাষ্ট্রীয় ইতিহাস নয়, একথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক প্রবন্ধে লিখে গেছেন। ভারত-ইতিহাসের প্রবাহে নানা জাতির সংঘাত ও সামঞ্জস্যের প্রসঙ্গ তিনি তুলে ধরে বৈদিক যুগ, বৌদ্ধ যুগ, পৌরাণিক যুগ ইত্যাদি যুগক্রমের কথা উল্লেখ করেন। তাঁর 'ইতিহাস' বইটির একাধিক নিবন্ধে তুলনার

কথা আছে, যেমন 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি', 'শিবাজী ও গুরু গোবিন্দ সিংহ' ইত্যাদি। মারাঠা ইতিহাসের প্রধান নায়ক বলা হয়েছে শিবাজীকে, কারণ, দেশজয়, শত্রুবিনাশ, রাজ্যবিস্তার প্রভৃতি তাঁর নানা কীর্তির মূলে তাঁর অন্তরের সাধনা ছিল হিন্দুরাজ্য স্থাপনের চেষ্টা। অথচ কোনো সংকীর্ণতা ছিলনা তাতে। নিখিল ভারতের বিপুলতা ও বৈচিত্র্যের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা উৎপাটিত করবার স্নেহ ।তাঁন সেই সাধনায় অগ্রসর হন। রবীন্দ্রনাথ তাতে সংকল্পের ও সংগ্রহের 'শুচিতা, অনুভব করেন। 'শিবাজী ও মারাঠাজাতি' নিবন্ধে তিনি লেখেন—"এইরূপ কোনো একটি এক অভিপ্রায়কে লইয়া ভারতবর্ষের কোনো একটি প্রদেশ আপনাকে একচিত্ত বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছে, এরূপ অবস্থা ভারতবর্ষের ভাগ্যে অধিক ঘটে নাই।" মারাঠা জাতির অভ্যুদয় প্রসঙ্গে রাজপুতানার ইতিহাস এবং শিখদের বীরত্বের প্রসঙ্গও তাঁর রচনায় দেখা দেয়। কিন্তু সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম—এই প্রসঙ্গগুলিও তাঁর মনে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ইতিহাস অভ্যুদয়ের উপাদান হিশেবে বিদ্যমান ছিল। সে সব ক্ষেত্রেও তুলনার প্রয়াস দেখা দেয় বারবার। পোলিটিক্যাল ঐক্যের চেয়ে বড়ো ঐক্যের ধ্যান ছিল তাঁর। আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৬ সালে ''বিদ্যাসমবায়' প্রবন্ধে [ 'শিক্ষা' দ্রষ্টব্য ] রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"সমস্ত পৃথিবীকে বাদ দিয়া যাহারা ভারতকে একান্ত করিয়া দেখে তাহারা ভারতকে সত্য করিয়া দেখে না। তেমনি যাহারা ভারতের কেবল এক অংশকেই ভারতের সমগ্রতা হইতে খণ্ডিত করিয়া দেখে তাহারাও ভারতচিত্তকে নিজের চিত্তের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারে না। এই কারণ-বশতই পোলিটিক্যাল ঐক্যের অপেক্ষা উচ্চতর মহত্তর যে ঐক্য আছে তার কথা আমরা শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে পারি না।"

১২৯২ থেকে ১৩৩২ সালের মধ্যে,—অর্থাৎ মোটামুটি ১৮৮৬ থেকে ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লেখা সমাজ-সম্পর্কিত তাঁর লেখাগুলি বেরোয় 'সমাজ' বইয়ে—যেটি প্রথম প্রকাশিত হয় ৭ই সেপ্টেম্বর ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে,—পরের লেখাগুলি পরের সংস্করণে ও গ্রন্থাবলী সংস্করণে সংযোজিত হয়। পুরো সংগ্রহের মধ্যে নানা সামাজিক বিষয় দেখা যায়, যেমন, 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' ( ১২৯৮ ), 'প্রাচ্য সমাজ' ( ১২৯৮ ), 'কর্তব্যনীতি' ( ১৩০০ ), বিদেশীয় অতিথি এবং দেশীয় আতিথ্য' ( ১৩০১ ), 'পূর্ব ও পশ্চিম', ( ১৩১৫ ), 'ভারতবর্ষীয় বিবাহ' ( ১৩৩২ ), 'নারীর মনুষ্যত্ব' ( ১৩৩৫ ), ইত্যাদি। এইসব প্রবন্ধে নানা কথার মধ্যে ধর্মের বিধিনিষেধ, সামাজিক আচার,

পাপপুণ্য, পশ্চিমের বণিকজাতি ইংরেজের সঙ্গে ভারতের সামাজিক সম্পর্কের অনাত্মীয়তা প্রভৃতি প্রসঙ্গও দেখা দেয়। 'পূর্ব ও পশ্চিম' লেখাটিতে তিনি জানান —"ভারতবর্ষে মানবের ইতিহাস একটি বিশেষ সার্থকতার মূর্তি পরিগ্রহ করিবে, পরিপূর্ণতাকে একটি অপূর্ব আকার দান করিয়া তাহাকে সমস্ত মানবের সামগ্রী করিয়া তুলিবে;– ইহা অপেক্ষা কোনো ক্ষুদ্র অভিপ্রায় ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই।' হিন্দু, মুসলমান, ইংরেজ প্রভৃতি সকলকে নিয়েই 'বৃহৎ ভারতবর্ষ' গড়ে উঠবে—১৩১৫ বঙ্গাব্দে এই ছিল তাঁর বিশেষ শুভেচ্ছা। এই প্রবন্ধেই তিনি লেখেন —"ভারতবর্ষের যে অংশ সমস্তের সহিত মিলিতে চাহিবে না, যাহা কোনো একটা বিশেষ অতীত কালের অন্তরালের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া অন্য সকল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে চাহিবে, যে আপনার চারিদিকে কেবল বাধা রচনা করিয়া তুলিবে, ভারত-ইতিহাসের বিধাতা তাহাকে আঘাতের পর আঘাতে হয় পরম দুঃখে সকলের সঙ্গে সমান করিয়া দিবেন, নয় তাহাকে অনাবশ্যক ব্যাঘাত বলিয়া একেবারে বর্জন করিবেন।" রবীন্দ্রনাথের মনে এই ঐক্যের আদর্শ কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের একচ্ছত্র প্রতাপাধীন ঐক্যের প্রতি আগ্রহবশে যে দেখা দেয়নি, সেকথা বলাই বাহুল্য। না, পোলিটিকাল ঐক্যের কথাও নয়। সেই ১৩১৫ সালেই তাঁর বক্তব্য ছিল "শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ আমরা অনেকেই মনে করি যে, ভারতবর্ষে আমরা নানাজাতি যে একত্রে মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছি, ইহার উদ্দেশ্য পোলিটিকাল বল লাভ করা। · ভারতবর্ষে আমরা সকল মানুষে মিলিব, ইহা অন্য সকল উদ্দেশ্যের চেয়ে বড়ো, কারণ ইহা মনুষ্যত্ব।" সেই ভাবে মিলতে না পারাকেই তিনি 'পাপ বলেন। আত্মশক্তির উদ্বোধন ছাড়া মিলনের পথ কোথায়? তাঁর একটি কথা—"রাবণ ভগবানের শত্রুতা করিয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ইহার অর্থ এই যে, সত্যের নিকট পরাস্ত হইলে নিবিড়ভাবে সত্যের উপলব্ধি হইয়া থাকে। সত্যকে অবিরোধে অসংশয়ে সহজে গ্রহণ করিলে তাহাকে সম্পূর্ণ গ্রহণ করা হয় না।" তিনি ইংরেজের সঙ্গে সে-পর্বে ভারতে মিলন সাধনার ওপর শুধু জোরই দেননি, তিনি লিখেছিলেন যে, আমাদের অকৃপণ হতে হবে, ইংরেজকেও অকৃপণভাবে তার যা শ্রেষ্ঠ সেই শ্রেষ্ঠসম্পদই ভারতকে দিতে হবে।

এই অপেক্ষাকৃত আধুনিক পর্ব থেকে ভারত-ইতিহাসের আরো অতীত ও ভবিষ্যতের আরো সম্ভাব্য ধারার দিকে দৃষ্টিপাত করেছিলেন তিনি। মারাঠা-

জাতির অভ্যুদয় প্রসঙ্গে রাজপুতানার ইতিহাস, শিখদের বীরত্ব ইত্যাদি ব্যাপার তাঁর আলোচনায় দেখা দেয়। 'শিবজী ও মারাঠা জাতি' থেকে এই অনুচ্ছেদগুলি এখানে দেখা যেতে পারে—

"সমগ্র দেশের কোনো বিশেষ কালের ইতিহাসকে রক্ষা করিবার স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টা দেশের লোকের দ্বারা যদি ভারতবর্ষের কোথাও ঘটিয়া থাকে, সে মহারাষ্ট্র দেশে। মহারাষ্ট্রের 'বখর'গুলি তাহার নিদর্শন।

"যে সময় লইয়া এই সকল জাতীয় ইতিবৃত্ত রচিত হইতেছিল সেই সময়ে দেশের লোকে যে আপনাদের একটি অঙ্গবদ্ধ স্পষ্টসত্তা অনুভব করিয়াছিল, তাহা এই ইতিহাস লিখিবার প্রবৃত্তির দ্বারাই নিশ্চিত সপ্রমাণ হইতেছে।

"রাজপুতানাতেও ইতিহাসের টুকরা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা এক একটি দলের, এক-একটি খণ্ড রাজ্যের ইতিহাস ; সমস্ত রাজপুত জাতির ইতিহাস নহে। কিন্তু মারাঠাদের সম্মিলিত পরিচয় আছে ; তাহা কেবল এক-একটি গোত্রবিশেষের গৌরবকীর্তন নহে।"

বিষয়টি পরিস্ফুট করতে গিয়ে অনেক উদাহরণের মধ্যে তিনি দেখান যে, ইংলণ্ডে ব্রিটনরা ডেনদের সঙ্গে, স্যাক্শনদের সঙ্গে লড়াই করেছে একসময়ে ; রোমানরা এসে তাদের ওপর কিছুদিন আধিপত্য করে গেছে, তারপর নরমানরা গ্রেট ব্রিটেন অধিকারও করেছে। "এই সকল কাড়াকাড়ি ছেঁড়াছেঁড়ির বৃত্তান্তে ইতিহাসের মূর্তি প্রস্ফুট নহে। কিন্তু ইংলণ্ডে যখন জাতি গড়িয়া উঠিতে লাগিলে, নানা শক্তির মন্থনে যখন হইতে দেশের চিত্ত সজাগ হইয়া আপনার লক্ষ্য নির্ণয় ও তাহার পথ পরিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইল, তখন হইতে ইংলণ্ডের ইতিহাস যেন দেহ ধারণ করিল এবং এই ইতিহাস মানুষের শিক্ষার বিষয় হইয়া উঠিল।" ইতিহাস-তত্ত্বের আলোচনায় দেশের চিত্তজাগৃতির ওপরেই রবীন্দ্রনাথকে বিশেষ জোর দিতে দেখা যায়। তাঁর নিজের কথায়—"ভারতবর্ষেও মোগল-পাঠানে মিলিয়া রক্তবর্ণ নাট্যমঞ্চে যে অভিনয় করিয়া গিয়াছে তাহাতে রসের অভাব নাই, কিন্তু তাহাতে ইতিহাস জমিয়া উঠে নাই।'

তিনি এই মূল সূত্রের ওপর জোর দেন যে ভারতবর্ষের নিজস্ব উদাহরণ নিয়ে যদি কেউ জাতিগঠনের প্রেরণার নিয়ম, শক্তি, উন্নতির স্তরগুলি ও পতনের ক্রম দেখাতে চান, তাহলে—"কেবলমাত্র মারাঠা ও শিখের ইতিহাস তাহার সম্বল।"

সমগ্র মারাঠা-জাতিই শিবাজীকে এক মহৎ ভাবের প্রতিভূ 'মহাপুরুষ' করে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথ শিবাজীর সেই 'মহাপুরুষ' হয়ে ওঠার মূলে—"উচ্চ-নীচের, ব্রাহ্মণ-শূদ্রের কৃত্রিম ব্যবধান' দেশ থেকে উৎপাটিত করে ফেলার পূর্বায়োজনের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর নিজের ভাষায়—"মারাঠায় ধর্মান্দোলনে দেশের সমস্ত লোক একত্র মথিত হইতেছিল। শিবাজীর প্রতিভা সেই মন্থন হইতে হইয়াছে।" শিবাজীর নেতৃত্বের মূলে সমস্ত মারাঠা-জাতির আন্তরিকতা ছিল বলেই ঔরঙ্গজেবের জালে বন্দী শিবাজীকে যখন তাঁর রাজত্ব থেকে সুদীর্ঘকাল দূরে কাটাতে হয়েছে তখনো তাঁর প্রেরণা জাতির মন থেকে নিশ্চিহ্ন হয়নি। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে, পরে যখন সেই ধর্মবোধ দূষিত হয়ে স্বার্থপরতা দেখা দেয় তখনই ব্যাপক ভাবে ভেদবুদ্ধি ছড়িয়ে পড়ে এবং ইতিহাসে এইভাবেই মারাঠার পতন ঘটে।

অপর পক্ষে, শিখ ইতিহাস আরম্ভ হয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই—তবে, গুরু নানকের সংকীর্ণতাবিজয়ী মনুষ্যত্বের উপলব্ধিপ্রসাদে। গুরু নানকের দীক্ষিত শিষ্যেরাই শিখ' হন। প্রথম অবস্থায় সম্মিলিত শিখদলের মধ্যে জাতিগত স্বাতন্ত্র্যের সম্ভাবনা ছিল না। মোগলদের অত্যাচারে নানাভাবে উৎপীড়িত হয়ে আত্মরক্ষার তাগিদেই শিখদের রণনিপুণ হয়ে উঠতে হয়। নানকের সময়ে নয়,—গুরু গোবিন্দের সময়েই শিখশক্তি ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেই বৃহৎ রণনৈপুণ্যের অধিকারী হয়ে ওঠে। নানক ছিলেন উদারপন্থী মানবপ্রেমিক; গুরুগোবিন্দ হয়ে ওঠেন রাজনীতিদক্ষ রণনেতা। তারপর মোগল শক্তি ক্ষীণ হয়ে এসেছে এবং শিখজাতিদের ক্ষমতা বিস্তারের লোলুপতা বেড়েছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—"গুরুর পরিবর্তে তিনি (গুরুগোবিন্দ) শিখদিগকে তরবারি দান করিলেন। তিনি যখন চলিয়া গেলেন তখন নানকের প্রচারিত মহাসত্য গ্রন্থসাহেবের মধ্যে আবদ্ধ হইল. তাহা গুরু-পরম্পরায় জীবন প্রবাহে ধাবিত হইয়া মানব সমাজকে ফলবান করিবার জন্য অপ্রতিহত গতিতে সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকিল না; এক জায়গায় তাহা অবরুদ্ধ হইয়া গেল।' সেই অসংযমের দুর্দিন উত্তরোত্তর বেড়েছে এবং সেই দলাদলির মধ্যেই রণজিৎ সিংহের পরাক্রম দেখা দেয়। তিনি প্রেমে নয়,—বাহুবলে,—স্বার্থপুষ্টির জন্যেই সমস্ত শিখকে ছলে বলে কৌশলে নিবিড় করে বেঁধেছিলেন। এই হোলো রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের মূল কথা।

এসব কথা এই কারণেই এখানে স্মরণ করা গেল যে, রাজনীতির কথাসূত্রে

শ্রীঅরবিন্দও মানুষের ব্যাপক চিত্তজাগৃতির ওপরেই জোর দিয়ে গেছেন। তাঁর বাংলা নিবন্ধ 'স্বাধীনতার অর্থ', 'সমাজের কথা', ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি—যেগুলি এখন 'শ্রীঅরবিন্দের মূল বাঙ্গলা রচনাবলী' [.-১৯৬৯] বইয়ে পাওয়া যায়, সেগুলি এই-সূত্রেই মনে পড়ে। বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গুরু গোবিন্দ সিংহের জীবনী পড়ে তিনি লিখেছিলেন যে, শিখদের ঐ দশম গুরু "কেবল যোদ্ধা ও রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি ধার্মিক মহাপুরুষ ও ভগবদাদিষ্ট ধর্মোপদেষ্টা ছিলেন, নানকের সাত্বিক বেদান্ত শিক্ষাবহুল ধর্মকে নূতন আকার দিয়াছিলেন।" রাজনীতি শ্রীঅরবিন্দের, গান্ধীজীর বা রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মনুষ্যত্বের পূর্ণতার লক্ষ্য থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো পৃথক লক্ষ্যচর্চা নয়।

## ২৯

এই আলোচনার প্রথম খণ্ডেও যেমন বারবার দেখানো হয়েছে, উপস্থিত দ্বিতীয় খণ্ডেও তেমনি এই কথাটি বারবার দেখা দেওয়া অপরিহার্য যে, ভারতের ঐতিহ্যগত আধ্যাত্মিক দৃষ্টি আমাদের রাজনীতি-ভাবনায় ও রাজনৈতিক কর্মপ্রবাহে অনুস্যূত হয়ে আছে। এই সূত্রেই অতঃপর রামকৃষ্ণ-সংঘের কথা ওঠাও স্বাভাবিক।

১৮৯৬-এর 'নাইনটিন্থ্ সেঞ্চুরি পত্রিকার অগস্ট সংখ্যায় জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্স্মুলার সাহেব 'এ রিয়াল মহাত্মন্' নামে এক প্রবন্ধ লিখে পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মহিমার কথা প্রকাশ করেন। তার দু'বছর পরে 'রামকৃষ্ণ: তাঁর জীবনী ও বাণী' নামে ম্যাক্স্মুলারের গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই বইটি প্রধানত পাশ্চাত্ত্য পাঠকসমাজের কাছে রামকৃষ্ণের অসামান্য ব্যক্তিত্ব ও তাঁর ভাব-কর্মের মহিমা তুলে ধরার প্রয়াস হিশেবেই গণ্য। ১৮৯৮-এর ১৮ই অক্টোবর তারিখে লেখা সেই গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় ম্যাক্স্মুলার লেখেন যে রামকৃষ্ণদেবের শিষ্যদের কাছ থেকে, ভারতীয় পত্র-পত্রিকা থেকে এবং যেসব বইয়ে তাঁর জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা আছে, সেইসব বই থেকে তিনি প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ

করেন। তখনকার ভারতীয় সমাজের হঠযোগী ও অন্যান্য শ্রেণীর সাধু-সন্ন্যাসীর, রাজা-মহারাজার, বিভিন্ন মানুষের পরিচয় মোটামুটি যাঁরাই ভারতে থেকেছেন, তাঁরা সকলেই জানতেন। কিন্তু মাক্‌স্‌মুলার নিজে কখনোই ভারতে আসেননি। ঐ ভূমিকাতেঃ তিনি জানান যে, ভারতীয় সন্ন্যাসীদের অনুসরণ বা অনুকরণ করবার আশঙ্কা ইউরোপে কখনোই ঘটবে না—"We need not fear that the Sannyasins of India will ever find followers or imitators in Europe, or would it be at all desirable that they should, not even for the sake of Psychic Research, or for experiments in Physico-psychological Laboratarics." কিন্তু ভারতকে বোঝাবার জন্যেই রামকৃষ্ণ-কথা ইউরোপকে জানতে হবে। রামকৃষ্ণের ঈশ্বরবোধ বা আধ্যাত্মিক উপলব্ধি যে সন্তান-জননী সম্পর্কবোধে—অর্থাৎ মাতৃভাবে আশ্রিত, এই দিকটি ঐ ভূমিকায় বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়। রামকৃষ্ণের বেশ কয়েকটি বাণী তুলে দেখানো হয় সেই সূত্রে।

১৪ই মার্চ ১৮৯৯ তারিখের 'উদ্বোধন'-এ স্বামী বিবেকানন্দের লেখা ম্যাক্‌স্‌-মুলারের এই বইটির যে পরিচিতি বেরোয়, তাতে তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অর্থসাহায্যে অধ্যাপক ম্যাক্‌স্‌মুলারের অনেক বছরের পরিশ্রমের ফলে প্রকাশিত সমগ্র ঋগ্বেদ-সংহিতার পরিচ্ছন্নতার কথাপ্রসঙ্গে একজন বিদেশীর পক্ষে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিকীর্ণ বিচিত্র লিপির পাঠোদ্ধার করে, ভুলভ্রান্তির সংস্কার ঘটিয়ে দেবনাগরী বর্ণমালায় রচিত সেই সুপ্রাচীন গ্রন্থের পূর্ণাঙ্গ, সুপাঠ্য, সুস্পষ্ট অর্থ-ব্যাখ্যানসমৃদ্ধ একটি সংস্করণ ঘটিয়ে তোলা যে কতো কঠিন সাফল্য, তার উল্লেখ করেন। বিবেকানন্দের অনুভব থেকেই দেখা যায় যে, ম্যাক্‌সমুলার যেন সর্বান্তঃ-করণে বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির ঋষিদের যজ্ঞধূমাচ্ছন্ন প্রাচীন ভারতেই বাস করে গেছেন—যেখানকার হাওয়ায় বৈদিক সূক্তগুলির আবৃত্তি চলেছে এবং যেখানকার ঘরে ঘরে গৃহসূত্রের বিধিনিদেশ পালিত,—গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতি নারীর উজ্জ্বল মহিমা যেখানে।

শ্রীঅরবিন্দ বৈদিক কালের ভারতবর্ষে সেভাবে আবিষ্ট ছিলেন না। সময়ের প্রবাহ ও ভারতের জনমানসিকতার পরিবর্তন সম্বন্ধে তিনি যে খুবই সচেতন ছিলেন, সেকথা অনেকবার বলা হয়েছে। এখানে সেই সূত্রেই তাঁর ইহজীবনের শেষ পর্বে লেখা কয়েকটি প্রবন্ধের কথা উল্লেখ করা দরকার। কারণ, তাঁর নিজের বহুবিচিত্র

রাজনীতি চিন্তার সঙ্গে তাঁর ভারতবোধ—এবং ভারত ইতিহাসের প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক অধ্যায়গুলির প্রকৃতিভেদ সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি ভেবে দেখা অত্যাবশ্যক।

তাঁর জন্মশতবর্ষ সংস্করণের রচনাবলীর ষোড়শ খণ্ডের প্রথমাংশে 'The Supramental Manifestation upon Earth', এই বিভাগে পরপর যে আটটি নিবন্ধ পাওয়া যায় সেইগুলিই তাঁর শেষ গদ্য রচনা। 'বুলেটিন অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন'— পরে যার নাম হয় 'বুলেটিন অফ শ্রীঅরবিন্দ ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার অফ এডুকেশন'—সেই পত্রিকার জন্যেই তিনি এগুলি লেখেন। ১৯৪৯-এর ২১-এ ফেব্রুয়ারি থেকে এই 'বুলেটিন অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন' প্রকাশিত হতে থাকে এবং পূর্বোক্ত আটটি নিবন্ধের প্রথমটি ১৯৪৮-এর ৩০-এ ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দের উক্তির শ্রুতিলিখন থেকে মুদ্রিত হয় এতে তিনি আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন এবং মানসিক ও আত্মিক সাধনা যে শারীরিক স্বাস্থ্যচর্চার ওপর বিশেষ নির্ভরশীল, সে বিষয়ে নানা কথার মধ্যে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সাহস, কৌশল, সংকল্পের স্থৈর্য ইত্যাদি প্রসঙ্গের ওপর জোর দেন। দ্বিতীয় নিবন্ধের নাম 'Perfection of the Body'। শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্—এই বহুশ্রুত সংস্কৃত বচনটি উল্লেখ করে তিনি জানান—"A divine life in a meterial world implies necessarily a union of the two ends of existence, the spiritual summit and the material base.' জড়-কে তুচ্ছ করেননি তিনি, অর্থাৎ তাঁর মতে, এই জড় বস্তুময় দুনিয়ায় দিব্যজীবনের দিকে লক্ষ্য রাখা মানেই নিচের জড়ত্বের অধিষ্ঠান আর শিখরের আত্মিকতা,—অস্তিত্বের এই দুই প্রান্তের সমন্বয় বোঝায়। আত্মার ভিত্তি তথাকথিত যে 'জড়ে' আশ্রিত, সেই জড় উঠেছে আত্মিকতার (heights of the spirit) উর্ধ্বমুখে এবং আত্মিক সত্তা বা আত্মিকতার মহিমা জড়াভিমুখী গতিতে নেমে বাস্তব জগৎকে আলোতে ঐশ্বর্যে শক্তিতে প্রভাময় করে তুলছে। ফলে, বস্তুজগৎ উত্তরোত্তর দিব্যজগৎ হয়ে উঠছে। এইভাবেই শ্রীঅরবিন্দ রূপান্তর বা transformation-এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে লেখেন—"The transformatioa is not a change into something purely subtle and spiritual to which Matter is in its nature repugnant and by which it is felt as an obstacle or shackle binding the spirit, it takes up Matter as a form of the spirit though now a form which con-

ceals and turns it into a revealing instrument, it does not cast away the energies of Matter, its capacities, its methods, it brings out their hidden possibilities, uplifts, sublimates, discloses their innate divinity."

তাঁর এইসব কথার গূঢ়ার্থ হোলো দিব্যতার পথে জড় বা 'ম্যাটার'ও সত্যিকার বাধা নয়, পরিত্যাজ্য নয়,—সমস্ত নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণতার দিকে উত্তরণ,—যা বাঁধা বলে মনে হয়, তাকে সহায়ক যন্ত্ররূপে রূপান্তরিত করাই লক্ষ্য।

'পূর্ণতা' কথাটির ইঙ্গিত কী? আমরা জীব-স্তরে যে চেতনা অবলম্বন করে বেঁচে আছি, সেই চেতনার অপূর্ণতা সম্বন্ধে আমরা কি অবহিত নই? নানা কামনা-বাসনার অস্থিরতায় মন নিত্যই আক্রান্ত হয়ে আছে। কোন প্রাপ্তিই—যেন এখানে পরমা প্রাপ্তি নয়। কাজে কাজেই নিজের ভেতর থেকেই সন্তোষের সূত্র খুঁজে দেখতে হয়। শুধু দর্শনশাস্ত্রের সূত্র বা টীকা, ব্যাখ্যা বা ভাষ্য পড়ে তো তৃপ্তি হয় না। জগতের সর্বত্রই মুষ্টিমেয় সত্যদ্রষ্টা এই উপলব্ধি নানাভাবে ব্যক্ত করেছেন। ভারতবর্ষে বৈদিক যুগে,—তার আগেও—এবং সুদূর প্রাচীনকাল থেকে অদ্যাবধি এই পথ সন্ধানের প্রতি আগ্রহ অনেক সংসারী মানুষকেও আকর্ষণ করেনি কি?

তাঁর জীবনবৃত্তান্তের কালানুক্রমিক সংক্ষিপ্ত তালিকা আছে জন্মশতবর্ষ সংস্করণ গ্রন্থমালার ৩০-এর খণ্ডে। ১৮৭২-এর ১৫ই অগস্ট কলকাতায় তাঁর জন্ম; ১৮৭২-৭৯তে রংপুরে প্রথমে ও পরে দার্জিলিঙের লরেটো কন্‌ভেণ্ট স্কুলে তাঁর শিক্ষা; (১৮৭৮-এর ২১এ ফেব্রুয়ারি শ্রীমার প্যারিতে জন্ম); ১৮৭৯-তে বালক অরবিন্দের ইংলণ্ডে যাত্রা; ১৮৭৯-৮৪ ম্যাঞ্চেষ্টারে, ৮৪, শেক্‌সপীয়র ষ্ট্রীটে ড্রুয়েট পরিবারে অবস্থান, ১৮৮৪-র সেপ্টেম্বরে লণ্ডনে সেণ্টপলস্ স্কুলে প্রবেশ ও ৪৯, সেণ্ট স্টিফেনস্ অ্যাভিনু, লণ্ডনে বাস; ১৮৮৬-তে কেস্‌উইকে অবকাশ উদ্‌যাপন; ১৮৮৭-তে হেষ্টিংসে অবকাশ উদ্‌যাপনের পরে লণ্ডনে ১২৮, ক্রমওয়েল রোডে অবস্থান; ১৮৮৯-এর ডিসেম্বরে সেণ্টপলস্ স্কুল থেকেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; ১৮৯০-এর জুলাইয়ে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের জন্যে শিক্ষানবীশীর সূচনা এবং ঐ বছরে ১১ই অক্টোবর কেম্ব্রিজে কিংস্ কলেজে বৃত্তিসহযোগে প্রবেশ,—কেম্ব্রিজে ছাত্রাবস্থাতেই ছাত্রসংঘ ভারতীয় মজলিশে যোগদান ও ভারতের স্বাধীনতার দাবি

সম্বন্ধে নানা বক্তৃতা ; ১৮৯২ এর মে মাসে ক্লাসিকাল ট্রাইপোস পরীক্ষার প্রথম ভাগের পরীক্ষায়—এবং অগষ্টে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ,—অক্টোবরে কেম্ব্রিজ থেকে লণ্ডনে গিয়ে ৬, বার্লিটন রোডে বাস—এবং লণ্ডনেই 'লোটাস অ্যাণ্ড ড্যাগার' নামে পূর্বকথিত গুপ্ত সংগঠনে যোগের সঙ্গে সঙ্গে যোগাভ্যাসের প্রাক্‌কর্ম—আত্মনিরীক্ষার চেষ্টা,—ঐ বছরেই অশ্বারোহণ-পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ায় আই. সি এস. থেকে অব্যাহতি ,—১৮৯২এ বিলেতে বাসের সময়েই বরোদার মহারাজ গায়কোয়াডের অধীনে চাকবি প্রাপ্তি ,—১৮৯৩-এর ১২ই জানুয়ারি 'কার্থেজ' জাহাজে জিব্রাণ্টার—পোর্টসৈয়দ-এডেনের পথে যাত্রা ও ৬ই ফেব্রুয়াবি বোম্বাইয়ে অ্যাপলো বন্দরে পৌঁছেই অপূর্ব এক প্রশান্তির বোধ—যা অনেকদিন তাঁর মন অধিকার করে থাকে ,—ঐ বছরে ১৮ই ফেব্রুয়ারি তিনি বরোদার কাজে যোগ দেন, তবে তাঁর মাইনে শুরু হয় ৮ই থেকে, কারণ সম্ভবত ঐ তারিখেই তিনি বরোদায় পৌঁছেছিলেন ,—নিজের মহাভারত-অনুবাদ ইত্যাদি কাজকর্মের ( মার্চ-এপ্রিল ) পরে ২৬এ জুন বোম্বাইয়ের 'ইন্দুপ্রকাশ পত্রিকায় 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দি ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট' নামে একটি লেখা দেন তিনি ;—৭ই অগষ্ট থেকে ৫ই মার্চ ১৮৯৪-এর মধ্যে সেই 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকাতেই পূর্বকথিত 'নিউ ল্যাম্পস্ ফর দি ওল্ড্ নামে তাঁর আলোচনাপর্যায় ছাপা হয ,—সেই ১৮৯৪-এ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ১৬ই জুলাই থেকে ২৭এ অগষ্টের মধ্যে 'বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি' নামে তাঁর আলোচনাগুলি বেরোয় ,—১৮৯৫-এ বেরোয় তাঁর ইংরেজি কবিতাসংগ্রহ 'Songs to Myrtilla' ,—সম্ভবত ১৮৯৬-এ বেরোয় 'Uravasie' নামে কাহিনীকাব্য ; বরোদায় ১৮৯৭-এ তিনি ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপনা শুরু করেন ; ১৮৯৮-এ ইংরেজির অধ্যাপক নিযুক্ত হন বরোদা কলেজে ; ১৮৯৯-এ ইংরেজি অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী অধ্যাপনা চলতে থাকে ;—ঐ বছর জুন-জুলাইয়ে 'Love and Death' নামে এক কাহিনীকাব্য লেখেন এবং ২২-এ জুলাই বরোদা কলেজের এক সম্মেলনী সভায় বক্তৃতা দেন। ১৯০০-তে তাঁর প্রথম রাজনৈতিক কাজ যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলায় বিপ্লবী সংগঠনে নিজের বিশ্বস্ত কর্মী হিশেবে প্রচারকর্মে পাঠানো ; ১৯০১ এ তিনি কলেজের বিতর্কসভায় সভাপতি হন। সেই বছরেই বরোদা রাজ্যে কলেজ থেকে রাজস্ব-বিভাগের কাজে বদলি করা হয় তাঁকে। সেই বছরেই ৩০এ এপ্রিল কলকাতায় ভূপালচন্দ্র বসুর কন্যা মৃণালিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। নববধূকে এবং নিজের বোন সরোজিনীকে নিয়ে তিনি নৈনীতালে যান।

২৮এ এপ্রিল ১৯০২ থেকে ২৯এ ১৯০২ পর্যন্ত ছুটিতে ছিলেন তিনি। ১৯০২ থেকেই বাংলায় বিপ্লবী কাজকর্মের সংগঠনে তিনি আত্মনিয়োগ করেন এবং সেই বছর ডিসেম্বরে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের আহমেদাবাদ অধিবেশনে লোকমান্য তিলকের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর। ১৯০২-০৩ সালে পশ্চিম ভারতে এক গুপ্ত-সমিতিতে যোগ দেন। ১৯০৩-এর জানুয়ারিতে বরোদা কলেজে আবার অধ্যাপনা শুরু করেন, কিন্তু ২২এ ফেব্রুয়ারি আবার এক মাসের ছুটিতে যান। মে থেকে অগষ্ট মাসের মধ্যে ঐ বছরে মহারাজের সঙ্গে কাশ্মীর-ভ্রমণে যান তিনি—এবং সেখানে তখৎ-এ-সুলেমানে অসীম মহাশূন্যের অলৌকিক অভিজ্ঞতা ঘটে তাঁর। ১৯০২-এ একবার বরোদা রাজ্যে 'হুজুর কামদার' অর্থাৎ দেওয়ানের সহায়ক পদে কাজ করেছিলেন তিনি; ১৯০৪এ আবার কিছুদিন সেই পদে গায়কোয়াড়ের সচিব হিশেবে কাজ করেন; সেপ্টেম্বরে ২৮ তারিখে আবার ফেরেন কলেজের অধ্যাপনাকর্মে। সেই ১৯০৪-এর ডিসেম্বরে ভারতের জাতীয় মহাসভার বোম্বাই-অধিবেশনে যোগ দেন তিনি। ১৯০৪ সালেই তাঁর যোগাভ্যাস শুরু হয়। ১৯০৫-এর জানুয়ারিতে বরোদা কলেজের ভাইস-প্রিন্সিপাল এবং ৩রা মার্চ অস্থায়ী অধ্যক্ষ হন। ইতিমধ্যে ১৬ই অক্টোবর ১৯০৫ বঙ্গভঙ্গের ঘটনা ঘটে,—এবং সেই সময়ে 'No Compromise' ও 'Bhawani Mandir' নামে পুস্তিকা লেখেন অরবিন্দ। সে হোলো বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের ঠিক আগেকার ঘটনা। ১৯০৫-এর ডিসেম্বরেই তিনি ভারতের জাতীয় মহাসভার বারাণসী-অধিবেশনে উপস্থিত হন। ১৯০৬-এর ১৯-এ ফেব্রুয়ারি ছুটি নিয়ে বাংলায় যান তিনি; ১১ই মার্চ সেখানে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ গঠনের সময়ে উপস্থিত ছিলেন। ১২ই মার্চ বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা 'যুগান্তর'-এর সূচনা ঘটে। এই বিপ্লববাদী পত্রিকার প্রথম দিকের কয়েক সংখ্যায় লিখেছিলেন তিনি এবং এটির নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারেও তাঁর বরাবরই বেশ হাত ছিল ১৪ই এপ্রিল ১৯০৬ বরিশাল সম্মেলনীতে যোগ দেন তিনি এবং বিপিনচন্দ্র পালের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক সফর সমাপনের পরে জুন মাসে বরোদায় ফেরেন। ১৯০৬ এর ১৯এ জুন বরোদা কলেজ থেকে বিনা বেতনে এক বছরের ছুটি নিয়ে বাংলায় ফিরে আসেন এবং ৬ই অগষ্ট ১৯০৬ 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার সূচনা ঘটে—যাতে সহযোগী সম্পাদক পদে তিনি যোগ দেন। সেই বছরে ১৪ই অগষ্ট কলকাতায় 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ' স্থাপিত হয়,—অরবিন্দ হন অধ্যক্ষ। ১৩ই অক্টোবর তাঁরই পরামর্শে বন্দেমাতম্ এক সম্মিলিত জয়েন্টস্টক কোম্পানীভুক্ত

হয়। ঐ বছর অক্টোবর থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতায় অসুস্থ ছিলেন তিনি সেই সময়ে 'বন্দেমাতরম্'-এর এবং বাংলার জাতীয়তাবাদী দলের নীতি নির্ধার নেতৃত্বও ছিল তাঁরই ওপরে ন্যস্ত। ডিসেম্বরের ১১ই থেকে ১৪ই পর্যন্ত স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্যে তিনি দেওঘরে যান এবং কলকাতায় ফিরে ভারতের জাতীয়-মহাসভার কলিকাতা-অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। ১৯০৭-এর জানুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত দেওঘরে বাসের সুযোগেই তিনি 'Prince of Edur' নামে এক ট্যাধর্মী রোমান্স রচনার কাজে নিযুক্ত ছিলেন ২৮এ জানুয়ারি থেকে ১২ই ফব্রুয়ারির মধ্যে। ১২ই এপ্রিল থেকে ২৩এ এপ্রিলের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় তাঁর 'The Doctrine of Passive Resistance' বেরোয় এবং ২রা জুন 'বন্দেমাতরম্' এর সাপ্তাহিক সংস্করণ প্রথম প্রকাশিত হয়। ৮ই জুন ব্রিটিশ সরকার 'বন্দেমাতরম্'-সম্পাদককে সাবধান করে দেন। ১৪ই জুন অরবিন্দ 'জাতীয় বিদ্যালয়' স্থাপনের জন্যে কলকাতা থেকে খুলনায় যান। সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম্ পত্রিকায় ৩০-এ জুন থেকে ১৩ই অক্টোবরের মধ্যে তাঁর 'Perseus the Deliverer' নামে এক নাটক ছাপা হয়। ৩০এ জুলাই 'বন্দেমাতরম্' আপিস তল্লাসী হয় এবং অরবিন্দের বিরুদ্ধে সরকারী অভিযোগ নথীভুক্ত হয়। ২রা অগষ্ট তিনি বাংলার জাতীয় মহাবিদ্যালযের অধ্যক্ষ পদে ইস্তফা দেন। ১৬ই অগষ্ট বন্দেমাতরম্-এ প্রকাশিত লেখাব জন্যে তিনি ধরা পড়েন এবং জামিনে খালাস পান। ২৩এ অগষ্ট বাংলার জাতীয় মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রদের কাছে এক ভাষণ দেন তিনি—এবং ২৩এ সেপ্টেম্বরে মুক্তির পরে কলেজের অধ্যাপক পদে পুনরায় যোগ দেন। ২৩এ সেপ্টেম্বর মুক্তিলাভের পরেই বাংলার জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্ব নিতে হয় তাঁকে। সেই বছরের অক্টোবরে কলকাতায় ছকু খানসামোর গলিতে বাসা ভাড়া নিয়ে ১৪এ অক্টোবর তিনি আবার দেওঘরে যান। ৭ই থেকে ৯ই ডিসেম্বর, ১৯০৭ মেদিনীপুরে বাংলায় প্রাদেশিক সম্মেলনীতে তিনি জাতীয়তাবাদী দলের অধিনায়ক রূপে উপস্থিত ছিলেন এবং ৮ই মেদিনীপুরেই জাতীয়তাবাদীদের পৃথক এক সভায় সভাপতিত্ব করেন। ১৪ই ডিসেম্বর কলকাতায় কলেজ স্কোয়ারে সাধারণ জনসভায় তিনি তাঁর প্রথম ভাষণ দেন। ১৫ই বীডন স্কোয়ারে তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয়। ২১এ ডিসেম্বর তিনি কংগ্রেসের সুরাট অধিবেশনে যোগ দেবার জন্যে কলকাতা থেকে যাত্রা করেন। পথে ২২এ ডিসেম্বর নাগপুরে এক সভায় ভাষণ দিয়ে ২৪-২৫ ডিসেম্বর সুরাটে জাতীয় দলের

প্রতিনিধিদের সভায় বক্তৃতা দিতে হয় তাঁকে। পুরো ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দটি তাঁর জীবনে রাজনৈতিক নানা ভাষণ, প্রতিনিধিত্ব, তর্ক-বিতর্ক ও ব্যস্ততার বছর গেছে। এই আলোচনায় এইসব বৃত্তান্ত অজস্র কথার মধ্যে বারবার দেখা দিয়েছে।—সেই ১৯০৬-০৭-এ এবং তার পরেও তিনি ছিলেন পুরোপুরি 'বিপ্লবী'। কিন্তু তাঁর সেই 'বিপ্লব'-চিন্তায় অন্তর্নিহিত সার্বিক প্রয়াস ও ব্যাকুলতা কখনোই মানুষের পোলিটিকাল সীমাতেই আবদ্ধ ছিল না। ১৯০৭-এর ২৪-এ থেকে ৩১-এ ডিসেম্বর পর্যন্ত গেছে সুরাট-পর্ব, ২৬-এ ডিসেম্বর ছিল সেখানকার প্রথম অধিবেশন। ২৭-এ ডিসেম্বর তারিখে দ্বিতীয় অধিবেশনে অরবিন্দের বক্তৃতার ফলেই কংগ্রেসে ভাঙন ঘটে যায়। ২৮-এ তারিখে জাতীয়-দলের সভায় তাঁকে বক্তৃতা দিতে হয় এবং সভাপতিত্ব করতে হয়। তারপর ৩১-এ ডিসেম্বর ১৯০৭ তারিখে তিনি সুরাট থেকে বরোদায় ফিরে যান।

এর আগেই উপস্থিত খণ্ডের ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠায় রমেশচন্দ্র মজুমদারের মন্তব্য দেখা গেছে এবং গুপ্ত বিপ্লব-সমিতি গড়ে তোলবার জন্তে অরবিন্দের চেষ্টা,—১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যস্ত কার্যপদ্ধতির নিন্দা,—দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে নতুন নেতৃত্বের জন্তে তাঁর সক্রিয়তা ইত্যাদি দেখা গেছে। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দেই তিলকের সঙ্গে তিনি দেখা করেন, সে-কথাও ঐ একই অংশে আলোচিত হয়েছে। ১৯০২ থেকে রাজনৈতিক সংগঠনের কাজে প্রত্যক্ষভাবে তাঁর অংশগ্রহণ এবং ১৯০৪ থেকে তাঁর যোগাভ্যাসের সূচনা,—পূর্বপ্রদর্শিত এই দুটি তথ্য একযোগে এখানে পুনরায় চিন্তনীয়। দয়ানন্দকে অরবিন্দ আমাদের সামগ্রিক 'নেশন'-বোধ জাগিয়ে তোলার নেতা বলেছেন সেই পর্বে এবং রামমোহনের সঙ্গে একযোগে তাঁর নাম উচ্চারণ করেন এইভাবে,—"The essential is that he seized justly on the Veda as India's Rock of Ages and the daring conception to build on what his penetrating glance perceived in it a whole education of youth, a whole manhood and a whole nationhood. Rammohan Roy, that other great soul and puissant worker who laid his hand on Bengal and shook her to what mighty issues—out of her long, indolent sleep by her rivers

and rice-fields—Rammohan Ray stopped short at the Upanishads. Dayananda looked beyond and perceived that our true original seed was the Veda. He had the national instinct and he was able to make it luminous, an intuition in place of an instinct. Therefore the works that derive from him, however they depart from received traditions, must needs be profoundly national."[২৪]

১৯০৮-এর জানুয়ারি-তে অরবিন্দ বরোদায় ফিরে মহারাষ্ট্র-নিবাসী যোগী বিষ্ণু-ভাস্কর লেলের সঙ্গে সাক্ষাতের পরে শুরু ব্রহ্মচৈতন্যে নিজের মন-কে লীন করবার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। আবার বিভিন্ন জনসভায় তিনি কিছু-কিছু ভাষণ দিতে থাকেন ঐ সময়ে,—পুনা-তে ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারি,—গিরগাঁও বোম্বাইয়ে জাতীয় শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা হয় ১৫ই জানুয়ারি,—'বর্তমান পরিস্থিতি' সম্বন্ধে বোম্বাই জাতীয় সংঘ-তে ১৯-এ জানুয়ারি,—২৪-এ জানুয়ারি নাসিক-এ,—২৬-এ জানুয়ারি ধুলিয়াতে,—২৮-এ ও ২৯-এ জানুয়ারি অমরাবতীতে,—৩০-এ এবং ৩১-এ জানুয়ারি নাগপুরে,—আবার, পয়লা ফেব্রুয়ারি ১৯০৮ তারিখেও নাগপুরে। অতঃপর ১০ই মার্চ বিপিনচন্দ্র পালের কারামুক্তি উপলক্ষে হাওড়ায় বিপিনচন্দ্রের সংবর্ধনা-সভাতেও তিনি ভাষণ দেন। ৮ই এপ্রিল চেতলায়, —১০ই এপ্রিল কলকাতায় পান্তির মাঠে সম্মিলিত কংগ্রেস সম্পর্কে তাঁর ভাষণ ঘটে। দুদিন পরে ১২ই তারিখে বারুইপুরে,—তার ছ'দিন পরে ১৮ই এপ্রিল কিশোরগঞ্জে পল্লী-সমিতি সম্পর্কে বক্তৃতা দেন তিনি। সেই এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখে কলকাতায় তেইশ-নম্বর স্কট্‌স লেন থেকে 'নবশক্তি'-আপিসে আঠাশ নম্বর গ্রে ষ্ট্রীটে (বর্তমানে অরবিন্দ সরণী) তাঁর বাসস্থান উঠে যায়। —এবং ২-রা মে, ১৯০৮ তারিখে সেই গ্রে ষ্ট্রীটের নিবাস থেকেই তাঁর ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমারের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের সূত্রে তিনি গ্রেপ্তার হয়ে লালবাজার পুলিশ-হাজতে স্থানান্তরিত হন। এসব ঘটনা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা গেছে, তবু এখানে তাঁর আধ্যাত্মিক-রাজনৈতিক সেই বিশেষ কর্মবহুল পর্বের দ্রুত প্রবাহিত ধারায় পুনরায় উল্লেখ করা গেল। ৫ই মে তারিখে তাঁকে আলিপুর জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। ১৯০৮-এর সেই ৫ই মে থেকে ১৯০৯-এর ৬ই মে পর্যন্ত পুরো একটি বছর বিচারাধীন বন্দী হিসেবে আলিপুর জেলখানায় বাসের

২৪। 'Bankim-Tilak-Dayananda'

পর্বেই গীতা উপনিষদ অধ্যয়নে এবং যোগাভ্যাসে তাঁর দিন কেটে যায়। এই আলোচনার প্রথম খণ্ডে ১১, ১২, ২৭ সংখ্যক অধ্যায়গুলিতে তাঁর 'কারাকাহিনী'-প্রসঙ্গ দেখা গেছে,—চারুচন্দ্র দত্তের এবং অন্যান্য কারো-কারো উক্তিও দেখা গেছে। এখানে, ১৯০৯-এর ৬ই মে বিচারে মুক্তিলাভের সময় থেকে ১৯১০-এর ফেব্রুয়ারির প্রায় শেষ পর্যন্ত তিনি যে ৬ নম্বর কলেজ স্কোয়ারে বাস করেছেন,—১৪ই মে ১৯০৯ তারিখের 'Bengalee' পত্রিকায় চিঠি লিখেছেন,—৩০-এ মে, ১৯০৯ তারিখে তিনি তাঁর বিখ্যাত উত্তরপাড়া-ভাষণ দিয়েছেন, সেই প্রসঙ্গগুলির সঙ্গেই ১৩ই জুন ১৯০৯ বীডন স্কোয়ারে তাঁর বক্তৃতা,—১৯-এ জুন সাপ্তাহিক ইংরেজি 'Karmayogin' পত্রিকার সূচনা—যে পত্রিকা তাঁরই পরিচালনায় প্রকাশিত হোতো এবং যাতে প্রধানত তিনিই লিখতেন,—এবং সেই বছরে ১৯-এ জুন ১৯০৯ তারিখেই বরিশাল জেলায় ঝালকাটিতে তাঁর বক্তৃতা,—২৩-এ জুন বাখরগঞ্জে তাঁর ভাষণ,—২৬-এ জুন খুলনায়, —পরদিন ২৭-এ জুন হাওড়ায় সংঘ বা সমিতি গঠনের অধিকার সম্বন্ধে তাঁর বক্তৃতা, —১১ই জুলাই কুমারটুলিতে, —১৮ই জুলাই কলেজ স্কোয়ারের ভাষণও স্মরণীয়। ৩০-এ জুলাই ১৯০৯ তারিখে 'Karmayogin' পত্রিকায় 'আমার দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি' লেখবার আগেই ব্রিটিশ সরকার তাঁকে দেশ থেকে নির্বাসিত অর্থাৎ দ্বীপান্তরিত করবার উদ্যোগ করছিলেন। ২৩-এ অগস্ট ১৯০৯ তারিখে 'ধর্ম' নামে বাংলা সাপ্তাহিক —যা তাঁরই পরিচালিত এবং যাতে তাঁরই বেশির ভাগ লেখা বেরিয়েছে সে-সময়ে, সেই পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে তিনি হুগলীতে অনুষ্ঠিত বাংলা প্রাদেশিক সম্মেলনীতে জাতীয়তাবাদী-দলের নেতৃত্ব করেন। সেই সেপ্টেম্বরেই শ্রীহট্টে এক রাজনৈতিক সম্মেলনেও উপস্থিত ছিলেন তিনি। ৯ই অক্টোবর ১৯০৯ থেকে ১৩ই নভেম্বর পর্যন্ত ইংরেজি 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় 'দি ব্রেইন অফ ইণ্ডিয়া' নামে তাঁর প্রবন্ধ বেরোয়। তারই মধ্যে ১০ই অক্টোবর কলেজ-স্কোয়ারে এক বক্তৃতা দেন তিনি এবং ১৩ই অক্টোবর 'কলকাতায় স্বদেশী' সম্বন্ধে তাঁর আর এক বক্তৃতা দেন। ১৮ই অক্টোবর ১৯০৯ 'ধর্ম' পত্রিকায় তাঁর 'দুর্গাস্তোত্র' বেরোয়। ২০-এ নভেম্বর থেকে ২৫-এ ডিসেম্বরের মধ্যে সেই 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় আর্টের জাতীয় মূল্য সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখেন তিনি,—এবং ২৫-এ ডিসেম্বর লেখেন 'আমার দেশবাসীর প্রতি'।

১০ই এপ্রিল ১৯০৮ তারিখে কলকাতায় পান্তির মাঠে যে সভা হয়, তাতে সুরাটের ভাঙনের পরে স্থগিত কংগ্রেসের কীভাবে পুনরুজ্জীবন ঘটানো যায়, সে

বিষয়ে আলোচনা করা ছিল বিশেষ উদ্দেশ্য। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস সেই সভার সভাপতিত্ব করেন। কয়েকজনের ভাষণের পরে অরবিন্দ ঘোষ বলতে ওঠেন এবং তাঁর সেই বক্তৃতাতে শোনা যায় যে, সুরাটে কংগ্রেস যে ভেঙে যায়, সে ছিল ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং কংগ্রেস যদি আবার এক হয়, সেও হবে ঈশ্বরেরই ইচ্ছাতে।[২৫] তিনি বলেন যে পাবনায়, ধুলিয়া-তে এবং অন্যান্য জায়গায় লোকে অবিভক্ত সম্মিলিত এক কংগ্রেস চেয়েছে, সুতরাং 'আমাদের' কর্তব্য হোলো মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ কোনো নীতি পরিত্যাগ না ক'রে যদি বিভাগ পুনরায় জোড়া লাগাতে হয়, তাহলে তা ক'রতে হবে, কিন্তু কংগ্রেসে সেরকম জোড় যে ঘটবে, তাঁর নিজের সে সম্পর্কে আশা ছিল সামান্যই। ১৯০৮-এর সেই 'Indian Resurgence and Europe' নামে আলোচনায় তিনি দেখান যে, ইউরোপের অনেক দেশেই গণতন্ত্র তখনো পূর্ণ পরিণত হয়ে ওঠেনি, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আর জনগণ পরস্পরের প্রতি সশস্ত্র নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলেছে। প্রজাতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদির কথা উঠলেই শাসকদল চান গণতন্ত্রকে কোনোমতে রুখে দিতে। গণতান্ত্রিক দেশগুলির দিকে তাকালেও দেখা যায় ধন ও শ্রম, সম্পত্তি ও দারিদ্র্যের মধ্যে সহযোগিতা নেই, জড়বাদী সভ্যতার বুকের মধ্যেই নীতিভ্রষ্টতার অসুখ তখন,—ইউরোপের সেইসব দেশকে যা ক্ষয়রোগের মতন আক্রমণ করেছে। এই প্রবন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য ছিল এই, —"Under the fair outside of its material civilisation a deep seated moral disease is at work eating into the vitals of European Society of which a thousand symptoms strike the eye, from the extreme of bomb throwing Anarchism to the other extreme of Tolstoy's Utopianism." ভারতবর্ষ সেখান থেকে কোন্ কল্যাণই বা পেতে পারে? তাঁর বক্তব্য ছিল, —স্বরাজ চাই আমাদের। —অবশ্যই স্বদেশী চরিত্রগুণ চাই—এবং সেজন্যে বিদেশী ভাবও বর্জন করতে হবে। স্বর্গত ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ তুলে শ্রদ্ধা জানান তিনি, কারণ পূর্ণভাবে ভারতীয় হয়ে ওঠবার স্বাদেশিকতা ছিল তাঁর সারা-জীবনের সাধনায় এবং তাঁর প্রত্যেক কাজে।[২৬] ২৯-এ এপ্রিল, ১৯০৮-এর 'বন্দেমাতরম'-এ 'By the way'-অংশে 'দি প্যারাব্ল অফ সতী' কাহিনীতে

কংগ্রেসের সুরাট-পর্বের সূত্র ধরেই দক্ষ-যজ্ঞের প্রসঙ্গ দেখা দেয় এবং তাতে কংগ্রেস বা ভারতের জাতীয়-মহাসভাকে 'দক্ষ',—ভারতীয় জাতিকে দক্ষকন্যা 'পার্বতী',—সেই পার্বতীর ঋষি-নির্ধারিত পতি শিব-কে পার্বতী যে প্রথম বারাণসীতে দেখেন এবং কলকাতায় স্বরাজ, স্বদেশী, বিদেশী-বর্জন এবং জাতীয় শিক্ষা এই চতুর্ধা মন্ত্রে তাঁদের বিবাহ হয়—এই কাহিনী শুনিয়ে এই বিবাহে দক্ষ-রাজের প্রচণ্ড অসন্তোষ এবং বিবাহ-সভায় বর ভাঙ্-সেবী মহাদেবের 'বম্ বম্ বন্দেমাতরম্' ডাক ইত্যাদি চিত্তাকর্ষক চিত্রে পরিহাস ও কটাক্ষের আবেদন ছিল বিস্ময়কর। এই ভাষাচিত্রের মধ্যেই বলা হয় যে, ক্ষুব্ধ মহাদেবের প্রতাপে আধুনিক দক্ষেরও মাথা কাটা যায়,—এবং পৌরাণিক দক্ষের শিরশ্ছেদের পরে যেমন তার ধড়ের ওপর ছাগমুণ্ড বসিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আধুনিক কংগ্রেস-'দক্ষে'রও তেমনি ছাগমুণ্ড!—"After the death of the Congress, the unity of India which was the daughter of the Congress, must break up into factions and groups."[২৭] এই রকম তাঁর আরো অজস্র ভাষণে, আলোচনায়—স্পষ্ট বা তির্যক, সত্য ও তীব্র নানা মন্তব্য দেখা যায়। ১৯-এ জানুয়ারি, ১৯০৮ তারিখে তাঁর বোম্বাইয়ের বক্তৃতার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। রাজনীতির প্রসঙ্গেও তিনি বারবার ঈশ্বরের অভিপ্রায় উল্লেখ করেন। সেই বোম্বাইয়ের মহাজন-ওয়াড়িতে অরবিন্দ বোম্বাই ন্যাশনাল ইউনিয়নের সভায় বলেন,—রানাডে বলেছেন, এখানে কোনো সভাপতি বা প্রেসিডেন্ট নেই, কিন্তু ঈশ্বরই আমাদের সভাপতি। আমি সেকথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে নিয়ে বর্তমান পরিস্থিতিতে কী যে আমাদের প্রয়োজন, সে-বিষয়ে ঈশ্বর আমাকে বলতে অনুপ্রেরিত করুন, এই প্রার্থনা জানাই। এই ব'লে, তিনি তাঁর হাতের সেদিনের ইংরেজি 'বন্দেমাতরম' পত্রিকা দেখিয়ে বলেন যে, আজ এই কাগজে দুটি খবর দেখলুম—১। 'যুগান্তর'-মামলায় এই রায় বেরিয়েছে যে মুদ্রাকরের দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড ঘটেছে, ২। 'নবশক্তি' পত্রিকার আপিশ তছনছ ক'রেছে পুলিশ এবং দশ হাজার টাকার জামিনে মুদ্রাকরকে ছাড়া হয়েছে। —এই হোলো আজকের পরিস্থিতি। আমি কী বলছি, তা কি আপনাদের বোধগম্য হচ্ছে? আজ ভারতে ন্যাশনালিজম্ বলে এক মত আছে যা এসেছে বাংলা থেকে। আপনারা কি জানেন ঐ জাতীয়তা-বোধের তাৎপর্য কী? ঐ শব্দে কোন্ হাতিয়ার আপনারা হাতে নিয়েছেন, তা কি অনুভব করছেন আপনারা? নাকি শুধুই উচ্চবুদ্ধিমত্তার অহংকার বশেই

একরকম বুদ্ধিলব্ধ প্রত্যয় হিসেবেই ওটি এখন আপনাদের অধিকারে ?

অতঃপর বিষয়টি ব্যাখ্যা ক'রে তিনি জাতীয়তাবোধ যে ঈশ্বরপ্রদত্ত বোধ, সে-বিষয়ে বলতে-বলতে জাতীয়তা যে এক ধর্মবোধ,—জাতীয়তাধর্ম যে বাংলায় আন্দোলনের ফসল,—জাতীয়তা মানলে 'দেশের জন্যে সর্বস্বপণ' করা যে অনিবার্য আচরণ, সে-সব তিনি সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলেন। এই সূত্রে তাঁর মূল ইংরেজি ভাষণ—"What is Nationalism? Nationalism is not a mere political programme; Nationalism is a religion that has come from God. Nationalism is a creed which you shall have to live. Let no man dare to call himself a Nationalist if he does so merely with a sort of intellectual pride, thinking that he is more patriotic, thinking that he is something higher than those who do not call themselves by that name If you are going to be a Nationalist, if you are going to assent to this religion of Nationalism, you must do it in the religious spirit You must remember that you are the instruments of God What is this that has happend in Bengal? You call yourselves Nationalists, but when this happens to you, what will you do? This thing is happening daily in Bengal because in Bengal, Nationalism has come to the people as a religion, and it has been accepted as a religion. But certain forces which are against that religion are trying to crush its rising strength. It always happens when a new religion is preached, when God is going to be born in the people, that such forces rise with all their weapons in their hands to crush that religion. In Bengal too a new religion, a religion divine and *Sattwic* has been preached and this religion they are trying with all the weapons at their command to crush. By what strength are we in Bengal able to survive? Nationalism has not been crushed, Nationalism is not going to be crushed. Nationalism survives in the strength of God and it is not possible to crush

it, whatever weapons are brought against it." [২৮]

এই ভাষণে জাতীয়তা, ঈশ্বর, ধর্ম ইত্যাদি শব্দগুলি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর মুখে এসে গেছে! দেখা যায়, জাতীয়তার সাধকদের তিনি ঈশ্বর-প্রেরিত বলে মনে করেন। রাজনীতি যে আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কী রকম ওতপ্রোত ভাবে সম্পৃক্ত, অরবিন্দের আগেকার এবং তাঁর পরবর্তী ধ্যান-ধারণাতে তো বটেই, —এই ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এই ভাষণেও তাঁর এই উপলব্ধির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে; এই ভাষণেই তিনি জানান যে, বাংলায় যখন শিক্ষিত সাধারণ ইউরোপীয় সভ্যতার অনুসরণে মত্ত ছিল, তখন নাস্তিক্য, সংশয়বাদ, শুভনাস্তিকতাবোধ দেখা দেয়। কিন্তু বিশ্বাসের হাওয়া যখন বাংলার অন্য দিক থেকে বইতে শুরু হয়, তখন—'In Bengal came a flood of religious truth এবং এই সূত্রেই মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা। সেই কারণেই অরবিন্দের প্রসঙ্গ থেকে ক্ষণে ক্ষণে রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে যেতে হয়।

১৩০৮ সালের শ্রাবণে 'নেশন কী' প্রবন্ধে ('আত্মশক্তি ও সমূহ' প্রবন্ধ গ্রন্থে এখন সংকলিত) রবীন্দ্রনাথ 'ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এর বাংলা অনুবাদে 'জাতীয় মহাসভা' প্রয়োগটি অসংগত ব'লে মন্তব্য করেন। সেই প্রবন্ধের প্রথম বাক্যেই সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভাবুক রেনাঁ-র 'নেশন'-ভাবনার উল্লেখ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ লেখেন,—"স্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই। চলিত ভাষায় সাধারণত 'জাতি' বলিতে 'বর্ণ' বুঝায় এবং জাতি বলিতে ইংরাজিতে যাহাকে race বলে তাহাও বুঝাইয়া থাকে। আমরা 'জাতি' শব্দ ইংরাজি 'রেস' শব্দের প্রতিশব্দ রূপেই ব্যবহার করিব, এবং নেশনকে নেশনই বলিব। নেশন ও ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অনেক অর্থদ্বৈধ-ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো যায়।"

'জাতি' শব্দটি বাঙালী, মারাঠি, শিখ ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীভেদে নানা আচার-বেষ্টিত পৃথক পৃথক সম্প্রদায় বুঝিয়ে থাকে, কিন্তু তাতে ভারতের সকল অঞ্চলের সকল শ্রেণীর অধিবাসীসমষ্টি বোঝায় না। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করেন যে, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-বাসীরা সেখানকার ন্যাশনাল সভাকে বলেন 'মহাজন সভা' ও 'সার্বজনিক সভা'। কিন্তু বাংলার পক্ষে সে-রকম অনুবাদও তিনি অনুমোদনযোগ্য মনে করেননি, কারণ, 'মহাজন' বাংলায় ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এবং 'সার্বজনিক' শব্দকে —"বিশেষ্য আকারে নেশন শব্দের প্রতিশব্দ করা যায় না।" তাই তাঁর কথায়, —"ভাবটা আমরা ইংরাজের কাছ হইতে

---

২৮। 'The Present Situation' : তদেব, পৃষ্ঠা ৩৫২-৫৩ দ্রষ্টব্য।

পাইয়াছি, ভাষাটাও ইংরাজি রাখিয়া ঋণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি।" এই স্বীকৃতির সমর্থনে তিনি এই নজীরের উল্লেখ করেন, —"উপনিষদের ব্রহ্ম, শংকরের মায়া ও বুদ্ধের নির্বাণ শব্দ ইংরাজি রচনায় প্রায় ভাষান্তরিত হয় না, এবং না হওয়াই উচিত।"

নেশনের উদ্ভব ও স্বরূপ ব্যাখ্যাসূত্রে তিনি রেনাঁ-র এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে ইজিপ্ট, চীন, প্রাচীন কাল্‌ডিয়া—আসিরীয়, পারসিক বা আলেকজাণ্ডারের সাম্রাজ্যও নেশন হয়ে ওঠেনি। রোম-সাম্রাজ্য নেশন হতে হতেও হয়নি। —"সম্পূর্ণ নেশন বাঁধিতে না-বাঁধিতে বর্বর জাতির অভিঘাতে তাহা ভাঙিয়া টুকরা হইয়া গেল" —এবং সেইসব খণ্ডগুলি নানা শতাব্দীর বিচিত্র সংঘাতের স্রোতে ক্রমে নেশন হয়েছে,—ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানি ও রাশিয়া ক্রমে সকল নেশনের শীর্ষস্থান অধিকার করে। রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যের পরেই দেখা দেয় নতুন প্রশ্ন, —"কিন্তু ইহারা নেশন কেন? সুইজরল্যাণ্ড তাহার বিবিধ জাতি ও ভাষাকে লইয়া কেন নেশন হইল? অষ্ট্রিয়া কেন কেবল-মাত্র রাজ্য হইল, নেশন হইল না?"

অতঃপর তিনি জানান যে কোনো কোনো রাষ্ট্রতত্ত্ববিদের মতে নেশনের উদ্ভব ঘটে প্রবল পরাক্রান্ত বিশেষ কোনো রাজার প্রতাপে। সেই রাজবংশ কালপ্রবাহে কেন্দ্ররূপ লাভ করে এবং তাতেই বিশেষ নেশন দেখা দেয়। ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড এই নিয়মের উদাহরণ; ইটালির পক্ষে নেশন হয়ে উঠতে অনেক দেরি হয়, তার কারণ সে দেশের বিস্তর ছোট ছোট রাজার মধ্যে কোনো বিশেষ একজন মধ্যবর্তী কেন্দ্ররূপ নিতে পারেননি দীর্ঘকাল। আবার রবীন্দ্রনাথ এও দেখিয়েছেন যে, এ-নিয়ম সব ক্ষেত্রে খাটে না —"যে সুইজরল্যাণ্ড ও আমেরিকার ইউনাইটেড স্টেট্‌স্ ক্রমে ক্রমে সংযোগ সাধন করিতে করিতে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা তো রাজবংশের সাহায্য পায় নাই।" আবার—"রাজশক্তি নাই নেশন আছে, রাজশক্তি ধ্বংস হইয়া গেছে, নেশন টিকিয়া আছে, এ দৃষ্টান্ত কাহারও অগোচর নাই।"

কালক্রমে রাজার অধিকারের চেয়ে ন্যাশনাল অধিকার অনেক বড়ো হয়ে উঠেছে। জাতীয় ঐক্য থেকে নেশনের উদ্ভব, —এরকম ধারণা ঠিক নয়, আবার ভাষার ঐক্যই নেশনের মূল শক্তি এ-ধারণাও ঠিক নয়। ধর্মগত ঐক্যও নেশনের ভিত্তি নয়। রেনাঁর মতে বৈষয়িক স্বার্থের ঐক্যও নেশন গড়ে তুলবেই যে, তারও কোনো স্থিরতা নেই। এবং ভৌগোলিক বা প্রাকৃতিক সীমানা মেনেই যে নেশন গড়ে ওঠে, সকল ক্ষেত্রে তাও মানা যায় না।

নেশনকে এক সজীব সত্তা বলে তিনি এই ব্যাখ্যা করেন যে, সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতি সম্পদ আর পরস্পর একত্রে বাস করবার সম্মতির ওপরেই নেশনের অস্তিত্ব নির্ভর করে। মানুষের ইচ্ছারও পরিবর্তন ঘটতে পারে, অতএব নেশনেরও পরিবর্তন ঘটতে পারে।

এইভাবে রেনাঁর নেশনতত্ত্ব সংক্ষেপে সূত্রাকারে জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ সেই ১৩০৮ সালের শ্রাবণেই 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' নিবন্ধে সেই তত্ত্ব আমাদের দেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ ও বিচারের চেষ্টা করেন। তিনি জানান,—"যে শক্তিতে এক করে, সেই শক্তিই সভ্যতার জননী"—কিন্তু তখনকার তুরস্ক যে-সব জায়গা দখল করেছিল, সে-সব ক্ষেত্রে রাজ্যশাসন এক হলেও অন্য কোনো ঐক্য ছিল না। প্রাচীন রোম-সাম্রাজ্য যখন বর্বর জাতির আক্রমণে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় তখন,—"তাহারা আপন আপন রাজ্যের মধ্যে মিশিয়া গেল—কোথাও জোড়ের চিহ্ন রাখিল না। জেতা ও বিজিত ভাষায় ধর্মে সমাজে একাঙ্গ হইয়া এক-একটি নেশন কলেবর ধরিল।" রবীন্দ্রনাথ এইসূত্রে মনে করেন,— "বিচিত্রকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ" —এবং সেই ১৩০৮ সালেই তিনি লেখেন যে, চীনে এবং ভারতবর্ষে য়ুরোপের মিলনী-শক্তি ও বিনাশ-শক্তি দুইই তখন প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছিল। লোকচিত্তের একতা সব দেশে ঠিক এক পথে সাধিত হয় না। —"এইজন্য য়ুরোপীয়ের ঐক্য ও হিন্দুর ঐক্য এক প্রকারের নহে, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা ঐক্য নাই, সে-কথা বলা যায় না। সে ঐক্যকে ন্যাশনাল ঐক্য না বলিতে পার—কারণ নেশন ও ন্যাশনাল কথাটা আমাদের নহে।" আমেরিকায় অষ্ট্রেলিয়ায় য়ুরোপীয়েরা গিয়ে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের হত্যা ও বিতাড়িত করেছে, তাদের সঙ্গে কিছুতেই মিশে যেতে পারে নি। আমেরিকা-অষ্ট্রেলিয়ায় খ্রীষ্টান য়ুরোপ যথার্থ খ্রীষ্টীয় মমতা নিয়ে যায় নি। নিজেদের পৃথক স্বাজাত্যবোধ তাদের ক্ষেত্রে বড়োই স্পর্শকাতর ছিল। কিন্তু— "অনেক যুদ্ধবিরোধের পরে হিন্দু সভ্যতা যাহাদিগকে এক করিয়া লইয়াছিল, তাহারা অসবর্ণ। তাহারা স্বভাবতই এক নহে।" তাই খুবই সহজ ভাষায় রবীন্দ্রনাথ লেখেন যে, 'মানুষ-বাঁধা'-ই হোলো নেশনতত্ত্বের মূল সূত্র। তাঁর আরো একটি বাক্য বিশেষ স্মরণীয় যাতে তিনি জানান —"নেশন গড়িতে যেমন স্মৃতির দরকার, তেমনি বিস্মৃতির দরকার— নেশনকে বিচ্ছেদ বিরোধের কথা যত শীঘ্র সম্ভব ভুলিতে হইবে।" হিন্দু সমাজের পরিধি সুবিস্তীর্ণ, তাতে নানা জাতির মিলন ঘটেছে। কিন্তু তার কেন্দ্র কোথায়? এই প্রশ্নটি তুলে রেনাঁ-র প্রসঙ্গ পুনরায় স্মরণ ক'রে তিনি

জানান যে, রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যচেষ্টা উপেক্ষণীয় নয় বটে, তবে—আমাদের সর্বাধিক মাননীয় বন্ধন হোলো সমাজ-বন্ধন। —"অন্য দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে—আমাদের দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে সকল প্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে।" কিন্তু সমাজশক্তি কি পূর্বপুরুষের গঠিত কোনো চিরস্থায়ী আমানত? সেই ভ্রান্ত ধারণা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আমাদের সতর্ক ক'রে লেখেন যে, সেই বিভ্রমের প্রভাবে —আমাদের নিজেদের নিষ্ক্রিয়তার ফলেই সজীব সকর্মক য়ুরোপীয় নেশনের কাছে আমাদের পরাজয় ঘটেছে। আমাদের পূর্বপুরুষেরা নিজেরাই যেমন ভেবেছেন, বিচার করেছেন, আমরা নিজেরা যদি আমাদের নিজেদের কালের আচার-আচরণ-আদর্শ সম্বন্ধে সেই ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগ রক্ষা ক'রে পুনর্বিচার না করি, তাহলে সমাজ তো অচলায়তন হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক। কেবলমাত্র অলস ভক্তিতে নয়, নিরলস নিত্যজাগ্রত কর্মপ্রবাহেই আমাদের সজীবতা সার্থক হয়। তিনি লেখেন,— "জীবনের পরিবর্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্তন বিকার। আমাদের সমাজেও দ্রুতবেগে পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া সে পরিবর্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে—কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছে না।" অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ যেমন গত শতকের শেষ দশকে তাঁর নানা ভাষণে, নিবন্ধে আমাদের কর্মযোগের দিকে উদ্বুদ্ধ ক'রে গেছেন, বর্তমান শতকের প্রথম দিকেই রবীন্দ্রনাথ তেমনি সমাজস্বার্থ রক্ষার দিকে আমাদের নিশ্চেষ্টতা এবং য়ুরোপীয় আচার-আচরণের অনুকরণস্পৃহা দুইই লক্ষ্য ক'রে আমাদের যথার্থ ঐতিহ্যবোধ জাগ্রত রেখে ব্যক্তিস্বার্থের তুচ্ছতা দেখিয়ে গেছেন। শ্রীঅরবিন্দ সেই একই হাওয়ায় পূর্ণ জীবিত ছিলেন, সেই কথাটি ভোলবার নয়।

তাঁর স্বদেশী-সমাজের চিন্তা সূত্রগুলি সেকালে এবং পরেও রচিত নানা নিবন্ধে ছড়িয়ে আছে।

৩০

১৯১০-এর ফেব্রুয়ারিতে কলকাতা থেকে তখনকার ফরাসী-শাসিত চন্দন-নগরে চলে যান অরবিন্দ। মতিলাল রায় তাঁকে আশ্রয় দেন। তারপর সেখানে সেই ফেব্রুয়ারির শেষ দিকে থেকে প্রায় ছয় সপ্তাহ কাটিয়ে তিনি যে পয়লা এপ্রিল, ১৯১০ তারিখে তাঁর অন্তর্দেবতার নির্দেশে 'ডুপ্লে' জাহাজে

'যতীন্দ্রনাথ মিত্র' ছদ্মনামে—বিজয়কৃষ্ণ নাগ-কে 'বঙ্কিমচন্দ্র বসাক' (ছদ্মনামে) সঙ্গে নিয়ে, ৪ঠা এপ্রিল ফরাসী-শাসিত পণ্ডিচেরিতে পৌছোন, সে-প্রসঙ্গ এই আলোচনার প্রথম খণ্ডের ১২-সংখ্যক অধ্যায়ের শেষ দিকে বলা হয়েছে।

১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯১০ থেকে ২রা এপ্রিল ১৯১০-এর মধ্যে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় তাঁর 'এ সিসটেম অফ ন্যাশনাল এডুকেশন' নামে রচনা,—১৯-এ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ই মার্চের মধ্যে ঐ পত্রিকাতেই 'বাজী প্রভু' এবং ২৬-এ মার্চ থেকে ২রা এপ্রিলের মধ্যে ইংরেজিতেই ঐ পত্রিকায় বেরোয় তাঁর 'চিত্রাঙ্গদা'। এইসব নানা ধরনের রচনা, বক্তৃতা, আলোচনা থেকে তাঁর তখনকার মনের আবহাওয়া বুঝে নিতে অসুবিধা হবার কথা নয়—যদিও একথা ঠিকই যে তিনি বারবার বলে গেছেন—বাইরের ঘটনা দিয়ে তাঁর আসল ব্যক্তিত্বের স্বরূপ বোঝাবার কোনো উপায় নেই।

শ্রীঅরবিন্দের জন্মশতবর্ষ-সংস্করণের গ্রন্থাবলীর ছাব্বিশের খণ্ডে নিজের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কথার প্রথম ভাগের (Section I) তৃতীয় উপশাখায় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নেতা হিসাবে তাঁর পরিচিতি পাওয়া যায়। সেই অংশে তাঁর রাজনৈতিক ভাব-কর্মের তিনটি দিক দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে—প্রথমত, গোপন এক বৈপ্লবিক প্রচারযন্ত্র ও সংগঠন—যার সাহায্যে দেশের মধ্যেই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ সম্ভব হবে,—দ্বিতীয়ত, তিনি যখন রাজনীতিতে প্রবেশ করেন, তখন ভারতের অধিকাংশ জনসাধারণই দেশের যে স্বাধীনতাকে অবাস্তব স্বপ্নকল্পনা তথা অসম্ভব বলে মনে করতেন, সেই স্বাধীনতার আদর্শ জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ক'রে তাঁদের মনোভাবের পরিবর্তন-সাধন ছিল তাঁর অন্যতম উদ্দেশ্য,—তৃতীয়ত, তখন এমন এক জনসংগঠন ছিল—যার বিশেষ লক্ষ্যই ছিল সম্মিলিতভাবে ক্রমবর্ধমান অসহযোগিতা ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের পথে বিদেশী শাসনের শক্তিক্ষয় করা। অর্থাৎ এই তিন দিকেরই লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ স্বাধীনতার উচ্ছেদ।

সেকালে বড়ো বড়ো সাম্রাজ্য-শক্তির অস্ত্রবলের সীমা ছিল রাইফেল পর্যন্তই। উড়োজাহাজের এবং কামান প্রভৃতির নৈপুণ্য তখনো এখনকার মতো পরিণত হয়নি, অর্থাৎ উত্তরকালের বিধ্বংসী সামরিক শক্তিতে পৌছোতে তখনো কিছু দেরি ছিল। এদিকে ভারত ছিল নিরস্ত্র। ফলে, শ্রীঅরবিন্দের এই বিশ্বাস ছিল যে, দেশের বাইরে থেকে অস্ত্র আনিয়ে আমাদের এতোবড়ো দেশে স্বল্পসংখ্যক ব্রিটিশ সেনা-শক্তির বিরুদ্ধে অন্তত গেরিলা-যুদ্ধ চালানো অসম্ভব হবে না। তাছাড়া সাধারণ প্রতিরোধ ও বিপ্লবের সম্ভাবনা তো

থাকবেই। সেই সঙ্গে তিনি ব্রিটিশের চরিত্র—মানে, তাদের রাজনৈতিক প্রবণতাগুলিও খতিয়ে দেখেছিলেন এবং তাতে তাঁর এই ধারণা হয় যে, ভারতের মানুষ যদি আত্মমুক্তি সাধনের চেষ্টা করে, তাহলে ব্রিটিশ শক্তি যদিও তা দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করবে, তবু তারা হয়তো এমন সব সংস্কার মেনে নিতে পারে যাতে তাদের সাম্রাজ্যগত নিয়ন্ত্রণ দুর্বল না হয়। তবে শেষ পর্যন্ত তারা আমাদের পথের চরম প্রতিবন্ধক নাও হতে পারে। যদি প্রতিরোধ ক্রমেই ব্যাপক হতে থাকে, তাহলে ব্রিটিশের শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য হবে সাম্রাজ্য যতোটা সম্ভব নিজেদের কবলে রেখে দেওয়া অথবা তাদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেবার আগেই ভারতকে স্বাধীনতা দিয়ে দেওয়া। পুরানির শ্রীঅরবিন্দের-জীবনী থেকে এ-সব কথা বর্তমান খণ্ডের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই দেখা গেছে। এখানে নিজের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের কথা থেকে তারই সমর্থন পাওয়া গেল।

পুরানির পূর্বোক্ত আলোচনাতেই ইতিপূর্বে দেখা গেছে যে, কেউ কেউ মনে করেন যে, অরবিন্দ নাকি রাজনীতিক্ষেত্রে পুরোপুরি শান্তিবাদী ছিলেন,—সন্ত্রাসবাদ, বিপ্লব ইত্যাদিতে হিন্দু হিসাবে তাঁর একেবারেই সায় ছিল না,—এমন কি কেউ কেউ একথাও ভেবেছেন যে, তিনি অহিংসা-মন্ত্রের অগ্রদূত ছিলেন! কিন্তু এ-সব কথা একেবারেই গ্রাহ্য নয়। এ-সব প্রসঙ্গও আগেই দেখা গেছে। রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বার্থেই নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে সীমিত রাখা গ্রাহ্য এক নীতি হিসেবেই তখন মেনে নেওয়া হয়,—অহিংসামন্ত্র বা শান্তিবাদের অংশ হিসেবে নয়। শান্তি শ্রেষ্ঠ আদর্শের অঙ্গ বটে, কিন্তু সেই শান্তি হওয়া চাই আধ্যাত্মিক অথবা ন্যূনপক্ষে মানসিক। পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য-প্রকৃতির পরিবর্তন ব্যতিরেকে তা চূড়ান্তভাবে অকৃত্রিম হতে পারে না। অন্য কোনো ভিত্তিতেই শান্তির আদর্শ সত্য হয়ে উঠতে পারে না। আইনের জোরে স্বৈরতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা রোধ করা অসম্ভব নয়, আন্তর্জাতিক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক বল প্রয়োগেও শান্তি আনা যেতে পারে বটে, কিন্তু তাকে তো 'অহিংসা' বলে না। শ্রীঅরবিন্দ বেশ স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, অন্য কোনো পথ না থাকলে যে-কোনো জাতি হিংসার পথেই তার জাতীয় স্বাধীনতা ঘটিয়ে তোলবার অধিকার রাখে বইকি। সেই হিংসার পথে বিশেষ কোনো জাতি এগিয়ে যাবে কিনা, সেটা নির্ভর করে কখন কোন্‌টি শ্রেষ্ঠ কার্যকরী উপায়, তারই ওপরে। সেই নির্ভর কোনোরকম

নীতিগত বিচারের ওপরে নয়। আগেই বলা হয়েছে যে, তিলক ও অরবিন্দ এক্ষেত্রে একই নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। এবং শান্তির আধ্যাত্মিক ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয়ের দিকটিও উপস্থিত খণ্ডের প্রথম কয়েক পৃষ্ঠার মধ্যেই ব্যক্ত হয়েছে।

বিলেত থেকে ভারতে ফিরে প্রথম কয়েক বছর অরবিন্দ যখন 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় তাঁর লেখাগুলি প্রকাশ করা ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মে ছিলেন না, তখন তিনি দেশের পরিস্থিতি বুঝে দেখেছিলেন মাত্র। তারপর যখন বৈপ্লবিক আন্দোলনের প্রস্তুতিসূচী দিয়ে বরোদা সেনাদলের এক বাঙালী সৈনিক যতীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলায় পাঠালেন, তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে, প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছোতে হয়তো তিরিশ বছর লেগে যেতে পারে। সত্যিই তো তখন থেকে প্রায় পঞ্চাশ বছর লেগেছে প্রত্যাশিত সার্থকতায় পৌঁছোতে। সারা বাংলায় নানা ছলে বিপ্লবের বাণী ছড়িয়ে দেওয়া এবং যোগ্য কর্মী সংগ্রহ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। যুবশক্তিকে উদ্দীপিত করা এবং প্রবীণদের কাছে আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা পাওয়াই ছিল তাঁর সংকল্প। প্রতি শহরে এবং কালক্রমে গ্রামে গ্রামে এক-একটি কেন্দ্র গড়ে উঠুক—এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়। সেকালে দেশে যে-সব সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল, তরুণদের সেইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়েই দেশের কাজ ছাড়িয়ে দেবার সংকল্প ছিল তাঁর। সে কাজ চলছিলই। ইতিমধ্যে পশ্চিম-ভারতের এক গুপ্ত-সমিতির এক সদস্যের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় এবং সেই সংস্থার শপথ গ্রহণ করেন অরবিন্দ। বোম্বাইয়ে সেই সমিতির কাউন্সিলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। বাংলার বিপ্লবী নেতাদের মধ্যে প্রমথনাথ মিত্র ও অন্যান্যদের তিনি সেই গুপ্ত সমিতির কথা জানান এবং বাংলার বিপ্লবী কাজে-কর্মে তাঁদের সমর্থন পাবার লক্ষ্য ছিল তাঁর। প্রমথ মিত্র প্রভৃতি ঐ সমিতির শপথ গ্রহণ করেন। এই পি. মিত্রের ছিল লাঠি-খেলার সংঘ। সেই আচ্ছাদনেই তাঁর দল দেশের কাজ করতেন। তেমনি অন্যান্য সংঘের ছিল অন্যান্য আচ্ছাদন। শ্রীঅরবিন্দ চেয়েছিলেন দেশব্যাপী সংহত এক সংঘ, কিন্তু তাঁর সে আশা পূর্ণ হয়নি, তবে বিভিন্ন দলই সে সময়ে বিপ্লবের কাজ ক'রে গেছে। তারপরে আসে বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রহর যাতে চরম-পন্থী দল ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্র হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে যাতে সহিংস বিপ্লবান্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে, স্বদেশী আন্দোলনের প্রহরেই তিনি সে-সুযোগ নিয়েছিলেন। ভ্রাতা বারীন্দ্রের অনুরোধে খোলাখুলি বিদ্রোহের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি 'যুগান্তর' পত্রিকা বের করতে সম্মত হন। সেই

পত্রিকার কথাও আগে উল্লেখ করা হয়েছে এবং এখানে একথা পুনরায় স্মরণীয় যে, সেই পত্রিকার প্রথম কয়েক সংখ্যায় অরবিন্দ নিজেই কয়েকটি প্রবন্ধ লেখেন এবং সেই পত্রিকার নিয়ন্ত্রণে তাঁর বেশ অধিকার ছিল। স্বামী বিবেকানন্দের এক ভাইয়ের প্রসঙ্গ আসে এই সূত্রে,—"Sri Aurobindo himself wrote some of the opening articles in the early numbers and he always exercised a general control. When a member of the sub-editorial staff, Swami Vivekananda's brother, presented himself on his own motion to the police in a search as the editor of the paper and was prosecuted, the Yugantar under Sri Aurobindo's orders adopted the policy of refusing to defend itself in a British Court on the ground that it did not recognise the foreign Government and this immensely increased the prestige and influence of the paper" এই সূত্রে আরো লেখা হয়, –"It may be noted that the Secret Society did not include terrorism in its programme, but this element grew up in Bengal, as a result of the strong repression and the reaction to it in that Province."

নিজের সম্বন্ধে কথা-প্রসঙ্গে এসবই শ্রীঅরবিন্দের নিজস্ব উক্তি। এদিকে অধ্যাপক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সম্পাদিত "Freedom Struggle And Anushilan Samiti" বইটির প্রথম খণ্ডের পঞ্চম নিবন্ধে অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় লেখেন,—"Encouraged by the tremendous popularity of the *Sandhya*, Barin Ghosh, Bhupendranath Datta and Abinash Bhattacharyya felt inspired to publish a Bengali periodical to openly propagate revolutionary ideas. (অগ্নিযুগ : বারীন্দ্রকুমার ঘোষ). So they brought out the *Jugantar*, a Bengali weekly in March 1906 from Kanai Dhar Lane, and subsequently the office was shifted to 41, Champatala First Lane (স্বাধীনতা আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ : হরিদাস ও উমা মুখোপাধ্যায়)। The circulation of the weekly was increased from a few copies in March 1906 to 20,000 copies is 1908. It in well-known that the revolutionaries associated with the Jugantar

were all active members of the Anushilan Samiti". (পূর্বোক্ত গ্রন্থ)। বারীন্দ্রকুমার-প্রমথনাথ সম্পর্কে নীহাররঞ্জনের উক্তি :—"Since the publication of the Jugantar the contact of Barin and his associates with Mitra and the Samiti tended to be very thin, and they followed a revolutionary line independent of the Samiti."

নানা কারণে উল্লিখিত 'Freedom Struggle and Anushilan Samiti' প্রথম খণ্ড—যা এ পর্যন্ত প্রকাশিত (প্রথম প্রকাশ: ১৩ই মার্চ ১৯২১), সেই বইটি শ্রীঅরবিন্দের সেই পর্বের রাজনৈতিক ক্রিয়াকর্মের তথ্যাদির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য।

১৯০২-এর মার্চ মাসে প্রমথনাথ মিত্র, অরবিন্দ ঘোষ, চিত্তরঞ্জন দাস, সতীশচন্দ্র মল্লিক, ভগিনী নিবেদিতা প্রভৃতির নেতৃত্বে অনুশীলন-সমিতির জন্ম হয় এবং পুলিনবিহারী দাস রাসবিহারী বসু, যদুগোপাল মুখোপাধ্যায়, নরেন্দ্র-মোহন সেন, প্রতুলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী, ভাই পরমানন্দ, রামশরণ দাস, কর্তার সিং, বিষ্ণু গণেশ পিংলে প্রভৃতি শক্তিধর বিপ্লবীরা এই দলে যোগ দেন। রাউলাট-কমিটির প্রতিবেদনে এই সমিতির বৈপ্লবিক কাজ-কর্মের গুরুত্বের স্বীকৃতি পাওয়া যায়। কলকাতাতে ছিল এঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র এবং বাংলা, বিহার, আসাম, পাঞ্জাব,—এখনকার উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত পুনা প্রভৃতি অঞ্চলে এঁদের কর্মপ্রবাহ ছড়িয়ে পড়ে। এই সমিতির ৭৫তম, জন্মবার্ষিকী উদযাপনের লগ্নে বইটি প্রকাশিত হয় ১৩ই মার্চ ১৯৭৯-তে এবং প্রকাশকের ভূমিকায় পূর্বোক্ত উৎসব-সমিতির সম্পাদক শ্রীদীনেশচন্দ্র ঘটক জানান যে, কলকাতায় ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন হলে বহুসংখ্যক বিপ্লবী ১৯৭৬-এর ১৩ই মার্চ সম্মিলিত হয়ে ঐ ৭৫ তম জন্মবার্ষিকীর প্রস্তাব গ্রহণের ফলেই বইটি প্রকাশিত হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, অধ্যাপক ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এটি সম্পাদনা করেছেন। লেখকদের মধ্যে প্রথম খণ্ডে আছেন নীহাররঞ্জন রায়, সরলকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রদ্যোৎকুমার ঘোষ এবং তারাপদ লাহিড়ী।

৩১

এইখানে একটু অন্য প্রসঙ্গ স্মরণীয়। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিল মাসের মধ্যে নরমপন্থী বা মধ্যপন্থীদের নানা অদ্ভুত কার্যকলাপের পাশাপাশি

অন্যান্য ব্যাপারও ঘটেছে—যা এই প্রসঙ্গে বিশেষ চিত্তাকর্ষক। কে, আর, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর ইংরেজিতে লেখা শ্রীঅরবিন্দ-জীবনীর প্রথম খণ্ডের ৫১৯ পৃষ্ঠার এবং তার পরবর্তী কয়েক পৃষ্ঠায় সেসব উল্লেখ করেছেন। যেমন, ছ' মাস কারাবাসের পরে বিপিনচন্দ্র পাল যখন মুক্তিলাভ করেন, তখন ১০ই মার্চ ১৯০৮ তারিখের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ লেখেন—আমরা আজ ঈশ্বরের বাণী-বাহক বিপিনচন্দ্র পালকে পুনরায় অভ্যর্থনা জানাচ্ছি; মানুষ বিপিনচন্দ্রকে নয়, কিন্তু ন্যাশনালিজ্‌ম্‌-এর দৈববাণী যে-কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়, সেই বিশেষ বাণীবাহককেই! ২৭-এ মার্চ ১৯০৮ তিনি পুনরায় বিপিন চন্দ্রের প্রশস্তি করেন। ১৯০৭-এ বিপিনচন্দ্র যে মাদ্রাজ-অঞ্চলে ভ্রমণ করেছিলেন, তার ফল ফলেছিল দক্ষিণের দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের ব্যাপক প্রচারে। বাংলা, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবের মতন সেসব অঞ্চলেও জাতীয়তার বাণী ছড়িয়ে পড়ে। ১৩ই মার্চ ১৯০৮ তারিখের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় 'The Tuticorn Victory' নামে নিবন্ধে V. O. Chidambaram Pillai, Subramania Siva এবং Padmanabha Iyengar সম্পর্কে শ্রীঅরবিন্দের রচনা থেকে শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এই কথাগুলি তুলে দেখিয়েছেন—

> "The Tuticorn leaders must be given the whole credit for the unequalled skill and courage with which the fight was conducted and still more for the complete realisation of the true inwardness of the Nationalist gospel which made them identify the interests of the whole nation with the wrongs and grievances of the labourers in the Coral Mill."

আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল টিউটিকর্ণ থেকে সন্নিহিত অন্যান্য অঞ্চলে এবং ১৭ই মার্চ ১৯০৮ পূর্বোক্ত পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ লেখেন—যে আগুন এখন দেশে জ্বলছে, সেই অশান্তির আগুন থেকে আমলাতন্ত্রের উপযুক্ত শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এ তো খড়ের আগুন নয়,—এ হোলো আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার। আবার ৩০-এ মার্চ ১৯০৮ তারিখে তিনি পূর্বোক্ত চিদাম্বরম্ পিল্লাই প্রবর্তিত স্বদেশী-স্টীম-ন্যাভিগেশন-কোম্পানীর সঙ্গে ব্রিটিশ-স্টীম-ন্যাভিগেশন কোম্পানীর জীবন-মরণ লড়াই সম্বন্ধেও লেখেন। এই নিবন্ধেও ঈশ্বরের উল্লেখ ছিল। শ্রীঅরবিন্দ লিখেছিলেন—ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের পক্ষ থেকে ঈশ্বর যে সরে দাঁড়িয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই।

শ্রীনিবাসআয়েঙ্গার তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ের একাদশ অধ্যায়ে ( The Nation's Pace maker ) জানিয়েছেন যে, অরবিন্দ যে বরোদা ছেড়ে বাংলার রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং সম্ভবত ১৯০৬-এর ১৫ই আগস্ট তাঁর জন্মদিনে কলকাতায় ন্যাশনাল কলেজে যোগদান করেন,—আর তাঁর হাতে যে তখন 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার কর্মভার ছিল, সে-সবই স্বদেশের ব্যাপক জনকল্যাণের তাড়নায় ঘটেছিল। বিভিন্ন স্বদেশী কাজেই তিনি বারবার ন্যাশনাল কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছেন সে-পর্বে, তাঁর স্বাস্থ্যহানিও ঘটেছিল—এবং ন্যাশনাল কলেজ ও ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন সংগঠনের দিকে তখন ছিলেন সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,—শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়।

এদেশে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা যে মোটেই জনহিতকর ছিল না, তা তিনি দেশে ফেরার অল্পকালের মধ্যেই নিঃসংশয়ে বুঝতে পারেন। 'নিজের সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দ' সম্পর্কিত ইংরেজি আলোচনায় সে-কথা তিনি বিস্তৃতভাবে লিখেছেন এবং উপস্থিত গ্রন্থে আগেই সেসব প্রসঙ্গ অল্পবিস্তর উল্লেখ করা হয়েছে। সিরাজগঞ্জের ইস্কুলগুলিতে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়পক্ষই রাজনীতিতে যোগ দিয়েছিলেন ব'লে পূর্ববঙ্গের লেফটেনান্ট-গভর্নর হিসেবে সার ব্যামফিল্ড ফুলার (Sir Bampfyled Fuller) সেইসব ইস্কুলে অনুমোদন প্রত্যাহারের ( disaffiliate ) উদ্যোগ করেন। লর্ড মিন্টো কিন্তু তাতে বাধা দেন এবং তড়িঘড়ি ফুলারকে কাজে ইস্তফা দিয়ে ইংলণ্ডে ফিরতে বাধ্য করেন। কিন্তু সেই মিণ্টোর আমলেই সরকারের পক্ষে যে রিজ্‌লি-সার্কুলার বেরোয় Risley Circuler ), তাতে শুধু সিরাজগঞ্জের ইস্কুলগুলির প্রতিই নয়, সারা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার স্বাধীনতা হরণের নিষ্ঠুর প্রয়াস দেখা দেয়। সেসব ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের কথা —এবং ১৯০৬ থেকে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের বিভিন্ন ঘটনা প্রসঙ্গে এই আলোচনায় বারবার নজর ফেরাতে হয়। শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি-চিন্তায় দেশের সংকটের ব্যাপক ক্ষেত্রই ধরা পড়েছিল—ধর্মও যেমন, শিক্ষাও তেমনি,—স্বাধীনতা বা পূর্ণ স্বরাজ তো বটেই। 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় ১৯০৭-এর ২৮-এ মে তারিখে তিনি আমাদের আদর্শের প্রসঙ্গে, আমাদের স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের ব্রত উদ্‌যাপনের শিক্ষা সম্পর্কে জাপানের রীতির কথা তুলে লেখেন—"The Japanese when they teach Bushido to their boys do not rest content with lectures or a moral catechism ; they make them practise Bushido and govern every thought and action of

their life by the Bushido ideal. This is the only way of inculcating a quality into a nation, by instilling it practically into the minds of its youth at school and college until it becomes an ingraind, inherent, inherited national quality."
৭ই জুন তিনি লেখেন—"What India needs specially at this moment is the aggressive virtues, the spirit of soaring idealism, bold creation, fearless resistance, courageous attack of the passive *tamasic* spirit of inertia." তার আগে ২৯-এ মে ১৯০৭ তারিখের 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকাতেও তিনি রিজ্‌লি-সার্কুলারের বিরুদ্ধে লিখেছেন। জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তাঁর সুনিশ্চিত দ্বিধাহীন অভিমত ব্যক্ত হয়। ৮ই জুলাই ১৯০৭ তারিখের প্রবন্ধে তিনি প্রচলিত সরকারী শিক্ষা-ব্যবস্থার দৈন্য সম্পর্কে,—তাতে দেশের সন্তানদের মনে প্রেরণা জাগাবার সমূহ অভাব সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এই শিক্ষায় শিক্ষিতের মনে-প্রাণে যে দৈব আনন্দ বা ঐশ্বরিক বিস্ময় জাগ্রত হয় না, সে কথা জানান। এই শিক্ষা জান্তব উৎসাহ মাত্র জাগাতে পারে। ব্যক্তি ও সমাজ-মানসে যথার্থ বৃহত্তের বা ভূমার আস্পৃহা যদি না জাগে, তাহলে সংকট ক্রমেই ঘনীভূত হয়। দু'বছর পরে 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় কয়েকটি প্রবন্ধ-পর্যায়ে শিক্ষার সংকট এবং জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে তিনি আরো বিস্তৃত আলোচনা করেন। ভারতবর্ষ যে ব্রিটিশ আদর্শের শিক্ষায় মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারে না, এই কথাটি তিনি ব্যাপকভাবে আলোচনা করেন। আমরা সেই শিক্ষার ফলে আমাদের নিজস্ব জাতীয় ঐশ্বর্য ভুলতে বসেছি। আমাদের রামায়ণ মহাভারত—আমাদের ঐতিহ্যের গৌরব কিছুই আমাদের গোচরে না এলে আমরা তো ক্রীতদাস মন নিয়ে জান্তব বিলাসে আবদ্ধ থাকবার তথাকথিত উচ্চাশাতেই বন্দী থাকবো! প্রাচীন দর্শন, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মহৎ কাব্য—ভারতের এইসব সমৃদ্ধি যদি আমাদের চেতনায় আশ্রয় না পায় বা আমাদের উদ্বুদ্ধ না করে, তাহলে সেই ভয়াবহ সংকটের শেষ কোথায়? এর আগেই 'শিখ, রাজপুত মারাঠা জাতির বীরত্বের কথা রবীন্দ্রনাথের রচনা থেকে এই সূত্রেই এই আলোচনায় স্মরণ করা গেছে। শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তা সম্পর্কে সে-সব কথনোই অবান্তর নয়। ১৯৫৫-র সংস্করণে 'The Brain of India' থেকে, শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার শিক্ষা-সংস্কার সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের এই কথাগুলি তুলে দেখিয়েছেন—

"What was the secret of that gigantic intellectuality, spirituality and superhuman moral force which we see pulsating in the Ramayana and Mahabharata, in the ancient philosophy, in the supreme poetry, art, sculpture and architecture of India? What was at the basis of the incomparable public works and engineering achievements, the opulent and exquisite industries great triumphs of science. scholarship, jurisprudence, logic, metaphysics, the unique social structure?"[২৯]

এই আলোচনার প্রথম খণ্ডের চার ও পাঁচ সংখ্যক অধ্যায়ে, আবার নবম অধ্যায়ে এবং অন্যান্য অধ্যায়েও,—তাছাড়া উপস্থিত দ্বিতীয় খণ্ডের একাধিক অংশে ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি ও অধ্যাত্মচিন্তা উভয় ক্ষেত্রেই বিশেষ আগ্রহের কথা দেখা গেছে। ভারতের পরাধীনতার মধ্যে যে সংকট তিনি অনুভব করেন, সেই সংকটের চিন্তা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায়,—মধুসূদনের রচনায়, — বিদ্যাসাগরের ভাবকর্মেও বিদ্যমান ছিল। এই আলোচনায় রামমোহনের প্রসঙ্গ এর আগে অনেকবার দেখা গেছে। এখানে আর সে-প্রসঙ্গ পুনরুত্থাপনের প্রয়োজন নেই। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর বিপ্লব-চিন্তায় ও বৈপ্লবিক কর্মে বা রাজনৈতিক সংগ্রামে ঈশ্বর-ভাবনা যে কখনোই ত্যাগ করেননি এবং সে-ভাবনা পরিহার যে আমাদের রাজনৈতিক সামাজিক অর্থনৈতিক সংকট ও মূলত আমাদের আত্মবিস্মৃতি ঘটাবার ষড়যন্ত্রের ফল, সেকথাও তিনি তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে তো বটেই, তাছাড়া তাঁর সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলির প্রবন্ধে-নিবন্ধেও লিখে গেছেন। অতঃপর দুটি ব্যাপার এখানেই দেখে নেওয়া দরকার। এক,—আগে মাঝে মাঝে আলোচিত হলেও এখানে একবার তাঁর বিভিন্ন পত্রিকা সম্পাদনার পর্বায় খুবই সংক্ষেপে দেখা চাই; দুই,—'সংকট' কথাটির বহুমুখী সংকেত রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকট' নামে বিখ্যাত নিবন্ধে যেমন উচ্চারিত হয়, শ্রীঅরবিন্দও তেমনি তাঁর সারা জীবনের অজস্র রচনায় বারবার তা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর 'সাবিত্রী' কাব্যই তাঁর সকল বক্তব্যের বা সকল উপলব্ধির নির্যাস বলা চলে—এবং সাবিত্রী যে মানুষের আত্মা-সহচরী ভগবৎ-মমতা, এই সূত্রটি প্রথম খণ্ডের ১৮৩ পৃষ্ঠাতেই উল্লেখ করা হয়েছে। সভ্যতার সংকট থেকে সাবিত্রীই তাঁর একমাত্র উদ্ধারকর্ত্রী। এই বিষয়টি শুধু একটি বিশেষ কাব্যের মর্মকথা মনে করা ঠিক হবে না।

২৯। Sri Aurobindo, Vol. 1. পৃঃ ৮২৫ দ্রষ্টব্য।

শ্রীঅরবিন্দের সমস্ত জীবন ও তাঁর সকল বাণীর সঙ্গে তাঁর এই নিজস্ব নির্দেশ মিলিয়ে দেখতে হবে। পরবর্তী খণ্ডে সে-প্রসঙ্গ আলোচনার সুযোগ রইলো। এখানে অতঃপর পূর্বোক্ত প্রথম ও দ্বিতীয় প্রসঙ্গ দুটি দেখে নেওয়া যেতে পারে। পরে শিক্ষা-সম্পর্কিত সমস্যার চিন্তাও আরো দেখা যাবে।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানামুখী কাজের মধ্যেই পত্রিকা-সম্পাদনা, পত্রিকা পরিচালনা ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর মতামত প্রকাশের কাজেও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর স্বরচিত আত্মজীবনী আছে বটে, কিন্তু তাতে পর পর কালক্রম বজায় রেখে সংক্ষেপে এইসব পত্র-পত্রিকার বৃত্তান্ত দেওয়া হয়নি। এক সময়ে গিরিজাশঙ্কর রায়চৌধুরী 'উদ্বোধন' পত্রিকায় শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে জীবনী রচনাপ্রসঙ্গে ১৩৫১ সালের আষাঢ় সংখ্যায় লেখেন—"উদ্বোধন-সম্পাদক আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বামী সুন্দরানন্দ গত ১১ই ফেব্রুয়ারী উদ্বোধন অফিস হইতে আমাকে নিম্নলিখিত কথা কয়টি লিখিয়াছেন—

১। শ্রীঅরবিন্দ বাগবাজার মঠে শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করিয়া নৌকাযোগে বাগবাজার ঘাট হইতে চন্দননগর যান।

২। ব্রহ্মচারী গণেন মহারাজ ও ভগিনী নিবেদিতা শ্রীঅরবিন্দকে ঘাট পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেন।"

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর, 'স্মৃতিকথা' (মার্চ, ১৯৬২) গ্রন্থে এই তথ্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন। তিনি তাঁর পূর্বোক্ত গ্রন্থের ৪০-এর পৃষ্ঠায় লেখেন—"অরবিন্দ সেদিন কোনো মঠেই যাননি, শ্রীশ্রীমাকে প্রণাম করেননি (৺সারদামণি দেবীর সহিত অরবিন্দের কোনো দিনই দেখা হয়নি) এবং সেদিন সে-সময়ে গণেন মহারাজ বা ভগিনী নিবেদিতার সঙ্গে তাঁর কোনো সাক্ষাৎই ঘটেনি। সেদিন তিন ব্যক্তি অরবিন্দের সঙ্গে ঘাটে যান—এঁদের নাম হচ্ছে রাম মজুমদার, বীরেন ঘোষ এবং সুরেশ চক্রবর্তী। এঁদের মধ্যে রামবাবু ফিরে আসেন, অন্য দুজন অরবিন্দের সঙ্গে চন্দননগর পর্যন্ত যান।" সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা থেকে জানা যায় যে, অরবিন্দ ও তাঁর এই দুই সঙ্গী সে-রাত্রে নৌকার ছইয়ের মধ্যে চুপচাপ বসে সারারাত জ্যোৎস্নালোকিত নদীস্রোতে ভাসতে ভাসতে,—(ইতিমধ্যে একবার মাত্র আট-দশ মিনিটের মতন নদীর চড়ায় নৌকো আটকে যায়),—খুব ভোরে চন্দননগরে পৌঁছোন। প্রথমে অরবিন্দ সঙ্গী বীরেন ঘোষকে চন্দননগরের সেকালের প্রসিদ্ধ নাগরিক চারুচন্দ্র রায়ের কাছে পাঠান, কিন্তু চারু রায় আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে অক্ষমতা জানিয়ে অরবিন্দকে ফ্রান্সে যেতে পরামর্শ পাঠান। সে পরামর্শ সেই পরিস্থিতিতে অদৃষ্টের পরিহাস মাত্র।

যাই হোক, স্বল্পকালের মধ্যে মতিলাল রায় খবর পেয়ে নিজে এসে তাঁদের নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। ১৯৪৪-এ সুরেশচন্দ্র এইসব কথা লেখেন।

এই আলোচনার প্রথম খণ্ডে শ্রীঅরবিন্দের জীবনকথা প্রসঙ্গে যা লেখা হয়েছে সেই সঙ্গে এই কথাগুলি যোগ করে দেওয়া গেল।

শ্রীঅরবিন্দ নিজে কখনই তাঁর পূর্ণাঙ্গ আত্মজীবনী লেখেননি। জন্মশতবর্ষ-সংস্করণের রচনাবলীর ২৬-এর খণ্ডে তাঁর 'Sri Aurobindo on Himself' ছাপা হয়েছে। তার দুটি খণ্ড। প্রথমখণ্ডে ন'টি অধ্যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'Sri Aurobindo on Himself and on The Mother'. তার চারটি অধ্যায়।

তাঁর শিষ্য ও অনুরাগীদের কাছে তিনি তাঁর জীবনের বিশেষ বিশেষ ঘটনা, অভিজ্ঞতা বা যোগের উপলব্ধি সম্বন্ধে কিছু কিছু ব্যাখ্যা করেছেন বটে। তাঁর সম্বন্ধে প্রকাশিত কোনো কোনো ভ্রান্ত তথ্য সংশোধনও করেছেন তিনি। তাঁর তিনজন জীবনীকারের পাণ্ডুলিপি দেখে তাঁদের অনেক কিছু তথ্যও দিয়ে গেছেন। তাঁর বিভিন্ন চিঠিপত্রের মধ্যে—যোগ, কাব্য, সাহিত্য ও শিল্প-প্রসঙ্গেও তাঁর নিজের ও শ্রীমার সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য পাওয়া যায়। নিজের সম্বন্ধে উত্তম পুরুষের উল্লেখ না ক'রে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি অধম পুরুষের ব্যবহার ক'রে গেছেন। তাঁর জীবনীকারদের তিনি জানিয়ে গেছেন—তিনি নিজে ছাড়া দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিই তাঁর জীবনের যথার্থ রূপ ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম নন, সকলেই অপারগ। কারণ, তাঁর জীবনকথা তো বাইরের ঘটনাপ্রবাহ নয়, সে হোলো গভীরে নিহিত। একথা আগেও উল্লেখ করা গেছে।

পণ্ডিচেরীর আগের ঘটনাগুলি আছে প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে পরপর চারটি পর্যায়ে—ইংলণ্ডে তাঁর প্রথম জীবন; বরোদার জীবন; ভারতীয় জাতীয়তাবাদের নেতা হিসাবে তাঁর কর্মকাণ্ড, পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ভ্রান্ত তথ্যের সংশোধন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পাওয়া যায় তাঁর যোগাভ্যাসের সূচনাপর্ব।

তৃতীয় অধ্যায়ে তাঁর পথের সঙ্গে অন্যান্য পথের উল্লেখ ও আলোচনা।

চতুর্থ অধ্যায়ে আছে পার্থিব চৈতন্যের সাধনার বৃত্তান্ত।

পঞ্চম অধ্যায়টির নাম প্রভু ও পথপ্রদর্শক।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে পাওয়া যায় কবি ও সমালোচক প্রসঙ্গ।

সপ্তম অধ্যায়ে আছে তাঁর স্মৃতিচারণা ও মতামত।

অষ্টম অধ্যায়ে বিবিধ বাণী।

নবম অধ্যায়ে—প্রথম পর্বের কিছু চিঠিপত্র ছাপা হয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের চারটি অধ্যায়ের প্রথমটির নাম অভিব্যক্তি বা বিবর্তনের নেতৃবৃন্দ; দ্বিতীয় অধ্যায়ের বক্তব্য তাঁদের জ্ঞানের বা চৈতন্যের সমতা; তৃতীয় অধ্যায়ের প্রসঙ্গ—পথসন্ধানীদের অসুবিধা—এবং চতুর্থ অধ্যায়ে আছে পথের সহায়কদের বৃত্তান্ত।

পত্রিকা-সম্পাদক অরবিন্দের প্রসঙ্গ ভাবতে গেলে পর্যায়ক্রমে 'ইন্দুপ্রকাশ', 'যুগান্তর', বন্দেমাতরম্', 'কর্মযোগিন্', 'ধর্ম', 'আর্য' ইত্যাদির ধারা মনে আসে। সুরেশচন্দ্র তাঁর পূর্বোক্ত বইয়ের ২৫-এর পৃষ্ঠায় লেখেন—"হাজত থেকে বেরিয়ে অরবিন্দ আবার পূর্ণোদ্যমে দেশের কাজে লেগে যান এবং 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম' নাম দিয়ে একখানি ইংরাজী ও একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর কলমের ভঙ্গী কিছু বদলেছে। পূর্বে ইংরেজী দৈনিক 'বন্দেমাতরম্'-এ তিনি যা লিখতেন তা বিশেষ ছিল রাজনৈতিক, কিন্তু 'কর্মযোগিন্' ও 'ধর্ম'-র লেখায় একটা গভীরতর সুর শোনা যায়। যেন রাজনীতিকে উপলক্ষ্য ক'রে ইয়েজদের বোধগম্য রাজনীতির বহির্মুখক ও অগভীর দৈনন্দিন আবরণ ভেদ ক'রে ভারতবর্ষের আত্মকথা—তার চিরন্তন আত্মার কাহিনী প্রকাশের আয়োজন। এ থেকে অরবিন্দের ভবিষ্যৎ জীবনের ভ্রমণপথের নির্দেশ কতকটা ধরা যায়। রাজনৈতিক নেতার দল থেকে তিনি যেন ভারতের আত্মদ্রষ্টা ও সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের আশ্রম অভিমুখে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছেন।"

'বন্দেমাতরম্'-এর প্রায় সমকালে 'ভবানী মন্দির' নামে অরবিন্দের লেখা এক প্রচারপত্র বেরোয় ১৯০৫-০৬ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯০৫-এর জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেই 'বন্দেমাতরম্'-ধ্বনি রাজনৈতিক-আধ্যাত্মিক বিজয়-সংকল্পের ধ্বনি হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের (মৃত্যু ১৮৯৪) আয়ুষ্কালের মধ্যে সেরকম ঘটেনি। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (ডন-সোসাইটি), অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এবং আরো অনেকেই একথা জানিয়ে গেছেন।

'ইন্দুপ্রকাশ' ছিল বোম্বাই থেকে প্রকাশিত ইংরেজি মারাঠি দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন অরবিন্দের কেম্ব্রিজের বন্ধু কে. জি.

দেশপাণ্ডে। এই পত্রিকায় ৭ই আগস্ট ১৮৯৩ থেকে ৫ই মার্চ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংরেজিতে 'নিউ ল্যাম্পস্ ফর ওল্ড্' শিরোনামে অরবিন্দের যে ন'টি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়,—যেগুলির উল্লেখ আগেই করা হয়েছে,—তার আগে ২৬-এ জুন, ১৮৯৩ তারিখে তাঁর আর একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় যার শিরোনাম ছিল 'ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড দি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট'। 'ইন্দুপ্রকাশ'-এ তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রবন্ধ ছিল 'বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি'—বঙ্কিমের মৃত্যুর পরে ১৬ই জুলাই থেকে ২৭-এ আগস্ট ১৮৯৪-এর মধ্যে প্রকাশিত সাতটি প্রবন্ধমালা। এগুলির গুরুত্ব সকলেই জানেন। উপস্থিত আলোচনায় এগুলিরও উল্লেখ করা হয়েছে।

অরবিন্দের কনিষ্ঠ সহোদর বারীন্দ্রকুমার ঘোষ ও অন্যান্য কয়েকজন ১৯০৬-এর মার্চ মাসে কলকাতা থেকে বাংলায় 'যুগান্তর' নামে যে সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং ১৯০৮-এর মে মাসে যে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায় তার প্রথম দিকে কয়েক সংখ্যায় অরবিন্দের কয়েকটি রচনা ছাপা হয়। এই পত্রিকার মতামত নিয়ন্ত্রণে তাঁর সাধারণ ও সামগ্রিক ভূমিকা ছিল বলে জানা যায়।

'যুগান্তর' পত্রিকার সূচনার কয়েকমাস পরেই ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই আগস্ট বিপিনচন্দ্র পালের সম্পাদনায় কলকাতা থেকে দৈনিক ইংরেজি 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সংযুক্ত সম্পাদক হন অরবিন্দ এবং সেই বছরেই সেই পত্রিকার নীতি নির্ধারণে পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন তিনি। আলিপুর মামলায় অরবিন্দের কারাদণ্ড ঘটবার ছ'মাস পরে ১৯০৮-এর অক্টোবরে এই পত্রিকা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০৭-এর জুন থেকে ১৯০৮-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকার এক সাপ্তাহিক সংস্করণ চালু ছিল। এই সাপ্তাহিক সংস্করণে দৈনিক 'বন্দেমাতরম্'-এর সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও বিশেষ বিশেষ অন্যান্য রচনাও পুনর্মুদ্রিত হোতো। এই সাপ্তাহিক সংস্করণেই অরবিন্দের নাট্য রচনা Perseus the Deliverer—এবং ইংরেজি অনুবাদ Vidula প্রথম প্রকাশিত হয়।

'কর্মযোগিন্' নামে ইংরেজি সাপ্তাহিক বেরোয় কলকাতা থেকে। জাতীয় ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে সাপ্তাহিক আলোচনার এই পত্রিকা ১৯০৯-এর ১৯ই জুন প্রথম প্রকাশিত হয়—অর্থাৎ তিনি জেল থেকে ছাড়া পাবার মাস দেড়েকের মধ্যেই। এই পত্রিকার প্রায় সব রচনাই তিনি নিজে লিখতেন—সম্পাদকীয় নিবন্ধ, কবিতা, অনুবাদ ইত্যাদি বিচিত্র প্রয়াস দেখা গেছে এই পত্রিকায়। ১৯১০-এর ফেব্রুয়ারিতে তিনি যখন চন্দননগরে চলে

যান তখন এই পত্রিকা তিনি ভগিনী নিবেদিতার হাতে দিয়ে যান। ১৯১০-এর ২৬-এ মার্চ এই পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হওয়া পর্যন্ত এতে তাঁর লেখা বেরিয়েছে।

'কর্মযোগিন্' প্রকাশের প্রথম তিন মাসের মধ্যেই কলকাতা থেকে 'ধর্ম' নামে এক বাংলা সাপ্তাহিকের প্রকাশ শুরু করেন তিনি ২৩-এ আগস্ট ১৯০৯ তারিখে। এই পত্রিকাতেও প্রায় সব লেখাই তিনি নিজে লিখেছেন। ১৯১০-এর ফেব্রুয়ারিতে তিনি যখন চন্দননগরে চলে যান তখন এই পত্রিকার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটে, তবে ১৯১০-এর ২৮-এ মার্চ পর্যন্ত এই পত্রিকা বেরিয়েছিল।

অতঃপর শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরিতে অবস্থান-পর্বে 'আর্য' নামে ইংরেজি মাসিক পত্রিকা তাঁর সম্পাদনায় ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট থেকে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। ১৯২১-এর জানুয়ারি পর্যন্ত অব্যাহতভাবে এই পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার মুখ্য উদ্দেশ্য পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় মলাটের ভেতরের পৃষ্ঠায় যেভাবে ছাপা হোতো, তা থেকে জানা যায় যে, এটি ছিল বিশুদ্ধ দর্শন-সমীক্ষার পত্রিকা। প্রথমত, অস্তিত্বের চূড়ান্ত সমস্যাগুলি, দ্বিতীয়ত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য উভয় ক্ষেত্রের বিভিন্ন ধর্মসম্পর্কিত জ্ঞান সমন্বয়ের বাস্তব, যুক্তিবাদী অথচ অতীন্দ্রিয় পন্থা গ্রহণের সহায়তায় বৈজ্ঞানিক আলোচনার রীতি ও সংজ্ঞালব্ধ ধারণা—উভয়েরই স্বীকৃতি ছিল। তাঁর প্রধান গদ্যগ্রন্থগুলি প্রথমে এই পত্রিকাতেই পৃথক ও ধারাবাহিক নিবন্ধ-পর্যায়ে প্রকাশিত হয়, যেমন —'দি লাইফ ডিভাইন', 'দি সিন্থিসিস অফ যোগ', 'দি সিক্রেট অফ দি বেদ', 'এসেজ অন দি গীতা', 'দি হিউম্যান সাইক্‌ল্', 'দি আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটি', 'দি ফিউচার পোয়েট্রি' ইত্যাদি।

শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যক্ষ সম্পাদনার যোগ বল্‌লে এই পত্রিকাগুলিই বুঝতে হবে। এগুলি ছাড়া অন্যান্য পত্র-পত্রিকাতেও তাঁর প্রবন্ধ-নিবন্ধ বেরিয়েছে। যেমন কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দি মডার্ণ রিভিয়ু', 'দি ক্যালকাটা রিভিয়ু',—লাহোরের 'দি বেদিক ম্যাগাজিন'—আবার বাংলা 'সুপ্রভাত' ও 'ভারতী'তেও লিখেছেন তিনি। কিন্তু এইসব রচনার কথা স্বতন্ত্র।

চন্দননগরে প্রবর্তক সংঘ থেকে প্রকাশিত তাঁরই আদর্শে অনুপ্রেরিত একজন কর্মীর ইংরেজি সাপ্তাহিক 'দি স্ট্যাণ্ডার্ড বেয়ারার'-এর প্রথম সংখ্যা বেরোয় ১৯২০-র ১৫ই আগস্ট। তাতে 'Ourselves' নামে প্রথম সংখ্যাতেই শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রবন্ধ ছিল।

হাওড়া থেকে R. Palit (গ্রন্থকার) কর্তৃক ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'Life of Aravinda Ghosh' হোলো ইংরেজিতে ছাপা তাঁর প্রথম জীবনী। এই বইয়ে পত্রিকা সম্বন্ধে অরবিন্দের পূর্ণ অভিজ্ঞতার বিবরণ থাকবার কথা নয়। সে প্রসঙ্গ বইটির প্রকাশকাল থেকেই বোঝা যায়। ১১ই এপ্রিল থেকে ২৩-এ এপ্রিল ১৯০৭ তারিখের 'New Thought' নামে নিবন্ধ-পর্যায়ে দৈনিক 'বন্দেমাতরম্' পত্রিকায় 'দি ডকট্রিন অফ প্যাসিভ রেজিস্‌স্টান্স' সম্পর্কিত তাঁর ভাব-ভাবনা প্রকাশিত হয়। গান্ধীজী তখনো ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে উপস্থিত হননি। ৬ই আগস্ট ১৯০৬ থেকে ২৯-এ অক্টোবর, ১৯০৮ পর্যন্ত দৈনিক 'বন্দেমাতরম্'-এর প্রকাশকালের বিস্তার—এবং ২রা জুন ১৯০৮ থেকে ২৭-এ সেপ্টেম্বর ১৯০৮ পর্যন্ত বেরিয়েছে সাপ্তাহিক 'বন্দেমাতরম্'। এই পত্রিকায় তীব্র, তীক্ষ্ণ, শান্ত অথচ অকাট্য মতামত কখনোই ভোলবার নয়।

৩২

সংকটের ইঙ্গিত অতঃপর বুঝে দেখা যাক। এও তাঁর অধ্যাত্মচিন্তা, রাজনীতিচিন্তা—সকল চিন্তার সঙ্গে জড়িত। তাঁর রাজনীতি-চিন্তার কথা-সূত্রে এখানে তাঁর সংকটবোধের প্রসঙ্গ বারবার দেখা গেছে। 'সত্য'-কে বাদ দিয়ে কোনো রাজনীতিতেই তাঁর আস্থা ছিল না। এদিক থেকে বলা যেতে পারে যে, হিংসা-অহিংসা—রাজনীতির পথে যে প্রসঙ্গই দেখা দিক না কেন, সত্যের দাবি ছিল তাঁর কাছে সর্বাধিক স্বীকার্য।

সত্যের স্বরূপ কি সহজে বোঝা যায়? সে তো শান্ত রসিক ও সাধক-চরিত্রের দর্পণেই দেখা দেয়। সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান—এসব মানুষকে সেই বোধের দিকে এগিয়ে দেয়। তা না ঘটলে সংকট অনিবার্য।

অনেক ঘটনা এবং অঘটনের মধ্যে দিয়ে হাঁটতে হয় মানুষকে। খুব বেশি কোলাহল সত্যিই মনের দিক থেকে আপদ। মন শান্ত না হ'লে সত্যিকার দৃষ্টি—আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু অশান্ত মনে যা ব্যাপক জীবনবারিধির দৃশ্য প্রতিফলিত হ'তে দিতে পারে, তা কি ঘটে ওঠা সম্ভব?

মধ্যযুগের সন্তকবি দাদুর কথা মনে পড়ে, যিনি লিখেছিলেন বা বলেছিলেন যে, অনেক প্রয়াস সত্ত্বেও,—চেষ্টার প্রচণ্ড চাপেও আত্মসমর্পণ করে কতোলোকই তো ব্যর্থকাম হয়েছে এবং সেইসব মন আমাদের চারদিকেই ঘিরে আছে। অশান্ত মনকে শান্ত রাখার উপায় হল 'রাম'-নাম। তিনি খুবই রাম-ভক্ত

ছিলেন। 'রাম'-নাম উচ্চারণ ক'রেই মানুষকে তিনি আত্মনিয়ন্ত্রণার সুযোগ নিতে বলেছিলেন। অর্থাৎ বাইরের ঘটনা-সমুদ্রের ঢেউ থেকে আত্মরক্ষা করা দরকার। আত্মসমাহিত না হলে সার্থকতা কি অন্য কোথাও পাওয়া যায়? শ্রীঅরবিন্দও তার অজস্র রচনায় যোগের কথা ব্যাখ্যা করেছেন। তিনিও শান্ত হতে বলেছেন মানুষকে।

শ্রীচৈতন্যও নামগানের মহিমা দেখিয়ে গেছেন। আরো কোনো কোনো সাধকও যিনিই যাঁর ইষ্ট হন, সেই ইষ্টের মন্ত্র জপ করা সুখ-দুঃখের চিরচাঞ্চল্যের মধ্যে ধৈর্যের দিকে এগিয়ে যাবার উপায় বলে মেনেছেন। সাধকেরা অনেকেই সেইরকম মনে করেন। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'দি আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটি'-তে মানব-সংসারের বিধিব্যবস্থার নানামুখীনতা দেখিয়ে অন্তর্নিহিত ঐক্যের আদর্শ খুঁজেছেন—এবং শান্ত ভাবনা ও অটুট সংকল্প ব্যতিরেকে তা যে পাওয়া সম্ভব নয়, তাও জানিয়েছেন।

প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের যুগে আজকাল যন্ত্রের ওপর মানুষের মোহ বেড়েছে। এই বিজ্ঞান যাঁদের অধিকারে, তাঁরা অনেকে টাকাও পেয়ে থাকেন। কোপার্নিকাস যখন ছিলেন, তখনি কিন্তু ইউরোপ এক আত্মিক সংকটের সম্মুখীন হয়,—এবং তারপর গ্যালিলিও এসে সেই তত্ত্বই তো প্রমাণ করে দেখালেন যে, খ্রীষ্টীয় ধারণা অনুসারে পৃথিবীর চারিদিকে সূর্য-তারকারা আবর্তিত হচ্ছে, পৃথিবীই কেন্দ্রস্থ প্রধান,—অতীতের এই সংস্কারটি সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য,—এর বিপরীত সত্যটিই গ্যালিলিওর (১৫৬৪-১৬৪২) দূরবীনে ধরা দিয়েছিল। কেপলার (১৫৭১-১৬৩০) ছিলেন তাঁরই সমকালীন। মানুষ যে পৃথিবীতে বাস ক'রে এসেছে, সেই পৃথিবী অতিশয় তুচ্ছ। মহাশূন্যের সংখ্যাতীত ছোটো-বড়ো বিভিন্ন সৌরলোকের মধ্যে দ্বিতীয় শ্রেণীর এক নক্ষত্র—যার নাম সূর্য,— তারই অধীনে, তাকেই প্রদক্ষিণকারী এক ধূলিকণা এই পৃথিবী! অসীম মহাশূন্যে এই পৃথিবী অতি ক্ষুদ্র একটি বিন্দু,—মানুষ সেই ধূলিকণারই তুচ্ছাতিতুচ্ছ অংশ। সেকালে বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারে মানুষের অহংকারী মন খুবই আঘাত পায় বটে, কিন্তু মহাকাল সবই ভুলিয়ে দেয়। প্রাণ টিঁকে থাকে। উদ্দীপনা যুগে যুগে ফিরে আসে। সপ্তদশ শতকের পরে নতুন শতক দেখা দেয়। অষ্টাদশের পরে ঊনিশ শতকেরও উদয়াস্ত ঘটে গেছে। গ্যালিলিও এবং তাঁর সমসাময়িক বৈজ্ঞানিকদের আমলেই বিজ্ঞানের মধ্যযুগ অস্তমিত। সন্দেহই অতঃপর মানুষের বিশেষ সম্বল। "বিশ্বাসে মিলায় তারে তর্কে বহুদূর"—এই উক্তিটি কে মা-

জানেন? কিন্তু 'রাম'-নামে বিশ্বাস কি কথার কথা? জে. বি. এস্ হ্যালডেন তাঁর 'পসিব্‌ল্ ওয়ার্লড্‌স্' ( Possible Worlds )-এ এক জায়গায় লিখেছেন যে, প্রাচীন গ্রীসে এবং রোমে একদল সংশয়বাদী দার্শনিক বাস ক'রে গেছেন যাঁদের কাজই ছিল সংগতভাবে সন্দেহের দ্বারা তাড়িত হওয়া এবং সন্দেহের সংগত কারণ ব্যাখ্যা করা। খ্রীষ্টধর্ম এসে সেই সন্দেহের প্রবণতা ঝেঁটিয়ে বিদায় করেছে। অথচ, সন্দেহ-ই তো আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মদাতা। হ্যালডেনের কথায়—সূর্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে, এই সংস্কারটি ছিল সন্দেহের বিষয়,—মাধ্যাকর্ষণের ফলে হাল্কা জিনিস বেশি ওজনের জিনিসের চেয়ে জোরে মাটিতে প'ড়ে থাকে, গ্যালিলিও এই বিশ্বাস সন্দেহের সামগ্রী বলে মনে করেন। জীবদেহে রক্তস্রোত ধমনীর মধ্য দিয়ে শরীরাভ্যন্তরস্থ কলাগুলিতে অর্থাৎ 'টিস্যু'-তে সংবাহিত হয়, বিজ্ঞানী হার্ভে এই ধারণাটি সন্দেহের চোখে দেখেন। ফলে, নতুন নতুন উপলব্ধিতে পৌঁছোনো সম্ভব হয়। এই সংশয়, বিতর্ক, বিচার ইত্যাদি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব নব উদ্ভাবনায় খুবই সাহায্য করেছে। কিন্তু ধর্ম বা 'রিলিজন'-এর ব্যাপারে,—নীতির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত চূড়ান্ত জ্ঞানে পৌঁছোনো গেছে বলে যাঁরা মনে করেন, তাঁদের বেশির ভাগই হয়তো আমেরিকাবাসী ব'লে হ্যালডেন মন্তব্য ক'রে গেছেন—এবং বলেছেন,—তার কারণ, অ্যামেরিকায় মোটামুটি একই রকম নীতিবিশ্বাসের মানুষের বাস। রবীন্দ্রনাথের সেই প্রসিদ্ধ কবিতা মনে পড়ে—'সানাই'-এর 'অপঘাত'—কালিম্পঙে ১৩৪৭ সালের পয়লা জ্যৈষ্ঠ যা তিনি লিখেছিলেন। যদিও সেটা কালিম্পঙে লেখা হয়, তবু তাঁর মনে তখন ছিল নদীয়ার হাটের পথে সূর্যাস্তের আলোয় এগিয়ে যাওয়া বিচালিবোঝাই গাড়ি,—তার পিছে পিছে—'দড়ি বাঁধা বাছুর চলিছে',—রাজবংশীপাড়ার কিনারায় কোনো এক পুকুরে বনমালী পণ্ডিতের বড় ছেলেটি সারাক্ষণ ছিপ ফেলে ব'সে আছে,—কাজলা-বিলের বুনো হাঁসগুলো কোথায় যেন গুগ্‌লি-সন্ধানে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল। গাঁয়ে তখন বৃষ্টিধোওয়া বনের নিঃশ্বাস,—দুটি বন্ধু পাশাপাশি হাঁটছে। কে এক নববিবাহিত এসেছে, তাকে নিয়ে আনন্দের আলোচনা আর শেষ হয় না, এবং—

আশে-পাশে ভাঁটিফুল ফুটিয়া রয়েছে দলে দলে
বাঁকাচোরা গলির অঞ্চলে,
মৃদুগন্ধে দেয় আনি
চৈত্রের ছড়ানো নেশাখানি।

জারুলের শাখায় অদূরে
কোকিল ভাঙিছে গলা একঘেয়ে প্রলাপের সুরে।
টেলিগ্রাম এল সেইক্ষণে
ফিন্‌ল্যাণ্ড চূর্ণ হল সোভিয়েট বোমার বর্ষণে।

হ্যালডেন তার আগেই তাঁর পূর্বোক্ত আলোচনায় লেখেন যে, রাশিয়ানরা মানুষের পক্ষে ব্যক্তিগত পুঁজি বাড়ানো গর্হিত কাজ বা দুর্নীতি মনে করে বটে, কিন্তু প্রতিবেশী ফিনল্যাণ্ডে ঢুকলেই তারা দেখতো—যদি অবশ্য তাদের নিজেদের রাষ্ট্র রাশিয়ানদের সেরকম অনুমতি দিতো,—যে, বেশ শান্ত এবং সামাজিকভাবেই প্রয়োজনীয় সুজনেরা সেদেশে বিত্ত-সঞ্চয়ে দিব্যি লিপ্ত আছেন! শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'দি আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটি'র একাধিক জায়গায় ফিনল্যাণ্ড-রাশিয়া, পোল্যাণ্ড-রাশিয়া ইংল্যাণ্ড-আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন। বিভিন্ন জাতি পাশাপাশি থেকেও পৃথক পৃথক সত্তা বজায় রাখতে পারে, এই সূত্রেই এই রাষ্ট্রগুলির নাম করেন তিনি এবং লেখেন যে, ঐক্যই জীবনের বৃহত্তম নীতি হওয়া উচিত বটে, কিন্তু স্বাধীনতাই তার মূল ভিত্তি হওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের কথা প্রসঙ্গত এখানে এসে গেল।

সে যাই হোক, দাদুর কথা কি এখন এই পরিস্থিতিতে সহজে মেনে নেবেন কেউ? ঐক্য, মৈত্রী, ধার্মিকতা ইত্যাদি মধুর শব্দগুলি পুরোনো কথা,—ওরা আমাদের অন্তরের কথা। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' পড়তে ভাল লাগে, তার কারণ, সেই সনাতন জীবন-সত্যই চমৎকার ফুটেছে ঐ বইয়ে। সৈন্যবাহিনী ও মারণাস্ত্র দিয়ে মানুষকে দাবিয়ে রাখা তো নরকযন্ত্রণা। সন্দেহ, ভয়, অশান্তি—এরাই সুদীর্ঘকাল মানুষের দুনিয়ায় হাঁটাহাঁটি করছে। আমাদের মতন অনুন্নত দেশে যাঁরা স্রষ্টা, তাঁরাও সঞ্চয়ের ব্যাধিতে ভুগতে বাধ্য, কারণ, প্রতিদিনের আবশ্যিক প্রয়োজন-নিবৃত্তি এবং—শিল্প-সৃষ্টির জন্যে শান্ত মানসিকতা তো চাই। 'উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' বইয়ে দিলীপকুমার তাঁর পিতৃদেবের যে প্রিয় গানটি স্মরণ করেছেন, আজ সে-গান প্রায় দাদুর 'রাম'-নামের মহিমা প্রচারের মতোই কেমন যেন অবাস্তব মনে হয় সন্দেহবাদী বাস্তব-জ্ঞানীদের মনে। সেই গানটি মনে পড়ে—

ওরে সিন্দুক-ভরা টাকা মিছে বন্ধ করে রাখা।
যদি লাগল না কার উপকারে এলো নাক ব্যবহারে
সে টাকা তো ধনীর ঘরে শুধুই মুটের বাঁকা।

অভিজ্ঞতাই সন্দেহের জনক, অভিজ্ঞতাই বিশ্বাসেরও জনক। ঈশ্বর আছেন কি নেই,—জন্মান্তর আছে কি নেই—ভোগ জরুরি, নাকি ত্যাগই জরুরি,—সাহিত্যে এবং জীবনে মানুষ রোমান্টিক থাকলেই ভাল থাকবে, নাকি জড়বাদী হলেই সুখী হবে,—এসবই অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ উপলব্ধি। বিজ্ঞানের চেষ্টা হোলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অণু-পরমাণুও দেখা এবং সমগ্রতার সত্য সন্ধান করা। মানুষ যে জড়বস্তুর সমাহার এবং মানুষ চৈতন্যময়ও, এই উভয় সত্যই স্বীকার্য। তবু মানুষের শেষ সত্য কী?—এই প্রশ্ন থেকেই যায়।

লালন ফকিরের গানে আছে—

ডুবে দেখ্‌ দেখি মন কিরূপ লীলেময়

যারে আকাশ পাতাল খুঁজি এইদেহে সে রয়।

কবীরের দোঁহাতে পাই—

পোথী পঢ়ি পঢ়ি জগ মুয়া পণ্ডিত ভয়া ন কোই

একৈ আখর প্রেম কা পঢ়ে সো পণ্ডিত হোই।

অর্থাৎ বই পড়ে পড়ে মানুষ মরেছে, কিন্তু তাদের মধ্যে কে-ই বা যথার্থ পণ্ডিত হোলো? প্রেমের একটি মাত্র অক্ষর পড়লেই লোকে জ্ঞানী হয়। এইসব উপলব্ধির সূত্র ধরেই যুগে যুগে কোনো কোনো সাধকের মনে সত্যবোধ দেখা দিয়ে থাকে।

যেদেশে যেকালে এই বোধ বাধা পায়,—সেদেশে, সেকালেই মানুষের সংকট তীব্র হয়ে ওঠে। শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি-চিন্তার কথাসূত্রেই এসব কথা এসে যায়, কারণ, কথায়-কথায় আমাদের বিচারবুদ্ধির সীমা সম্বন্ধে প্রশ্ন ওঠা অস্বাভাবিক নয়। তাঁর রাজনীতি-চিন্তার সঙ্গে তাঁর যোগ-পথ যে কীভাবে মিশে আছে, সেই তত্ত্বটি এখানে একটু দেখে নেবার অবকাশ আছে।

৩৩

সাধারণত লোকে যাকে 'জানা' বলে, সেই ব্যাপারটি আমাদের ইন্দ্রিয়জ, স্মৃতি-সমর্থিত, বুদ্ধি-স্বীকৃত এলাকার মধ্যেই পড়ে। যা আমাদের যুক্তির বেড়াজালে ধরা দেয় না, তাকে আমরা গ্রাহ্য করি কোন্‌ যুক্তিতে? 'যুক্তি' মানে 'বিচার'। মন-ই সেই বিচারের মালিক। মনের ধর্মই হোলো নিজের স্বীকৃত এলাকাভুক্ত ব্যাপার ছাড়া অন্যান্য যা-কিছু শোনা বা ভাবা যেতে পারে সব-কিছুই হয় পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা, না হয় তাদের সন্দেহ-চিহ্নিত ক'রে রাখা। মানুষের মন বড়োই সংশয়ী। বিশ্বাস তার স্বভাব নয়।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর রচনাবলীর নানা জায়গায় সন্দেহ ( doubts ) আর বিশ্বাস ( faith )-এর প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। আধ্যাত্মিক ব্যাপারে সাধকদের ক্ষেত্রে যে-'বিশ্বাস' বা 'প্রত্যয়' প্রত্যাশিত, সেই বিশ্বাস কখনোই অন্ধ বিশ্বাস হবে না—একথা তিনি তাঁর 'Letters on Yoga'-তে লেখেন। এখানে 'অজ্ঞ' কথাটি তাঁর ব্যবহৃত 'ignorant' কথার বঙ্গানুবাদ। তিনি একথাও লেখেন যে 'বিশ্বাস' এক্ষেত্রে আলোকেই বিশ্বাস ; তা মোটেই অন্ধকারাচ্ছন্ন কিছু নয়। এই বিশ্বাস-কে তথাকথিত বুদ্ধি বা বিচারশক্তি মানতে চায় না। সাক্ষ্য-প্রমাণের ওপর নির্ভর ক'রে হাঁটা হোলো বগলে ক্রাচ্ রেখে হাঁটা ! সেটাই বুদ্ধির রীতি। কিন্তু আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বিশ্বাস অবশ্যই স্বয়ম্ভর। এ হোলো সেই স্বজ্ঞা বা 'ইনটিউশন' যা নিজের সত্যতার জন্যে যথোচিত অভিজ্ঞতার অপেক্ষায় বসে থাকে না, পক্ষান্তরে যা এগিয়ে নিয়ে যায় অবশ্যম্ভাবী অভিজ্ঞতার দিকে। শ্রীঅরবিন্দ লেখেন, আমি যদি নিজের অসুস্থতা স্বতই নিরাময় হবে বলে বিশ্বাস করি, তাহলে সেই নিরাময় ঘটবেই। কিন্তু সন্দেহ থেকে সন্দেহই বেড়ে যায়। আধ্যাত্মিক উপলব্ধির ক্ষেত্রে অতীন্দ্রিয় বোধের বিশ্বস্ততা কোনো রকমেই সংশয়াচ্ছন্ন নয়। সেই বিশ্বাস গতিধর্মী, স্বজ্ঞামূলক, ইন্দ্রিয়সংবেদন-নিরপেক্ষ। যা বাইরের লক্ষণাদি দিয়ে বোঝানো যায় না, সত্যবোধের সেই আভ্যন্তরীণ বিশেষ ইন্দ্রিয় সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব কি ? সকলে কি বিশ্বাস থেকে অভিজ্ঞতার দিকে যেতে চান ? বরং বিপরীত ব্যাপারটাই সুবোধ্য। অভিজ্ঞতা থেকেই বিশ্বাসের জন্ম হয়। প্রতিদিনই দেখি, সূর্য ভোরবেলায় পূর্ব দিকে দেখা দেয় ; তা থেকে এই বিশ্বাসে পৌঁছোনো সম্ভব হয় যে, পূর্ব গগনে সূর্যোদয় প্রতিদিনের অনিবার্য ঘটনা। তাঁর রাজনীতি-চিন্তা প্রসঙ্গেও এসব প্রাসঙ্গিক।

এই প্রবণতা মেনে নিয়েও ঈশ্বর, ভগবানের কৃপা, যোগের সত্য, গুরুর শক্তি ইত্যাদি বিষয়ে বহুজনের অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধির প্রতি শ্রদ্ধা রেখেও তো এগুনো যায়। শ্রীঅরবিন্দের কথায়—"Therefore it is an intuitive perception which has been confirmed by the experience of hundreds and thousands of those who have tested it before me." অর্থাৎ—আমার আগেই শত শত এবং সংখ্য সহস্র লোকে এসব ব্যাপার নিয়ে পরীক্ষার ফলে যাঁরা তাঁদের সুনিশ্চিত অভিজ্ঞতায় গিয়ে পৌঁছেছেন, সেই স্বজ্ঞাজাত বোধে বা বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে এটি।

এই সূত্রেই তিনি সন্দেহের প্রসঙ্গ বিশেষভাবে তুলে লেখেন, ষাট পৃষ্ঠাই হোক আর ছশ' পৃষ্ঠাই হোক, এমন কি; ছ'হাজার পৃষ্ঠা লিখলেও সন্দেহ সম্পর্কে

সন্দেহ ঘুচবে না। সন্দেহের জন্যেই 'সন্দেহ' আছে। সন্দেহ নিরসন হলেও সন্দেহ জেগে ওঠে আবার। কেন এমন হয়? সৎ সত্য-সন্ধানী হিসেবে ভরণ-পোষণ আদায়ের জন্যই মনের মধ্যে সন্দেহ টিঁকে থাকে। তিনি নিজের মন এবং অন্যান্যদের মনের ধর্ম লক্ষ্য করেই একথা লেখেন। তাই, সন্দেহের বদলে বিবেচনার ( discrimination ) ওপর নির্ভর করবার পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। কোন্‌টা সত্য কোন্‌টা অসত্য, সে-বিষয়ে বিবেচনার পথ ধরেই অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে বলেছেন তিনি। এই প্রসঙ্গ উপস্থিত আলোচনার পূর্বাংশেই দেখা গেছে। এখানে পুনরায় উল্লেখ করা হোলো।

'ডিভাইন' বা দৈবী-শক্তিকে এক সুনিশ্চিত 'সত্য' ধরে নিয়ে—অর্থাৎ যেমন আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানকে সুনিশ্চিত ধরে নিয়ে জীবনের পথে চলেছি, ঠিক সেই রকম অকাট্য মনে ক'রেই তার দিকে যেতে হবে। সেই বোধের সত্য কিন্তু জড়ের মায়া নয়, মনের খেলাও নয়—সে হোলো মৌল সত্য —'essential truth'. বাহ্য পার্থিব অভিজ্ঞতার তুলনায় সে অভিজ্ঞতা আরো বেশি সত্য। ঈশ্বরের কৃপার বাতাসে সত্তা যেন উড়ে ভেসে যায়,—আনন্দসমুদ্র উত্তাল হয়ে ওঠে। নিজের ভেতর থেকে প্রেমের জ্যোতি উঠে আসে এবং সমস্ত সৃষ্টিই যেন কুসুমিত হয়ে যায়। তখন 'একের' মধ্যেই সকল বিভিন্নতা লীন হয়। অধ্যাত্ম-সত্যের অভিজ্ঞতার কথা লিখতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ এইসব উপমা বা সাদৃশ্যের সংকেত ব্যবহার করেন। তিনি লিখেছেন—দিব্যজ্ঞানের ফলে এইভাবে সত্তার রূপান্তর ঘটে যায়। লিখেছেন অন্তর্দৃষ্টির জাগরণের কথা। তাঁর নিজের কথায়—"Then you can much less doubt it or deny it than you can deny or doubt daylight or air or the sun in heaven—for of these physical things you cannot be sure but they are what your senses represent them to be; but in the concrete experiences of the Divine, doubt is impossible." ইন্দ্রিয়জ্ঞানের মধ্যে যা পাই, তা যে অভ্রান্ত হবেই তার কোনো নিশ্চয়তা নেই,—যেমন মরীচিকা দেখে জল মনে হতে পারে তো, কিন্তু আধ্যাত্মিক উপলব্ধি সংশয়বর্জিত অভ্রান্ত জ্ঞান।

গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে ৪০ সংখ্যক শ্লোকে বলা হয়েছে—

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥

উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত স্বামী জগদীশ্বরানন্দ কর্তৃক অনূদিত

এবং স্বামী জগদানন্দ সম্পাদিত গীতার পূর্বোক্ত শ্লোকের অনুবাদে দেখা যায় —"অজ্ঞ, শাস্ত্রে শ্রদ্ধাহীন ( জ্ঞান ও কর্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে ) সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি পরমার্থের অযোগ্য হয়। সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তির ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই এবং ঐহিক সুখও নাই।" শ্রীঅরবিন্দ একাই নন, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাবার পথ দেখাতে গেছেন যাঁরা, তাঁরা প্রত্যেকেই মানুষের মনে সন্দেহ-স্বভাব মেনে নিয়েও সন্দেহমুক্ত হবার প্রস্তুতি ঘটিয়ে নেবার পরামর্শ দিয়ে গেছেন এইভাবে। পারমার্থিক সত্যজ্ঞান আমাদের তথাকথিত ইন্দ্রিয়জ্ঞানের—স্মৃতি ও সংস্কারের তুলনায় অনেক বেশি উজ্জ্বল, অনেক বেশি স্পষ্ট, এই কথাই তাঁদের প্রধান কথা। মানসিক বা প্রাণস্তরের বোধের চেয়ে সে-বোধ অনেক অনেক বেশি তীক্ষ্ণ, তীব্র, অনিবার্য। 'Letters on Yoga' থেকেই শ্রীঅরবিন্দের একটি প্রশ্ন এই সূত্রে এখানে তুলে ধরা যায়। তিনি প্রশ্ন করেন—"Is the Divine something less than mind or is it something greater ?" যদি কেউ মনে করেন যে,আমাদের উপস্থিত এই মনেরই অন্ধকারে পথ হাতড়ানো স্বভাব —তার অন্তহীন তর্ক আর তর্ক,—তার নিবৃত্তিহীন সন্দেহ, —তার কঠিন অনমনীয় যুক্তি-বিচার—এই সবই দিব্যচৈতন্যের চেয়ে শ্রেয়, তাহলে তাঁর পক্ষে দিব্যতার সাধনা নিষ্প্রয়োজন। যদি উপস্থিত এইসব মনোধর্ম দিব্যমনের ধর্মের সমান-সমান হয়, তাহলেই বা দিব্যতা খুঁজে পাবার চেষ্টা করা কেন ? কিন্তু উপস্থিত এই মন যদি মানুষকে সন্তুষ্ট করতে না পারে এবং না পেরে থাকে, তাহলে তো আত্মার তত্ত্ব জানতেই হয়। সাধারণ জীবের জান্তব মনের তুলনায় মানুষ নামক জন্তুর মন অনেক বেশি উন্নত নয়কি ? তেমনি,দিব্যচেতনা মানব-মনের চেয়ে অভাবনীয়ভাবে অনেক বেশি সম্ভাবনাময়। অতএব সন্দেহ-বাতিকটা বাতিল রেখে বিশ্বাসে নির্ভর ক'রে সমুচিত আচরণের পথ ধরে আমাদের এগিয়ে যেতেই হবে। সেই যাত্রাপথে আমাদের উপস্থিত মনোযন্ত্র যে সম্পূর্ণ অবান্তর, তিনি সেকথা বলেননি। তিনি লিখেছেন—"Mind must learn from the greater consciousness it is approaching and not impose its own standards on it." উচ্চতর সত্যের দিকে উন্মুখ থাকতে হবে উপস্থিত এই মানবচিত্তকে—তাকে সীমিত মানবমানসিকতায় অবরুদ্ধ রাখা চলবে না। যোগের পথ হোলো সংক্ষেপে,—এই বৃহতের, মহতের, ব্রহ্মের, আনন্দের, সত্যবোধের পথ। একথা যোগীমাত্রেই স্বীকার করেন। রাজযোগ জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ—সব মিলিয়ে 'পূর্ণযোগ' আমাদের আত্মানুসন্ধান। সন্দেহ সে-পথের সূচনাপর্বের ধূলিকণা মাত্র। আনন্দ-ই তার স্থায়ী

প্রেরণা। তাঁর রাজনীতিচিন্তা এই অধ্যাত্মবোধে আশ্রিত।

আমাদের চোখ যে দেশে দৃষ্টিহীন, কান যে দেশে শ্রুতিহীন, অন্যান্য ইন্দ্রিয় যে-জায়গায় স্তব্ধ বা নিষ্ক্রিয়, পরমসত্যের প্লাবন যখন নেমে আসে, তখন সেইসব দৃষ্টি-শ্রুতি-স্পর্শ-গন্ধ-রসনার আস্বাদন একেবারে অব্যাহত অর্থাৎ মুক্ত হয়ে যায়। যোগ সেই মুক্তিপথের অভিযান। এতে অবিশ্বাস নিরর্থক। কিন্তু আত্মিক (Spiritual truth) আর কৃত্রিম-আত্মিক-সত্য (Pseudo-spiritual truth)—এই দুয়ের প্রভেদ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হবে। শ্রীঅরবিন্দ যাকে বলেন 'Vital desire', যতক্ষণ না সাধক পূর্ণ আলোকে উদ্ভাসিত হচ্ছেন, ততক্ষণ সেই প্রাণস্তরের এবং মনোলোকের উদ্ভাবিত ঊর্ধ্বলোক অনুকরণের বিরুদ্ধে তাঁকে সতর্ক থাকতে হবে। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রকে তিনি বলেছেন অসুরের সৃষ্টি। তাঁর নিজের কথায়—"The power to distinguish between truths of the Divine and the lies of the Asura is a cardinal necessity for Yoga." তাহলে সংশয়বোধ তো অনিবার্য মনে হতেই পারে। কিন্তু যে বিচারবুদ্ধি বা যে সন্দেহ একই সঙ্গে সত্যকেও বাতিল করে, মিথ্যাকেও বিদায় দেয়, সে বুদ্ধি নিশ্চয় পরিহার্য। না, সে রকম নেতি-সংস্কার নয়, চাই আরো ইতিধর্মী, আরো সহায়ক, আরো আলোকিত পথ। আত্মার ভেতর থেকেই সেই আলো এসে থাকে এবং সেই আলোর পথে বিশ্বস্তভাবে এগিয়ে গিয়ে তবেই জ্ঞানের সন্ধান মেলে। তিনি বলেছেন, 'Undiscriminating faith' বা নির্বিচার বিশ্বাস নয়,—চাই বিচারলব্ধ আনুগত্য—"fundamental faith safeguarded by a patient and quieter discrimination." সেটা সাধারণ মনঃশক্তির কাজ নয়।

অর্থাৎ সন্দেহ বর্জন ক'রে বিশ্বাসে পৌঁছোতে হবে এইকথা জেনেশুনে যে, বিশ্বাসও নিরন্তর সন্দেহের সামগ্রী। উপস্থিত মনেরই উত্তরণ ঘটবে, তবে সেই উত্তরণও বিচারসাপেক্ষ। এই তর্কের গোলকধাঁধা থেকে পরিত্রাণ কোথায়? আত্মা নিজের ভেতর থেকে যে আলো দেখাবেন, সে আলো সত্য—না মায়া—না মতিভ্রম?

না, মায়াও নয়, মতিভ্রমও নয়। শ্রীঅরবিন্দ বিচার ত্যাগ করতে বলেননি। তিনি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মুক্ত মানসিকতাই রক্ষা করতে বলেছেন, তবে তথাকথিত 'যুক্তিবাদী' মনের বদ্ধমূল পূর্বার্জিত যুক্তিহীন অবিশ্বাস ত্যাগ করবার নির্দেশ দিয়েছেন। বলেছেন,—হে সাধক, ধৈর্য ধরো, সব ঝুট, সব মিথ্যে বোলো না,—তর্ক স্থগিত রাখো যতক্ষণ না প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা আঁর জ্ঞান দেখা

দেয়। তাঁর নিজের কথায়—"To deny in ignorance is no better than to affirm in ignorance." জন্মশতবার্ষিক সংস্করণের বাইশের খণ্ডে তাঁর রচনাবলীর ১৭৩ পৃষ্ঠায় এই উক্তিটি পাওয়া যায়। সন্দেহ ব্যাপারটিকেই শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'Letters on Yoga' পত্রাবলীর মধ্যে মানসিক লক্ষণ বলে মেনেছেন—এবং এটি যে বুদ্ধিবিচার যুক্তিতর্কের প্রয়োজনীয় বৃত্তি, তাও স্বীকার করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, 'যোগ' আদপেই মানসিক ক্ষেত্রের বিষয় নয়। তাঁর জন্মশতবর্ষ-গ্রন্থাবলীর বাইশ সংখ্যক খণ্ডে তাঁর এতৎ-সম্পর্কিত মন্তব্য অনেকবার পাওয়া যায়; সেই সব অংশের কিঞ্চিৎ যা ঐ খণ্ডের ১৬২ পৃষ্ঠায় দেখা যায় সেটি এই—"Yoga is not a field for intellectual argument or dissertation. It is not by the exercise of the logical or the debating mind that one can arrive at a true understanding of Yoga or follow it, A doubting spirit, "honest doubt" and the claim that the intellect shall be satisfied and be made the judge on every point is all very well in the field of mental action outside, But yoga is not a mental filed, the consciousness which has to be established is not a mental, logical or debating consciousness—it is even laid down by yoga that unless and until the mind is stilled including the intellectual or logical mind and opens itself in quietude or silence to a higher and deeper consciousness, vision and knowledge, sadhana cannot reach its goal." বঙ্গানুবাদে এর নির্যাস এই রকম দাঁড়ায়—যোগ বুদ্ধির, তর্কের, আলোচনার বিষয় নয়। নৈয়ায়িক বা তার্কিক মনের সাহায্যে যোগের যথাযথ তত্ত্ব বোধগম্য হ'তে পারে না। বাইরের জগতে কোনো বিষয়ে কোন্‌টা ঠিক কোন্‌টাই বা বেঠিক, তা নির্ণয় করবার পক্ষে "সৎ সন্দেহ" দিয়েই পদে পদে বুদ্ধিবিচারকে সন্তুষ্ট করতে হয় বটে, কিন্তু যোগের ক্ষেত্র মনের এই এলাকাতেই পড়ে না। যোগের প্রতিষ্ঠাভূমি যে চৈতন্যলোকে, সে তো মনোরাজ্য নয়,—তর্কের পথ বা সংশয়ভেদের প্রয়াস সেখানে অনাবশ্যক। বিচার, বিশ্লেষণ, বিতর্ক ইত্যাদি যাবতীয় মানসিকতা স্তব্ধ করে দিয়ে, তবেই গভীরতর চেতনা, গূঢ়তর দৃষ্টি ও জ্ঞানের কাছে মন শান্ত স্তব্ধতায় নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারে—এবং এইভাবেই সাধনা পৌঁছোতে পারে তার যথার্থ বাঞ্ছিত লক্ষ্যে।

সেই একই অংশে শ্রীঅরবিন্দ ভারতের আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যে গুরুর কাছে নিঃশর্ত প্রশ্নাতীত সমর্পণের দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। সাধনার পক্ষে গুরুর দোষদর্শন বা সমালোচনা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সন্দেহের ঢেউ একেবারে থেমে যাক্—এই সূত্রে এই হোলো তাঁর নির্দেশ। পূর্বোক্ত খণ্ডে ১৬৩ পৃষ্ঠায় তিনি জানান—"The Yoga does not proceed by *upadesa* but by inner influence. To state your condition, experiences, etc. and open to the help is far more important than question-asking." অর্থাৎ উপদেশ দিয়ে যোগ ঘটিয়ে তোলা যায় না। যেখান থেকে সাহায্য আসে,—সাধকদের নিজের অবস্থা, অভিজ্ঞতা, প্রভৃতি সেখানেই নিবেদন করা চাই। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করার চেয়ে সেই কাজটাই অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। একথা বারবার বলা হয়েছে যে, শ্রীঅরবিন্দের বিপ্লব, কবিত্ব, যোগ,—তিনটিকে একই প্রেরণা-উৎসের পরিব্যাপ্তি রূপে দেখা দরকার। এই কারণেই তাঁর রাজনীতি-চিন্তার আলোচনায় উপস্থিত আলোচনায় যোগ ও কবিত্বের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

৩৪

কবিতায়, গানে মাঝে মাঝে এক ধরনের বিশ্বাস বেজে ওঠে যাতে এই উপলব্ধির ইশারা পাওয়া যায়,—যেমন, গীতবিতানের 'পূজা'-অংশের এই গানটিতে—

> আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,
> বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া॥
> এই-যে বিপুল ঢেউ লেগেছে তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
> সকল পরান দিক-না নাড়া॥

এই 'আপন' শব্দটির ওপরেই জোর দিয়ে বেঁচে আছি আমরা। কিন্তু সে কি যথার্থ বেঁচে থাকা না অবরুদ্ধ থাকা? আমাদের পৃথক পৃথক 'আমিত্ব' যে মুক্তির আনন্দলোক থেকে আমাদের দূরে রেখেছে, সে-বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায়? এই সংকীর্ণ এক-একটি বেড়াকেই মানুষের চূড়ান্ত সার্থকতা ধ'রে নিলে অবশ্য সন্দেহধর্মী, বিচারপরায়ণ সত্তার হাত থেকে রেহাই মেলে না। কবিরা রূপকে কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ এই গানের পরের অংশে তেমনি রূপক ব্যবহার করে জানান—

> বোস্ না ভ্রমর, এই নীলিমায় আসন লয়ে
> অরুণ-আলোর-স্বর্ণরেণু-মাখা হয়ে।

যেখানেতে অগাধ ছুটি মেল্ সেথা তোর ডানাদুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া ॥

'ভ্রমর' আমাদের বুদ্ধিবিচার। 'ভ্রমর' আমাদের জৈব সত্তা। 'ভ্রমর' আমাদের প্রাণস্তরের চেতনা। তাকে অনন্ত নীলিমায় সূর্যালোকে আসন নিতে বলেছেন কবি।

যোগের পথও সেই রকম অভ্যস্ত 'আমিত্ব' থেকে বেরিয়ে যাবার আহ্বান। শ্রীঅরবিন্দের পূর্বোক্ত গ্রন্থের ১১১ পৃষ্ঠায় দেখা যায়—"Mind must learn from the greater consciousness it is approaching and not impose its own standards on it." অর্থাৎ মন-কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেননি শ্রীঅরবিন্দ,—তিনি জানিয়েছেন যে মন ঊর্ধ্বতর চৈতন্যের কাছে নিজের পাঠ নেবে,—ক্ষুদ্র মনের নিজের নিরিখ দিয়ে ঊর্ধ্ব চৈতন্যকে বিচার করতে গেলেই ঘটবে মূঢ়তা।

আমাদের ভেতরের সত্তায় দৈবী সত্য বা দিব্যতা সম্বন্ধে অহৈতুকী জিজ্ঞাসা আছেই। শ্রীঅরবিন্দের নিজের কথায়—"The soul within has always the inherent ( ahaituki ) yearning for the Divine ; the *hetu* or special motive is simply an impulsion used by it to get the mind and the vital to follow the inner urge." [ ঐ, পৃষ্ঠা ১১৩ ]

এই কথাপ্রসঙ্গেই শ্রীঅরবিন্দ আনন্দের প্রসঙ্গ তুলে জানান—নিরানন্দ ঈশ্বরে আমার অণুমাত্র আস্থা নেই। নিরানন্দ ঈশ্বর এক অসম্ভব সম্ভাবনা।—"The Radha love is not based upon any such thing, but means simply that whatever comes on the way to the Divine, pain or joy, ***milana*** or ***viraha***, and however long the sufferings may last, the Radha love is unshaken and keeps its faith and certitude pointing fixedly like a star to the supreme object of Love." রাধার সত্যতায় সুনিশ্চিত প্রত্যয় যাঁর নেই, তিনি আনন্দের কি-ই বা বোঝেন? শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি-ভাবনার সঙ্গে তাঁর এই সব উপলব্ধি অবশ্যই সম্পৃক্ত।

'দি আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটি'-র চতুর্থ অধ্যায়ে শ্রীঅরবিন্দ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় ব্যক্তির সম্পর্ক বিষয়ে এই কথাই বিশেষভাবে জানান যে, সর্বাধিকসংখ্যক জনগণের কল্যাণের জন্যেই ব্যক্তিকে রাষ্ট্রের অধীনস্থ থাকতে হয় বটে, তবে সে হোলো রাষ্ট্রগত, সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনগত বশ্যতা,—ব্যক্তিসত্তার বশ্যতা সমাজের কাছে,—একের অধীনস্থ সমগ্রের কল্যাণে।

কিন্তু দেশে শাসক-সম্প্রদায়-বিশেষের প্রতিনিধিত্ব করেন যাঁরা, তাঁরা কি আধুনিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সত্যিকার মহৎ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ? এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান যে, শাসক-গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থেকে অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক যারা অধিকসংখ্যকের ওপর সামগ্রিক উচ্চাশা ও লক্ষ্যবোধ চাপিয়ে দেয়, তারা যে সত্যিই মহৎ উদার চরিত্রবলশালী হবেই, তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। আধুনিক রাষ্ট্রগঠনে যারা জনগণের মধ্য থেকেই এই গৌরবে অভ্যুত্থিত হয়, তারা প্রধানত পরিস্থিতির পুতুল! দুনিয়ার কোনো অংশেই আধুনিক রাজনীতি এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আধুনিক যুগে রাষ্ট্রপ্রতিনিধিত্ব করেন যাঁরা, তাঁরা সাধারণ ক্ষুদ্রতা, স্বার্থপরতা, অহমিকা, আত্মবঞ্চনারই প্রতিনিধি। তাঁদের ভীরুতা, মানসিক অযোগ্যতা, নৈতিক গতানুগতিকতা ইত্যাদির মধ্যে জনসাধারণের দোষই বর্তেছে বলে বোঝা যায়। তাঁদের ভণ্ডামি মানতেই হয়। শ্রীঅরবিন্দ এরকম জনকল্যাণে স্বভাবতই আস্থাহীন। তিনি সোজাসুজি জানিয়েছেন যে, এভাবে সামগ্রিক জনহিত ঘটতেই পারে না,—যা ঘটে, সে হোলো প্রগতির অনুকূল কিঞ্চিৎ মাত্র মঙ্গলের সঙ্গে সুসংগঠিত বিভ্রম ও অমঙ্গল,—তবে প্রকৃতি বা 'নেচার' তো এই হোঁচট-খাওয়া মনুষ্যসংঘের মধ্য দিয়েই তাঁর নিজের লক্ষ্যাভিমুখে মানুষকে চালনা করেন! মানুষের অযোগ্যতা ও ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও প্রকৃতি তাঁর অভিপ্রেত পথে নিয়ে যাচ্ছেন সকলকেই। তিনি একথাও বলেছেন যে, বিপরীত পক্ষে 'স্টেট' বা রাষ্ট্রযন্ত্র যদি সমাজের উচ্চতর মানসিক ও নৈতিক শক্তির অধিকারী হয়ে উচ্চ আদর্শ ও শৃঙ্খলাবোধে শাসকদলকে চালাবার চেষ্টাও করতো, তাহলেও 'স্টেট' নিজের যে উচ্চ ভূমিকা দাবি করে, তা কখনোই ঘটতো না—"Still the State would not be what the State idea pretends that it is." সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে যে উন্নত বুদ্ধি ও শক্তি পাওয়া সম্ভব, রাষ্ট্রযন্ত্রের পেষণেই তা পিষ্ট হয়ে যায় এবং ব্যাপক নির্বুদ্ধিতা ও স্বার্থপরতাগত দুর্বলতা সেই উন্নত বুদ্ধি ও শক্তিকে গ্রাস করে। বলা বাহুল্য, এটাই তবু মন্দের ভাল। কিন্তু সেই সঙ্গে যদি অপেক্ষাকৃত অল্প-নিলিপ্ত কোনো কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত প্রয়াসে—স্টেটের পক্ষে যা মোটেই সাধ্য নয়, সে রকম শুভ সাধনার পথ বন্ধ না করা হয়, তাহলে সেটা আরো ভাল। অর্থাৎ শ্রীঅরবিন্দ ব্যক্তিগত সেবা ও সাধনার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর নিজের কথায়—"But things would be much worse if there were not a field left for a less trammelled individual effort doing what the State cannot do, deploying and using the

sincerity, energy, idealism of the best individuals to attempt that which the State has not the wisdom or courage to attempt, getting that done which a collective conservatism and imbecility would either leave undone or actively suppress and oppose. It is this energy of the individual which is the really effective agent of collective progress."

স্টেট কখনো কখনো এই ব্যক্তিগত প্রয়াসের সহায়তা ক'রে থাকে, একথাও তিনি মেনেছেন, তবে এও জানিয়েছেন যে, ব্যক্তি-প্রয়াস সম্পূর্ণ মুছে দিয়ে সংঘের বা সংগঠনের সামগ্রিক শাসন চালানোই হোলো স্টেটের আসল লক্ষ্য। এটি তাঁর অভিপ্রেতও ছিল না, অনুমোদনও লাভ করেনি। তাঁর মতে— ব্যক্তির আত্মা আছে, স্টেটের তা নেই! ব্যক্তির নীতিবোধ আছে কোনো-না কোনোরকম, স্টেটের তাও নেই।

অন্তরের এই বিশেষ উপলব্ধিই তাঁকে দিয়ে এই কথাগুলি লিখিয়েছে— "The business of the State, so long as it continues to be a necessary element in human life and growth, is to provide all possible facilities for co-operative action, to remove obstacles, to prevent all really harmful waste and friction,—a certain amount of waste and friction is necessary and useful to all natural action,—and, removing avoidable injustice, to secure for every individual a just and equal chance of self-development and satisfaction to the extent of his powers and in the line of his nature. So far the aim in modern socialism is right and good. But all unnecessary interference with the freedom of man's growth is or can be harmful. Even co-operative action is injurious if, instead of seeking the good of all compatibly with the necessities of individual growth,—and without individual growth there can be no real and permanent good of all,—it immolates the individual to a communal egoism and prevents so much free room and initiative as is necessary for the flowering of a more perfectly developed humanity."

মানুষের সার্বিক ঐক্য চাই—একথা তিনি কিন্তু বারবার জানিয়েছেন। 'দি আইডিয়াল অফ হিউম্যান ইউনিটি'র পঞ্চম অধ্যায়ে জাতি ও সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন তিনি। প্রথম অধ্যায়ে ঐক্যের প্রতি অভিমুখীনতা—তার প্রয়োজন ও বিপদের প্রসঙ্গও লিখেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ে সাম্রাজ্য গঠনের প্রাচীন ও আধুনিক রীতির আলোচনা আছে। সপ্তম অধ্যায়ে বহুমিশ্র জাতি সৃষ্টির [ The creation of the Heterogeneous Nation ] প্রসঙ্গ আছে। অষ্টম অধ্যায়ে সম্মিলিত মিশ্র সাম্রাজ্যের [ The Problem of a Federated Heterogeneous Empire ] সমস্যার আলোচনা আছে এবং এই পর্যায়ে নিপুণ আলোচনার শেষে পঁয়ত্রিশের অধ্যায়ে তিনি পূর্ব আলোচনার সারসংক্ষেপ ও উপসংহার পরিবেশন করেছেন। সেই শেষ অধ্যায়ের পরেও 'পুনশ্চ' আছে। তবে শেষ অধ্যায়ে প্রথম অনুচ্ছেদেই তিনি লেখেন যে, মানবজাতির ধর্মবোধ ও আত্মিক ঐক্য ব্যতিরেকে অন্য কেনোভাবেই যথার্থ ঐক্যসাধন সম্ভব নয়। বাইরের আইন-কানুন বেঁধে বাইরের জনসমাহারকে কতকটা সময়ের ধারায় একসঙ্গে বেঁধে তোলা অসম্ভব নয়, কারণ, প্রকৃতি বা নেচার-ই তা করিয়ে নেন ; কিন্তু যান্ত্রিক ও বহিরারোপিত ব্যবহারিক সমস্বার্থের মিল তবুও গৌণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতি ক্রমেই পরস্পরের কাছে আসছে, তাও স্বীকার্য। তবে আত্মিক ঐক্যই আসল লক্ষ্য আমাদের।

৩৫

এই সব চিন্তার ধারাতেই মানুষকে বুঝতে হয় যে, কিছু কিছু স্বল্পায়ু সুখ থাকলেও দুঃখ নিয়েই নিত্যবাস আমাদের। সুখ, দুঃখ, অসুখ, শান্তি, অশান্তি, বেদনা, যন্ত্রণা ইত্যাদি শব্দ প্রায় প্রত্যেক লেখককেই ব্যবহার করতে হয়। শ্রীঅরবিন্দ বিশেষভাবে সামঞ্জস্যের আদর্শ দেখিয়েছেন। 'সামঞ্জস্য' শব্দটি আমাদের নাড়া দিয়ে যায়, যেমন 'সৌন্দর্য' শব্দটি আমরা প্রায়ই শুনে থাকি এবং ব'লে থাকি। বড়ো বড়ো নামী কবিরা তো বটেই, অনেক গৌণ কবিও প্রার্থিত আশ্রয়ের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে 'তুমি'-'আমি' দুই পক্ষের কথা লেখেন। এই রকম এক মহিলা-কবির নাম স্নেহলতা দেবী, যাঁর 'মনের কোণে' নামে কবিতার বইটি ১৩৬২ সালে ছাপা হয়। স্নেহলতা দেবীর গৃহস্বামীর দায়-দায়িত্ব ছিল। তাঁর সঙ্গে বর্তমান লেখকের আলাপ হয়েছিল শান্তিনিকেতনে। ২৯-এ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৪ তারিখে তিনি তাঁর সেই কবিতার বইয়ের এক কপি এই লেখককে উপহার দেন। তখন তিনি প্রবীণা। তার তিরিশ বছর আগে

'প্রবাসী' পত্রিকায় প্রকাশের জন্যে একটি কবিতা পাঠান তিনি। সেটি ঐ পত্রিকায় ছাপা হয়নি। দুঃখ হয়েছিল তাঁর। 'সান্ত্বনা' নামে কবিতায় সেই দুঃখের কথা আছে। ব্যক্তিমনের এরকম দুঃখকে হয়তো অচরিতার্থতার দুঃখ বলা যায়। কোনো আশা না মিটলে মনের যে যন্ত্রণা হয়, সেই যন্ত্রণার সঙ্গে অভিমান মিশে থাকতে পারে। কিন্তু জীবনে আরো গভীর দুঃখও পেতে হয় মানুষকে। কোনো প্রিয়জনের সঙ্গে মতান্তর বা প্রিয়বিয়োগ ঘটতে পারে। দেশের আইনশৃঙ্খলা, সমাজের ও ব্যক্তিমনের মূল্যবোধ ইত্যাদি ভেঙে পড়লে দুঃখের কারণ দেখা দেয়। জন্ম-মৃত্যু, প্রেম-বিয়োগ, সুখ-দুঃখ নিরন্তর ঘটছেই। কিন্তু সেসব সত্ত্বেও মানুষ ক্ষণস্থায়ী এইসব ঘটনাকে গৌণ ভেবে চিরস্থায়ী কোনো অন্যরকম শান্তি খুঁজছেই। স্নেহলতা দেবীর 'তুমি কই' নামে কবিতাটি এই সূত্রেই মনে দেখা দিতে পারে। তার প্রথম কয়েক ছত্রেই তিনি লেখেন—

অনেক দিয়েছো নাথ আমার ভাণ্ডার ভরি,
থরে থরে যেখানে যা চাই,
তুমি ত দাওনি ধরা রহিয়াছ দূরে সরি,
নিঃস্ব, শূন্য, রিক্ত আমি তাই!

এরকম বেদনাবোধ ও প্রার্থনা পৃথিবীর অনেক ভাষার অনেক সাহিত্যেই ধ্বনিত হয়েছে। কিন্তু এই 'তুমি' সত্যিই সর্বদুঃখহারী কোনো 'সত্য' নাকি ব্যক্তিবিশেষের কল্পনামাত্র, সে-বিষয়ে বাইরে থেকে জোর দিয়ে কিছু কি বলা যায়? মানুষের মন নিজেই কতো কী যে বানাতে পারে! যেমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, তেমনি জাতির ক্ষেত্রেও এরকম অভিজ্ঞতা ঘটা স্বাভাবিক।

এই সৃষ্টি—যাতে আমরা সকলেই আশ্রিত, এ এক অকাট্য আইনে বাঁধা। বিজ্ঞান আইনগুলি দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। যেমন দেহের স্বাস্থ্য বজায় রাখবার রীতিনীতি আছে, তেমনি মনেরও অতৃপ্তি শোধনের পথ আছে। অনেক সময়ে ভাবের ঊর্ধ্বায়ন বা 'সাবলিমেশন'-এর কথা বলা হয়। সেই ঊর্ধ্বায়ন স্থূল অভাববোধকে সূক্ষ্ম অভাবরসে পরিণত করে। সেটা চেষ্টাকৃত ব্যাপার নয় ঠিক। অনেক ক্ষেত্রেই ভোক্তার অগোচরে তা ঘটে যায়। যাঁর ঘটে, তিনি বিশ্বাস করেন যে, কোনো এক পরমা শক্তির কৃপা পেয়েছেন তিনি। যাঁর ঘটে না, তাঁকে কৃপা-র বিস্ময় বোঝানো অসম্ভব।

ভয় এক আদিম রিপু। কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ মদ, মাৎসর্য—এই ষড় রিপুর মধ্যে 'ভয়'-এর উল্লেখ নেই। তেমনি 'ভালবাসার'ও উল্লেখ নেই। কামনাতে বাধা পড়লেই ক্রোধ দেখা দেয়। কামনার সঙ্গে লোভ, মোহ, মদ

এবং মাৎসর্যও ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কিন্তু পাছে কাম্যবস্তু হারিয়ে যায়, এই ভয় তো মনে মনে জেগেই থাকে। পাছে আমাদের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়, এই ভয়ও অমূলক নয়। অতএব ভয়-কে একটি পৃথক রিপু বলতে ইচ্ছা করে। মাৎসর্যও ভয়ের, কামের, লোভের, মোহের স্বাভাবিক সন্তান নয় কি ? কিন্তু ভালবাসাও তো কামনারই রকমফের এবং 'ভালবাসা' বল্‌তে লোকে সাধারণত যা বোঝে সে তো কোনো-না-কোনো আসক্তি। সেও আকর্ষণ।

আমাদের 'সত্য'-সন্ধানের সঙ্গে যে ভালবাসার সম্পর্ক, সে ভালবাসা আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা নয়, অপরপক্ষে সে হোলো কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা— বৈষ্ণবরা এই কথা বলে থাকেন। রাধা-কৃষ্ণের কথায় কথায় মঞ্জরী-ভাবের কথা ওঠে। বোধবুদ্ধির গুণে এসব কিছু কিছু বোঝা যায় বটে। কিন্তু পরমাশক্তির কৃপা কোন্ গুণে যে কেউ কেউ হঠাৎ পেয়ে যায়, তার ব্যাখ্যা জানা নেই। অতএব সংশয়ী মনকে বিশ্বাসের দিকে চালাতে হয়। কিন্তু সে কি সহজ কাজ ? সন্দেহ-ই বুদ্ধির অবলম্বনভূমি। গীতায় তত্রাচ বলা হয়েছে—'সংশয়াত্মা বিনশ্যতি'। শ্রীঅরবিন্দও সেই প্রত্যয়ের দিকে আমাদের এগিয়ে যাবার প্রয়োজনীয়তা দেখিয়েছেন। তিনি এ-বিষয়ে বারবার লিখেছেন।

বিবর্তনের প্রসঙ্গ অস্বীকার করতে হবে কেন ? এই সৃষ্টি আজ যেভাবে আমাদের চেতনায় ধরা দিচ্ছে, বহুকাল আগে এই সৃষ্টিও এই রূপে ছিল না, আমাদের চেতনাও তার বর্তমান সামর্থ্যে ছিল না। হাঁ, বিবর্তন তো ঘটছেই। রূপান্তর বা 'ট্রান্সফর্মেশন' তো অবশ্যই সম্ভব। শ্রীঅরবিন্দ সেই রূপান্তরের কথাও বলেছেন। পরমা শক্তি দেহী মানুষের মধ্যে অবতীর্ণ হতে পারেন, এরকম বিশ্বাস থেকেই অবতারবাদ চলে আসছে। রবীন্দ্রনাথ 'মহামানব' শব্দটি ব্যবহার করেছেন—'ঐ মহামানব আসে'। 'অবতার' এর চেয়ে 'মহামানব' অনেক বুদ্ধিগ্রাহ্য বলে মনে হয়। যুক্তি-বুদ্ধি পরিহার ক'রে কি মহামানবরাও বাঁচতে পারেন ? গান্ধীজীকে কি একসময়ে বলতে হয়নি যে তিনি হিমালয়-প্রমাণ প্রমাদ করে ফেলেছিলেন ? গান্ধীজীর গুরু ছিলেন তিনি নিজেই। তাই তিনি প্রত্যাদেশের কথা বলতেন। তাঁর সব প্রত্যাদেশ অভ্রান্ত ছিল কি না, সে-বিষয়ে চমৎকার গবেষণা চলতে পারে।

গৌতম বুদ্ধের 'সর্বম অনিত্যম' বোধ বেশ সুবোধ্য। নির্বাণতত্ত্বও নাস্তি-বোধ নয়। যেভাবে আমরা আছি ব'লে ভাবছি, সেভাবে জগৎও নেই আমরাও নেই। আমরা শূন্যতায় নিত্যতায় চলেছি। উপনিষদের 'আনন্দ' আর বৌদ্ধ ভাবনার 'শূন্য' একই অনুভূতির দুটি পৃথক শব্দবৎ মনে হয়। একে অলৌকিক

বলতে হবে কেন? বিশ্বাস বিচারবুদ্ধি দিয়েই এই আনন্দে পৌঁছোনা যায়, তবে শ্রদ্ধাবুদ্ধি চাই এবং দুঃখ বরণের শক্তি চাই—যার অন্য নাম হোলো তপস্যা।

৩৬

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতিচিন্তার কথাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'সভ্যতার সংকট' সম্বন্ধে এর আগেই কিছু আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টি আরো একটু দেখা যাক।

প্রাচীন ভারতে, মধ্যযুগেও আমরা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার চেয়ে সমাজ-শক্তিকেই প্রাধান্য দিয়েছি—এই তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে দেখিয়ে গেছেন। তিনি জানিয়েছেন যে, অন্তরের বিকাশ, আত্মকর্তৃত্বের সাধনাই মানুষের যথার্থ লক্ষ্য হওয়া চাই। লোভ প্রভৃতি রিপুর আক্রমণের ক্ষেত্রে এই আদর্শটি বারবার স্মরণীয়। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে তিনি এই দিকটির ওপর বিশেষ জোর দেন। তিনি 'ভয়'-কেই মনের নাস্তিকতা এবং 'ধর্ম'-কেই আস্তিকতা বলেন। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সমালোচনায় তিনি ছিলেন অকুণ্ঠ। সমগ্র দেশ যে সমগ্র দেশবাসীর সৃষ্টি, এই সত্যটি অনুধাবন করতে হবে। 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধেই তিনি জানান—"দেশ আমারই আত্মা, এই জন্যই দেশ আমার প্রিয়—এ কথা যখন জানি তখন দেশের সৃষ্টিকার্যে পরের মুখাপেক্ষা করা সহ্যই হয় না।" ১৯০৫-এর আন্দোলনপর্বেই তিনি জানান—"আত্মশক্তির দ্বারা ভিতরের দিক্ থেকে দেশকে সৃষ্টি করো, কারণ সৃষ্টির দ্বারাই উপলব্ধি সত্য হয়।" 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলির অনেক আগেই 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধে তিনি দেশকে কীভাবে 'আমার নিজের', এই বোধে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে, তা আলোচনা করেন। তাঁর 'আত্মশক্তি ও সমূহ' বইয়ের 'স্বদেশী সমাজ' ( ভাদ্র, ১৩১১ ) এবং 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ( আশ্বিন, ১৩১১ ) প্রবন্ধ দুটিতে তো বটেই, তাছাড়া 'রাজাপ্রজা', 'ভারতবর্ষ ও স্বদেশ' প্রভৃতি বইয়েও এই চিন্তা বারবার ব্যক্ত করা হয়। বিলেতের 'স্টেট' আর আমাদের 'সমাজ'—এই দুটির কর্তব্যভেদ ও প্রকৃতিভেদ সম্বন্ধে সেই ১৯০৫-এর পর্বেই 'স্বদেশী সমাজ'-এ তিনি বিশদ আলোচনা করেন। তাঁর আলোচনায় দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে—এখন যাকে স্টেট বা রাষ্ট্র বা সরকার বলা হয়, তা ছিল রাজশক্তির আকারে, কিন্তু বিলেতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ এইখানে যে, বিলেতে দেশের সমস্ত কল্যাণকর্মের ভার সমর্পিত হয়েছিল স্টেটের ওপরেই, আমাদের ভারতবর্ষে তা ঘটেছিল আংশিকভাবে—অর্থাৎ প্রত্যেক গৃহীর সমাজধর্মের

মধ্যেই তা বহুপরিমাণে অন্তর্ভুক্ত ছিল। যাঁরা গুরুস্থানীয় ব্যক্তি, তাঁরা দেশকে বিনা বেতনে বিদ্যাশিক্ষা, ধর্মশিক্ষা দিয়েছেন, —জনসাধারণের স্বার্থসংযম, আত্মত্যাগচর্চা ইত্যাদি ছিল ধর্মাচরণের মধ্যে গণ্য। এইসব লক্ষণ দেখিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানান—"ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতায় প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেখানেই পুঞ্জিত হয়, সেইখানেই দেশের মর্মস্থান। সেইখানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিক রূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যস্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এই জন্যই য়ুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পঙ্গু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা হয়।"

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে যখন 'কালান্তর' বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন ১৯১৫ থেকে ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত এই পনেরোটি প্রবন্ধ তাতে সংকলিত হয়—'বিবেচনা ও অবিবেচনা' ( বৈশাখ, ১৩২১ ), 'লোকহিত' ( ভাদ্র, ১৩২১ ), 'লড়াইয়ের মূল' ( পৌষ, ১৩২১ ), 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' ( ভাদ্র, ১৩২৪ ), 'ছোটো ও বড়ো' ( অগ্রহায়ণ, ১৩২৪ ), 'বাতায়নিকের পত্র' (আষাঢ়, ১৩২৬), 'শক্তিপূজা' (কার্তিক, ১৩২৬), 'সত্যের আহ্বান' (কার্তিক, ১৩২৮), 'হিন্দু মুসলমান' (শ্রাবণ,১৩২৯), 'সমস্যা' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), 'সমাধান' (অগ্রহায়ণ, ১৩৩০), 'শূদ্রধর্ম' ( অগ্রহায়ণ, ১৩৩২ ), 'বৃহত্তর ভারত' (শ্রাবণ, ১৩৩৪), 'কালান্তর' ( শ্রাবণ, ১৩৪০ ) এবং 'নারী' ( অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩ )।

১৯৪১-এ তাঁর মহাপ্রয়াণের প্রায় আট বছর পরে বাংলা ১৩৫৫ সালের পৌষে 'কালান্তর'-এর যে পরিবর্ধিত সংস্করণ বেরোয়, তাতে পূর্বোক্ত প্রবন্ধগুলির সঙ্গে যুক্ত হয় 'স্বাধিকার প্রমত্ত' (মাঘ, ১৩২৪), 'শিক্ষার মিলন' (ভাদ্র, ১৩২৮), 'চরকা' ( ভাদ্র, ১৩৩২ ), 'স্বরাজসাধন' ( আশ্বিন, ১৩৩২ ), 'রায়তের কথা' ( আষাঢ়, ১৩৩৩ ), 'স্বামী শ্রদ্ধানন্দ' ( মাঘ, ১৩৩৩ ),—'হিন্দু মুসলমান' নামে দ্বিতীয় রচনা (শ্রাবণ, ১৩৩৮), 'রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রনৈতিক মত' নামে সেই প্রবন্ধটি যাতে শচীন্দ্রনাথ সেনের ইংরেজি বই 'পলিটিকাল ফিলসফি অফ রবীন্দ্রনাথ' সম্বন্ধে তাঁর নিজের মতামত পাওয়া যায় এবং যেটির প্রকাশকাল ছিল অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬,—তারপর শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে লেখা চিঠি—যার নাম 'কন্‌গ্রেস' (আষাঢ়,১৩৪৬),—'আরোগ্য' ( মাঘ,১৩৪৭ ),—এবং 'সভ্যতার সংকট' ( জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮)। অর্থাৎ আরো এই এগারোটি প্রবন্ধ যুক্ত হয়ে ১৩৫৫ সালের পরিবর্ধিত 'কালান্তর' বইটির মোট প্রবন্ধ সংখ্যা হয় ছাব্বিশ।

'কালান্তর' প্রবন্ধটির মধ্যেই তিনি আমাদের দেশের মধ্যযুগের সংকীর্ণতার

উল্লেখ করে লেখেন—"বাইরে থেকে প্রথম বিরুদ্ধ আঘাত লাগল মুসলমানের। কিন্তু সে মুসলমানও প্রাচীন প্রাচ্য, সেও আধুনিক নয়। সেও আপন অতীত শতাব্দীর মধ্যে বদ্ধ। বাহুবলে সে রাজ্য সংঘঠন করেছে, কিন্তু তার চিত্তের সৃষ্টিবৈচিত্র্য ছিল না। এই জন্যে সে যখন আমাদের দিগন্তের মধ্যে স্থায়ী বাসস্থান বাঁধলে, তখন তার সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ ঘটতে লাগল—কিন্তু সে সংঘর্ষ বাহ্য, এক চিরপ্রথার সঙ্গে আর-এক চিরপ্রথার, এক বাঁধা মতের সঙ্গে আর এক বাঁধা মতের।" বিশদভাবে এই দিকটি বোঝাতে গিয়ে তিনি জানান যে, মুসলমান আমলে আমাদের দেশে—"দুই সনাতন বেড়া-দেওয়া সভ্যতা" —"পাশাপাশি এসে দাঁড়িয়েছে পরস্পরের প্রতি মুখ ফিরিয়ে।" ফলে, সেকালে—"পল্লীর চণ্ডীমণ্ডপেই রয়ে গেল আমাদের প্রধান আসর।" এবং—"তার পরে এল ইংরেজ, কেবল মানুষরূপে নয়, নব্য য়ুরোপের চিত্তপ্রতীকরূপে।" তাঁর কথায়—"য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল।" য়ুরোপীয় মনের "সত্যসন্ধানের সত্যতা"-র প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত হন তিনি। অনেক উপমা, বিচিত্র উদাহরণ ইত্যাদি দেখিয়ে, এদেশে ইংরেজ শাসনের প্রথম লক্ষণীয় গুণের দিকটি সত্তরোত্তর রবীন্দ্রনাথ এইভাবে প্রকাশ করেন যে, সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আমলেই ইংলণ্ডের প্রতাপ ও ঐশ্বর্য ছিল উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত। ব্যাপক অর্থেই মানবিক কল্যাণের দিকে লক্ষ্য ছিল তাঁর।—"রিফর্মেশন যুগে, ফ্রেঞ্চ রেভোলিউশন যুগে য়ুরোপ যে মতস্বাতন্ত্র্যের জন্যে, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের জন্যে লড়েছিল, সেদিন তার সেই আদর্শে বিশ্বাস ক্ষুণ্ণ হয়নি। সেদিন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ বেধেছিল দাসপ্রথার বিরুদ্ধে। ম্যাটসিনি গ্যারিবল্ডির বাণীতে কীর্তিতে সেই যুগ ছিল গৌরবান্বিত, সেদিন তুর্কির সুলতানের অত্যাচারকে নিন্দিত করে মন্দ্রিত হয়েছিল গ্ল্যাড্‌স্টোনের বজ্রস্বর। আমরা সেদিন ভারতের স্বাধীনতার প্রত্যাশা মনে স্পষ্টভাবে লালন করতে আরম্ভ করেছি। এই প্রত্যাশার মধ্যে একদিকে যেমন ছিল ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধতা, আর-এক দিকে ইংরেজ চরিত্রের প্রতি অসাধারণ আস্থা।" শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার সঙ্গে এই চিন্তা মিলিয়ে দেখা দরকার।

এই বিশেষ মানবমূল্য সম্পর্কিত চেতনা—মনুষ্যত্বের এই স্বীকৃতির লক্ষণ দেখে,—ইংরেজ, ইংরেজি—তথা পাশ্চাত্য সভ্যতা সম্বন্ধে,—য়ুরোপের মোহহীন বিজ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠা সম্বন্ধে—প্রত্যেকের সমানাধিকারের আদর্শে অনুপ্রাণিত আমাদের মন যেন মধ্যযুগের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে হঠাৎ আধুনিকতার উজ্জ্বল

যুগান্তরে প্রবেশ করে। রবীন্দ্রনাথের নিজের কথায়—"তাই ভেবে দেখলে দেখা যাবে, এই যুগ য়ুরোপের সঙ্গে আমাদের গভীর সহযোগিতারই যুগ। বস্তুত, যেখানে তার সঙ্গে আমাদের চিত্তের, আমাদের শিক্ষায় অসহযোগ, সেইখানেই আমাদের পরাভব।"

ইংরেজ-শাসনের পর্বে ইতিমধ্যে ইতিহাস আরো এগিয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ দেখেছেন সভ্য য়ুরোপের 'সর্দার-পোড়ো' জাপানের জাগরণ ঘটেছে। বিশ্বজাতি-সংঘের মধ্যে জাপানের জায়গা মেনে নিতে হয়েছে য়ুরোপকে। প্রাচ্য জাতিরই অন্যতম প্রতিনিধি সেই জাপান। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথের নিজের কথা—"অনেক দিন আশা করেছিলুম, বিশ্ব-ইতিহাসের সঙ্গে আমাদেরও সামঞ্জস্য হবে,"—আমরাও আমাদের দেশের সার্বিক কল্যাণের গতি দেখতে পাবো, কিন্তু—"অনেকদিন তাকিয়ে থেকে অবশেষে দেখলুম চাকা বন্ধ। আজ ইংরেজ-শাসনের প্রধান গর্ব ল এবং অর্ডর, বিধি এবং ব্যবস্থা নিয়ে। এই সুবৃহৎ দেশে শিক্ষার বিধান, স্বাস্থ্যের বিধান অতি অকিঞ্চিৎকর; দেশের লোকের দ্বারা নব নব পথে ধন-উৎপাদনের সুযোগ সাধন কিছুই নেই।...য়ুরোপীয় নবযুগের শ্রেষ্ঠ দানের থেকে ভারতবর্ষ বঞ্চিত হয়েছে য়ুরোপেরই সংস্রবে।" চীন, পারস্য, আফ্রিকা, আমেরিকার নিগ্রোরা দলিত হয়েছে য়ুরোপেরই অমার্জনীয় ঔদ্ধত্যে। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—"ক্রমে ক্রমে দেখা গেল, য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে।" শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এখানেই রবীন্দ্রনাথের মিল।

"নীতিবন্ধন-অসহিষ্ণু অধর্মসাহসিকতার ঔদ্ধত্য"—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়, এই ছিল মধ্যযুগীয় প্রতাপ বা প্রভুত্ব বা গৌরবের লক্ষণ। আবার—সেই "মুসলমান-আমলের বাংলা সাহিত্যে"—"অবাধে অন্যায় করবার অধিকারই যে ঐশ্বর্যের লক্ষণ, এই বিশ্বাসটা কলুষিত করেছে তখনকার দেবচরিত্র-কল্পনাকে।" এই ব্যাপারটি সুস্পষ্ট করবার জন্যেই তিনি এদেশে সেকালের জনবিশ্বাস—"দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" উল্লেখ করে আমাদের স্মৃতিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণকে যে 'ভূদেব' বলা হয়েছে, শূদ্রের প্রতি অধর্মাচরণের অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছে তাঁদের, এই ব্যাপারটিরও সূত্র ধরে তার সম্পূর্ণ বিপরীত মানসিকতা যে আমরা ইংরেজ-শাসনেই পেয়েছি অর্থাৎ ইংরেজ যে আমাদের "ন্যায়-আদর্শের সর্বভূমিনতা" শিখিয়েছে, সেই স্মরণীয় নতুন উপলব্ধির কথা তোলেন। যখন এই বিশেষ 'কালান্তর' প্রবন্ধটি লেখা হয়, সেই

আধুনিককালেও আমাদের শিক্ষিত শ্রেণীর মনের স্ববিরোধ দেখান তিনি এইভাবে—"আজও আমাদের দেশে শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যে বহু লোক রাষ্ট্রীয় অগৌরব দূর করার জন্যে আত্মচেষ্টা মানে, অথচ সমাজবিধির দ্বারা অধঃকৃতদেরকে ধর্মের দোহাই দিয়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে আত্মাবমাননা স্বীকার করতে বলে; এ কথা ভুলে যায় যে, ভাগ্যনির্দিষ্ট বিধানকে নির্বিরোধে মানবার মনোবৃত্তিই রাষ্ট্রিক পরাধীনতার শৃঙ্খলকে হাতে পায়ে এঁটে রাখবার কাজে সকলের চেয়ে প্রবল শক্তি।" য়ুরোপের সংস্রবেই মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের ধ্যানে বেরিয়ে আসবার সুযোগ ঘটেছিল আমাদের। সেই নতুন কালের মূল তত্ত্বটি হল ব্যক্তি জাতি সম্প্রদায় নির্বিশেষে কার্যকারণবিধির সার্বভৌমিকতায় আস্থা। কিন্তু শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধ এসে য়ুরোপের সেই মহিমা ঘুচিয়ে দিয়েছে।—একদা যে ইংরেজের সংস্রব ছিল শুচিতার উদ্বোধক, সেই সংস্রবের স্বাদ গেছে বদলে। সেই য়ুরোপই হয়ে উঠলো নিষ্ঠুরতার চরম উদাহরণ। সভ্যতার সেই সংকটের তীব্রতা দিনে দিনে বেড়েই চলেছে।

'সভ্যতার সংকট' নিবন্ধে আশি বছর উত্তীর্ণ হয়ে কতকটা স্মৃতিচারণার মেজাজেই ইংরেজের সংস্পর্শে এসে 'বৃহৎ মানববিশ্বে'র সঙ্গে কীভাবে আমাদের প্রথম পরিচয় ঘটে সেকথা উত্থাপন ক'রে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"তখন আমরা স্বজাতির স্বাধীনতার সাধনা আরম্ভ করেছিলুম, কিন্তু অন্তরে অন্তরে ছিল ইংরেজ জাতির ঔদার্যের প্রতি বিশ্বাস।" অল্প বয়সে ইংলণ্ডে গিয়ে জন ব্রাইটের পার্লামেন্টের ভাষণ শুনেছেন তিনি। তাতে হৃদয়ের ব্যাপ্তির স্বাদ পেয়েছেন। বার্কের বাগ্মিতা, মেকলের ভাষাপ্রবাহ, শেক্‌স্‌পীয়রের নাটক, বাইরনের কাব্য ইত্যাদি সেকালে বাঙালীর তথা ভারতীয় মনের উৎসাহ বাড়িয়েছে ইংরেজ জাতি সম্বন্ধে। সেকালে—"অত্যাচার প্রপীড়িত জাতির আশ্রয়স্থল ছিল ইংলণ্ডে।" এইসব স্মৃতির উদ্দীপনা ছিল তাঁর মনে। ইংরেজি 'সিভিলিজেশন' শব্দের প্রতিশব্দ খুঁজেছেন বাংলায়। তিনি অনুভব করেছেন যে, সেরকম প্রতিশব্দ পাওয়া সহজ নয়। আবার তাঁকে জানাতে হয়েছে—"এই সভ্যতার যে রূপ আমাদের দেশে প্রচলিত ছিল মনু তাকে বলেছেন সদাচার। অর্থাৎ, তা কতকগুলি সামাজিক নিয়মের বন্ধন। সেই নিয়মগুলির সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যে ধারণা ছিল সেও একটি সংকীর্ণ ভূগোলশাস্ত্রের মধ্যে বদ্ধ। সরস্বতী ও দৃশদ্বতী নদীর মধ্যবর্তী যে দেশ ব্রহ্মাবর্ত নামে বিখ্যাত ছিল সেই দেশে যে আচার পারম্পর্যক্রমে চলে এসেছে তাকেই বলে সদাচার।" অর্থাৎ বিশেষ লোকাচার ছিল আমাদের,— সিভিলিজেশন ছিল না।—"এই সদাচারের স্থলে সভ্যতার

আদর্শকে আমরা ইংরেজ জাতির চরিত্রের সঙ্গে মিলিত করে গ্রহণ করেছিলেম।" ইংরেজের প্রতি আমাদের সে আমলের জাতীয় কৃতজ্ঞতার উল্লেখ করে এবং ইংরেজ ভারতের ঐশ্বর্যে কতো যে পুষ্ট হয়েছে তাও দেখিয়ে,—ইংরেজ আমাদের উত্তরোত্তর কতো অবহেলা করেছে, তারও আলোচনা করেন। জাপানের যন্ত্রশক্তির মহিমা, রাশিয়ার সুবিপুল শিক্ষাবিস্তারের আয়োজন এবং সেখানে মুসলমান ও অমুসলমানের রাষ্ট্র-অধিকারের বিরোধহীন ভাগবাঁটোয়ারাতে 'শাসনব্যবস্থার যথার্থ সত্য ভূমিকা',—পারস্যের নবজাগৃতির ফলে ইংরেজের অত্যাচার থেকে সে-দেশের মুক্তির যুগান্তর,—আবার ইংরেজের আফিমে জর্জর প্রাচীন সভ্য চীনের দুর্দশা ও পাশ্চাত্য যন্ত্রশক্তির চর্চায় উদ্ধত জাপান কর্তৃক চীনের উত্তর ভাগ গলাধঃকরণ ইত্যাদি দেখে য়ুরোপের বর্বরতা সম্বন্ধে তাঁর ভর্ৎসনা তীব্র হয়ে ওঠে। কিন্তু সব সত্ত্বেও মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো-কে 'পাপ' বলেছেন তিনি। আমাদের নিজেদের সমাজ শক্তিকেই বৃহৎ, ব্যাপক, অকৃপণ ও আধুনিকভাবে জাগিয়ে তোলবার পরামর্শ দিয়ে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। শ্রীঅরবিন্দও কি অনুরূপ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন না? রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের প্রসঙ্গ এই কারণেই বারবার একই সঙ্গে মনে আসে।

৩৭

শ্রীঅরবিন্দের রাজনীতি-চিন্তাতে তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি কী পরিমাণে অনুস্যূত হয়ে আছে,—'অভিজ্ঞতা', 'সংশয়', 'প্রত্যয়', 'আস্পৃহা' ইত্যাদি সম্বন্ধে এবং মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ ও অভিপ্রেত ঊর্ধ্বায়ন সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন, তার কিছু পরিচয় আগেই দেওয়া গেছে। এখানে আরো কিছু দেখা যাক্। 'অভিজ্ঞতা' বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝে থাকি, সে খুবই ব্যাপক ব্যাপার। শ্রীঅরবিন্দ যোগের কথাপ্রসঙ্গে 'অভিজ্ঞতা' আর 'প্রত্যয়'—এই দুটি শব্দই ব্যবহার করে এদের পার্থক্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, যোগের মধ্যে যা কিছু ঘটে থাকে, সে-সবই—প্রায় সমস্তই হোলো অভিজ্ঞতা বা 'experience'; কিন্তু যখন কোনো অবস্থা স্থৈর্যে গিয়ে পৌঁছোয়, অর্থাৎ যে-অবস্থা স্থির বা অপরিবর্তন, তাকেই বলা যায় 'সিদ্ধি'-র অংশ থেকে সিদ্ধিতে যাওয়া—কিন্তু উপলব্ধি বা 'realisation' বলতে বোঝায় সেই অবস্থা যাতে সাধকের আস্পৃহা চরিতার্থ হয় তার লক্ষ্যে পৌঁছোবার ফলে। উদাহরণ দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, যদি সর্বত্রই দিব্যের অস্তিত্ব আছে,—এই রকম কারও ভাব থাকে, তাহলে সেটা ভাব (idea) এবং বিশ্বাস (belief) মাত্র, আর সর্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব

যখন অনুভবে পৌঁছোয় তখনি ঘটে উপলব্ধি বা 'realisation'.

উপলব্ধির দিকে এগিয়ে যাবার পথে মানসিক স্তরেই হোক্ আর প্রাণের স্তরেই হোক্ কিংবা শারীরিক স্তরেই হোক্, কোনো-এক সত্যের অঙ্কুর দেখা দিতে পারে। 'অঙ্কুর' শব্দটি অবশ্য শ্রীঅরবিন্দের প্রয়োগ নয়। তাঁর বক্তব্য বোঝাবার জন্তেই ঐ শব্দটি বাংলায় ব্যবহার করা হোলো। তিনি নিজে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সংক্ষেপে জানিয়েছেন যে, যখন কেউ শান্তি ব্যাপারটির অভিজ্ঞতায় পৌঁছোন, তখন শান্তি-র উপলব্ধির দিকে ধীরে ধীরে তাঁর অনুভব এগিয়ে যেতে থাকে। বার বার এই অভিজ্ঞতা ঘটলে ক্রমেই শান্তির পূর্ণতর উপলব্ধিতে পৌঁছোনো যায়।

আত্মিকতা বা আধ্যাত্মিকতা হোলো চৈতন্তের সর্বাত্মক, অনন্ত, আত্মস্থিত, শুদ্ধ অহং-এর স্থির উপলব্ধি। তাঁকেই যোগী বলা যাবে যাঁর এইরকম আস্বাদন ঘটেছে। 'যোগী' আর 'সাধক' সমার্থক নয়। 'সাধক' হলেন তিনি—যিনি এই উপলব্ধিতে পৌঁছোবার চেষ্টা করে চলেছেন।

অভিজ্ঞতা, উপলব্ধি, সিদ্ধি, যোগ ইত্যাদি শব্দের পৃথক পৃথক সংকেত এইভাবে বুঝিয়ে দিয়ে তিনি জানিয়েছেন যে, যে-কোনো অনুভূতিই অভিজ্ঞতা হয়ে উঠতে পারে। অলৌকিক অভিজ্ঞতা-ই বা অসম্ভব হবে কেন? যোগ-সাধনার ক্ষেত্রে তাও সম্ভব। অনুভূতির বৈচিত্র্য কে না জানেন? যোগের ক্ষেত্রে বা আধ্যাত্মিক অবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ—যাকে বলা হয় 'শুদ্ধা ভক্তি' সেও তো একরকম আবেগ বা অনুভূতি। এই আলোচনা-সূত্রেই দর্শন বা 'vision' শব্দটি দেখা দিয়েছে তাঁর রচনায়। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার প্রধান দুটি রূপের নামোল্লেখ করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ অনুভূতি (feeling) আর দর্শন (vision) এই দু'য়েরই প্রসঙ্গ এনেছেন। সঙ্গে সঙ্গে চেতনার গুণগত তারতম্যের কথা উঠেছে। সাধারণ অবস্থা থেকে আত্মিক বোধের দিকে যতই সাধক এগিয়ে যাবেন, তাঁর চৈতন্তের গুণগত পরিবর্তন ততোই তাঁর গোচর হয়—এবং তা হতে বাধ্য।

এই সূত্রেই অন্তর্দৃষ্টি বা 'inner sight'-এর কথা দেখা দেয়। সাধকের চেতনার বিস্তার তাঁর সেই অন্তর্দৃষ্টিতেই ধরা দেয়। আমাদের সত্তার মধ্যে যখন আনন্দের অবতরণ ঘটে, তখন অন্তর্দৃষ্টিই তা দেখিয়ে দেয়। সেই অন্তর্দৃষ্টির প্রাপ্তি বাহ্য ব্যাপার নয়। এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাস—এক টুকরো পাথর বা অন্য কিছুর ছোঁয়ার মতন নয় তা,—না, তা জড় জগতের বাহ্য ইন্দ্রিয়ের স্বাদ নয়। সব অভিজ্ঞতাই অভিজ্ঞতার মূল্যে স্বীকার্য। যেমন জড় জগতের ইন্দ্রিয়াধিগম্য

অভিজ্ঞতা, তেমনি অন্তর্দৃষ্টির অভিজ্ঞতা—দুইই যথাযথ মূল্যে স্বীকার্য।

না, সব অভিজ্ঞতার দাম সমান নয়। কিন্তু সাধনার ভিন্ন ভিন্ন উপাদান ভিন্ন ভিন্ন বলেই তো সবই মানতে হবে। গভীরতর আধ্যাত্মিক দিক থেকে দেখলে এটা বোঝা যায় যে, জড় জগতে দেহের বা বাইরের ক্ষেত্রে যেসব অভিজ্ঞতা ঘটে থাকে, আধ্যাত্মিক উপলব্ধিতে সে-সবের চেয়ে অধিক অন্তরঙ্গ, সক্রিয় চৈতন্য স্ফুরিত হয়ে থাকে। নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্মচেতনা বা দিব্যচৈতন্যের স্বাদ কি চাইলেই মেলে? সাধনা অবশ্যই চাই। সাধকের পক্ষে ধৈর্যশীল হওয়া চাই। নিজের প্রকৃতি শুদ্ধ ক'রে তুলতে সময় লাগাটাই স্বাভাবিক। অনেকেই বরং বলবেন যে, প্রথম অবস্থায় মন্দ গতিতে উদ্ভাসন ঘটাই ভাল কেউ কেউ অবশ্য প্রথম প্রস্তুতির পর্বেই অপেক্ষাকৃত দ্রুত কিছু কিছু বোধ পেয়ে যেতে পারেন, কিন্তু চৈতন্যের বিধারণ-শক্তি চেষ্টা-ব্যতিরেকে কি সবকিছু ধরে রাখতে পারে? প্রত্যয়াত্মক অভিজ্ঞতার মধ্যে প্রত্যেক অনুভূতিকেই ধরে রাখতে হয়—সেজন্যে সাধকের প্রয়াসই তো যথার্থ সাধনা। সেই প্রয়াস খুশি হয়ে মানতেই হবে। যারা খুশিতে সবকিছুই নিতে পারে তারাই পথ পেরিয়ে পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

তবে আত্মোপলব্ধি খুব একটা অকল্পের রকম দীর্ঘ পথের অভিযান নয়। একথাও শ্রীঅরবিন্দের কথা। কিন্তু এই সান্ত্বনা দিয়েও তিনি জানিয়েছেন যে, অনেক সময়ে জন্মজন্মান্তর কেটে যেতে পারে এই পথ অতিক্রম করতে। তিনি জানিয়েছেন যে, রামকৃষ্ণের গুরু তিরিশ বছর সাধনার ফলে এই অবস্থায় পৌঁছে-ছিলেন—এবং তখনো তিনি এই দাবী করেননি যে, ঐ অবস্থাটি তাঁর করায়ত্ত হয়েছিল। পাঠকমাত্রেই বুঝতে পারবেন যে, বেদান্ত-সাধক তোতাপুরীর কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছিল।

রামকৃষ্ণ পরমহংসের কথা তুলেই শ্রীঅরবিন্দ জানান যে, ভগবানকে ভাল না বাসলে তাঁকে পাবার চেষ্টা জাগবে কেন?—অর্থাৎ আগে চাই দিব্যের অভিজ্ঞতা,—তার পরে ঘটতে পারে সাধনার উদ্যোগ, এরকম ধারণা যাঁদের, তাঁদের সঙ্গে অনেক সাধকেরই ধারণার মিল নেই। তিনি জানান যে, পরমহংসদেব কোনো-না-কোনোভাবে ব্যক্ত করেছিলেন যে, ভগবানকে চাওয়ার আনন্দ,—তাঁকে খোঁজার ব্যগ্রতা ভগবৎপ্রাপ্তির চেয়ে কম তীব্র নয়।

ভক্তের চাই সিংহ-হৃদয়। একথাও শ্রীঅরবিন্দের। স্বামী বিবেকানন্দও এইরকম ভাষাতেই এ সত্য জানিয়েছেন। শ্রীঅরবিন্দ স্বীকার করে গেছেন যে, সাধারণ ভক্তদের সেরকম 'সিংহ-হৃদয়' নেই। অনেকেই ভগবানের প্রতি

ভালবাসায় ও তাঁকে পাবার পথেই আছেন বটে, কিন্তু ধর্তব্য অভিজ্ঞতা ( 'concrete experience' ) ঘটেনি তাঁদের। 'ঈশ্বর আছেন, তাঁকে পাবোই' —এই বলে যাত্রা শুরু ক'রে অচিরেই কেউ কেউ বল্‌তে থাকেন—'নাস্তি' 'নাস্তি'—নেই, নেই—এবং সন্দেহে ভোগেন,—নিজের সংকল্পের কাছে নিজেই হার মানেন। সেভাবে চল্‌লে বোধের খামারে অবসাদের ফসল তুলতে হয়। কিন্তু আবার শ্রীঅরবিন্দ জোর দিয়ে জানান, নৈরাশ্যের কোনো কারণ নেই,— বিন্দু বিন্দু বর্ষণের পরে দিব্যভাবের বৃহৎ প্লাবন তো অবশ্যম্ভাবী।

নিজের সংস্কারগত সংকীর্ণ অহং সজোরে ধরে থাকলে কখনো কি সমর্পণ ঘটে? নিজের মানসিকতার আদিবন্ধন না ছিঁড়তে পারলে বৃহত্তের দিকে গতি কি সম্ভব? নিজের অভ্যস্ত ছাঁচে বাঁধা থাকলে চলবে না। পরমের প্রবেশপথ বিস্তীর্ণ হোক। সাধকের সেই সংকল্পই সাধু সংকল্প। যদি প্রাণস্তরের সত্তা তার নিজের রঙিন কাচের মধ্যে দিয়ে কিংবা মানসিক স্তর তার আপন মানসিকতার টেষ্ট-টিউবে পরম-কে ধরতে চায়, তাহলে যিনি মুক্তস্বরূপ তিনি কি সে সবের মধ্যে ধরা দেবেন? না, তা হয় না। নিজেকে পূর্ণ উৎসর্গ করার নামই যথার্থ সাধনা। সে কাজ আনন্দের যজ্ঞ।

৩৮

কে আর শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার তাঁর শ্রীঅরবিন্দ-জীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডের [ পঞ্চদশ অধ্যায় থেকে শুরু ] প্রথমেই অরবিন্দের চন্দননগর পর্বকে 'শান্তির আশ্রয়' বা 'Inn of Tranquillity' নাম দিয়েছেন এবং ষোড়শ অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন 'তপস্যার গুহা' বা 'Cave of Tapasya'. এগুলি শ্রীঅরবিন্দেরই প্রয়োগ।

অরবিন্দের রাজনীতিচিন্তা ও রাজনৈতিক বিভিন্ন কর্মপ্রবাহ যে আলিপুর মামলা থেকে তাঁর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়, তা নয়। তবে ১৮১৮-র সংস্কার-আইনে যে কোনো তুচ্ছ কারণে তাঁকে ব্রিটিশ সরকার পুনরায় বন্দী করতে পারেন, এরকম সম্ভাবনা তাঁর মনে জাগ্রত ছিল। মামলা থেকে মুক্তির পরে অচিরেই তিনি যে আগে ইংরেজি 'কর্মযোগিন্' ও পরে 'ধর্ম' পত্রিকা দুটি প্রকাশ করেন, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের চোখে তখনো অসন্তুষ্ট এক ধূর্ত রাজদ্রোহী। তবে সেই সরকারের পক্ষে তাঁকে তাঁর চাতুর্যের জন্যেই কোনো আইনে কবলিত করা কঠিন ছিল। সবাই জানেন, তাঁর প্রসিদ্ধ উত্তরপাড়া-ভাষণে তিনি বার-

বার বাসুদেব, ঈশ্বর, সনাতন ধর্ম ইত্যাদির উল্লেখ করেন। আবার সংস্কারের বিরুদ্ধে, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধেও তাঁর সমালোচনা শুরু হয়নি। ভগিনী নিবেদিতা তাঁকে তাঁর আসন্ন গ্রেপ্তার ও দ্বীপান্তরের সম্ভাবনাও জানান এবং ১৯০৯-এর ৩১-এ জানুয়ারির 'কর্মযোগিন' পত্রিকায় 'আমার দেশবাসীর প্রতি খোলা চিঠি' লেখেন অরবিন্দ। ২৯-এ সেপ্টেম্বরের 'কর্মযোগিন'-এ 'অতীত ও ভবিষ্যৎ' নিবন্ধে তিনি পাশ্চাত্ত শিক্ষার আংশিকতা ও অপূর্ণতা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট সমালোচনা করেন। ৩১-এ জুলাইয়ের পূর্বোক্ত নিবন্ধে তিনি তাঁর দ্বীপান্তর ঘটলে জাতীয় দল মোটেই বিষাদাচ্ছন্ন না হ'য়ে কোন্ পথে এগিয়ে যাবে, তার নির্দেশ দেন এবং এটিকে তাঁর শেষ ইচ্ছা-পত্র হিসেবে গণ্য করতে হবে, এরকম মন্তব্যও ছিল। তিনি বলেন যে, প্রত্যেক বড়ো আন্দোলনই ঈশ্বর-প্রেরিত নেতার উপর নির্ভরশীল। জাতীয় আন্দোলনকেও সেই নেতার প্রতীক্ষায় থাকতে হবে। সেই আন্দোলন শুধু ভারতেরই স্বাধীনতা-আন্দোলন নয়, সে হবে সারা বিশ্বের আন্দোলন। ভারত-আত্মার পুনরাবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের মানবাত্মার নেতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা দেবে। আমাদের শিক্ষার আদর্শ, সংকল্পের স্বরূপ ও কর্মপ্রবাহের রূপ দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করেন তিনি। ধর্ম, রাজনৈতিক নেতৃত্ব, শিক্ষার আদর্শ সংস্কার, শিল্প-সমবায়ের সার্থকতা— একযোগে এই সবই তিনি নতুন কালের নেতৃত্বের মধ্যে অভিব্যক্ত হতে দেখতে চেয়েছিলেন। ১৯০৯-এর ৩১-এ জুলাইয়ের পূর্বোক্ত নিবন্ধে তিনি ছ'টি সূত্রের কার্যসূচী দেন এবং সেই বছরেই ২৫-এ ডিসেম্বর 'কর্মযোগিন'-এ লেখেন 'আমার দেশবাসীর প্রতি'। এটি তাঁর দ্বিতীয় খোলা চিঠি। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার মন্তব্য করেছেন যে, অরবিন্দ তাঁর দ্বিতীয় খোলা চিঠিতে তখনকার ঘটনাধারার পরিপ্রেক্ষিতে দুটি বিশেষ ব্যাপারে নতুন চিন্তা ও সোজা কথার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন— প্রথমতঃ, ১৯০৯-এর ১৫ই নভেম্বর যেসব মেকি সংস্কারের কথা ঘোষিত হয় এবং যেভাবে কাউন্সিল গঠনের প্রতিনিধিত্বের কথা বলা হয় তাতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ক্ষেত্রে প্রতিনিধিত্বের ছলনা মাত্র করা হচ্ছে—তাতে স্বরাজ দূর অস্ত্! দ্বিতীয়তঃ, হুগলী-সম্মেলনে অরবিন্দ যে সম্মিলিত কংগ্রেসের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আলোচনা শুরু করেন, তা ঘটেনি,— এবং প্রস্তাবিত নরমপন্থীদের সম্মেলন বা 'কনভেনশন' জনপ্রিয়তার অভাবেই ব্যর্থ হতে বাধ্য। এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী দল তখনো যদি পিছিয়ে থাকে, তাহলে ভারতীয় রাজনীতি থেকে জাতীয়তাবাদ সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আশঙ্কা অবশ্যই বিদ্যমান। সেক্ষেত্রে সহিংস বিপথগামী আন্দোলন

দেখা দিতে পারে। জাগ্রত ভারত কখনোই নরমপন্থীদের মোহনিদ্রা মেনে নেবে না। বঙ্গভঙ্গের অব্যবহিত পরে জাতীয়তাবাদের যে জোর ছিল, অরবিন্দ সেই জোরই ফিরিয়ে আনতে চান। জাতীয় শিক্ষা, বিদেশী-বর্জন, অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা, শিল্পনিয়োগের স্বাধীনতা ইত্যাদি গঠনমূলক কর্মসূচীই তাঁর কাম্য ছিল। তাঁর এইসব কর্মপন্থার মধ্যে ঈশ্বরের নাম বারবার ধ্বনিত হয়। তিনি আইন মেনেই আইন-ভঙ্গকারী ব্রিটিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বলেন দেশকে, জাতিকে। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের মন্তব্যে অরবিন্দের নিজের কথায় বহুল উদ্ধৃতি আছে এবং Sri Aurobindo on Himself-এর ৯০ পৃষ্ঠার পাদটীকা থেকে তিনি তুলে দেখিয়েছেন—"Sri Aurobindo would have accepted Dyarchy as a step, if it had been given genuine control." লর্ড মরলির সংস্কার-সূত্রগুলি অরবিন্দর দৃষ্টিতে যথার্থ গণতন্ত্রের প্রতিকূল মনে হয়েছিল। বিশদভাবে এসব প্রসঙ্গ দেখতে হলে শ্রীঅরবিন্দের মূল আলোচনা পড়ে দেখা দরকার। এখানে সংক্ষেপে তখনকার ঘটনাবলী অনুধাবনের চেষ্টা মাত্র করা হচ্ছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাহায্যে তিনি প্যাসিভ রেজিস্টান্সের পথে জাতির পক্ষে আত্মশাসনের অধিকার চেয়েছিলেন। এই দ্বিতীয় পত্রের পরে আমলাতন্ত্রকেও ভাবতে হয়েছে কিছুক্ষণ। সেই অবসরে ১৯১০-এর ৮ই জানুয়ারি 'কর্মযোগিন'-এ 'দ্বীপান্তরের ত্রাস' (The menace of Deportation) ছাপা হয়—যাতে লেখা হয় যে, বিহারের এক প্রান্ত থেকে খবর আসছে যে পুলিশের নথীতে শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের নাম রয়েছে আমলাতন্ত্রের বন্দীশালায় যাদের নিক্ষেপ করা হবে, সেই তালিকার সর্বাগ্রে। সরকার আইনের প্রতি আনুগত্য রক্ষা করেও যাঁরা অত্যাচারের বিরোধিতা করতে প্রস্তুত, তাঁদের সম্বন্ধে কোন্ ব্যবস্থা নেবেন সেটা জানানো দরকার। বজ্রপাতে বিলম্ব কেন? নাকি লণ্ডনেই বিরোধিতা চলছে?

এর তাৎপর্য হোলো ইংলণ্ডে উদারনৈতিক লর্ড মরলি তখন ছিলেন ইণ্ডিয়া-অফিসে এবং কট্টর লর্ড মিণ্টো তখন ভারতের ভাইসরয়। ভারতেও বাংলার সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বিপ্লবীদের ওপর কীরকম দলন চালাতে হবে, সে-বিষয়ে সম্পূর্ণ বোঝাপড়ার অভাব ছিল।

ইতিমধ্যে ১৯১০-এর ২৪-এ জানুয়ারি সন্ধ্যায় অরবিন্দ যখন 'কর্মযোগিন'-অফিসে ছিলেন, সেই সময়ে সতীশ সরকার নামে একটি ছেলে এসে খবর দেয় যে, পুলিশের গুপ্ত-সংবাদ-বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট শামস্-উল-আলম (আলিপুর সন্ত্রাসবাদীদের মামলায় যিনি ছিলেন অত্যুৎসাহী রাজসহায়ক)।

কুড়ি বছরের বালক বীরেন্দ্রনাথ দত্তগুপ্তের গুলিতে সেইদিনই হাইকোর্টের সিঁড়িতে নিহত হয়েছে। তারপরেও অরবিন্দ অল্প কয়েকদিন কলকাতায় ছিলেন। তারপর অকস্মাৎ তাঁর চন্দননগরের পথে যাত্রা ঘটে।

আমাদের ভারতভাগ্যের সঙ্গে বিশ্বমানবের কল্যাণ যে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত, তাঁর পরবর্তী সাধনার সে-দিকটি বিশেষ লক্ষণীয়।

২৯-এ জানুয়ারি তারিখের 'কর্মযোগিন্' পত্রিকায় সেই চমকপ্রদ হত্যাকাণ্ডের উল্লেখ ছিল। তার আগে ২২-এ জানুয়ারি সংখ্যায় এই খবর বেরোয় যে, অজ্ঞাতনামা এক পত্রলেখক মারফৎ খবর পাওয়া গেছে যে, অরবিন্দের তখনকার নিবাস ৬নং কলেজ-স্কোয়ারের ওপর গোপালচন্দ্র রায় নামে সি. আই. ডি. বিভাগের এক ব্যক্তি তাঁর বহু অনুচর নিয়ে নজর রাখছেন এবং অরবিন্দের নামে আসা সমস্ত চিঠিপত্র খুলে সেগুলির নকল রাখছেন। পূর্বোক্ত ২৫-এ ডিসেম্বরের স্বাক্ষরিত 'খোলা চিঠি'তে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সুশৃঙ্খল-ভাবে চালাবার যে সংকল্প অরবিন্দ প্রকাশ করেন, সেটিকেই রাজদ্রোহের বিষয় স্থির ক'রে সরকারের আইন-বিশেষজ্ঞেরা তাঁকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে তৈরী হতে থাকেন। ১৯১০-এর ১৪ই ফেব্রুয়ারি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে ৪নং শ্যামপুকুর লেনে 'কর্মযোগিন্'-অফিসে অরবিন্দ যখন বসেছিলেন, তখন রামচন্দ্র মজুমদার নামে এক যুবক এসে খবর দেন যে, তিনি তাঁর পদস্থ পুলিশ-অফিসার পিতার কাছে শুনেছেন যে, হয়তো সেই রাত্রেই ঐ পত্রিকার অফিসে তল্লাসী হবে এবং অরবিন্দকে গ্রেপ্তার করা হবে। ১৯২১-এর অগস্টে 'Mother India'-তে পুনর্মুদ্রিত শ্রীমতী উমা মুখোপাধ্যায়ের 'How Sri Aurobindo withdrew to Pondicherry' রচনায় ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখের উল্লেখ আছে—এবং শ্রীমতী মুখোপাধ্যায় তা পেয়েছেন নগেন্দ্রকুমার গুহরায়কে লেখা মতিলাল রায়ের চিঠি থেকে—শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার এই তথ্য তাঁর আলোচনার পাদটীকায় (পৃঃ ৬৪৩-৪৪) জানিয়ে দিয়েছেন। পুলিশ এসে পড়লে কী করা যাবে, উপস্থিত যুবকদল যখন সে-বিষয়ে পরামর্শ করছিলেন শ্রীঅরবিন্দ তখন নিজের অন্তরের আদেশ পান—'পুলিশকে বাধা দেওয়া নয়,—চলো চন্দননগরে'! আশ্চর্যের ব্যাপার, সেদিন অফিসের কাছে গোয়েন্দা-গুপ্তচর, কেউই ছিল না। সেই দিব্য আদেশ পেয়েই শ্রীঅরবিন্দ বলেন, 'চলো এক্ষুনি বেরিয়ে পড়া যাক্।' একজন যুবককে তিনি একটি চিঠি দিয়ে পাঠান ভগিনী নিবেদিতার কাছে,—তাতে অনুরোধ ছিল, তাঁর অনুপস্থিতিতে নিবেদিতা যেন 'কর্মযোগিন্' সম্পাদনার দায়িত্ব নেন।

তারপর আগে আগে চলেন রামচন্দ্র,—মাঝে শ্রীঅরবিন্দ—এবং কিছু দূরত্ব রেখে চলেন বীরেন ঘোষ আর সুরেশ চক্রবর্তী ( মণি ); তারপর দশ মিনিটের মধ্যে গঙ্গার ঘাটে পৌঁছে যান তাঁরা; একটি নৌকা ভাড়া করা হয়; বীরেন আর সুরেশ অরবিন্দের সঙ্গে যান, রামচন্দ্র ফিরে যান। রাত শেষ হবার আগেই তাঁরা চন্দননগরের ঘাটে পৌঁছে যান। আলিপুর-মামলায় বন্দী ও পরে মুক্ত চারুচন্দ্র রায়ের কাছে বীরেন গিয়ে খবর দেন; কিন্তু তাঁকে দ্বিধাগ্রস্ত দেখে শিশির ঘোষ নামে একজনের কাছে যেতে হয়—যিনি তাঁদের মতিলাল রায়ের কাছে নিয়ে যান। নলিনীকান্ত গুপ্তের—'Reminiscences' এবং 'Sri Aurobindo on Himself' উল্লেখ ক'রে [ পাদটীকা : পৃঃ ৬৩৫ ] শ্রীনিবাস-আয়েঙ্গার এই খাঁটি তথ্য দিয়েছেন যে, মতিলাল শ্রীঅরবিন্দকে সাদরে চন্দননগরে ব্রিটিশ পুলিশের নজরের বাইরে আশ্রয় দেন। বীরেন আর সুরেশ কলকাতায় ফিরে যান। ১৯১০-এর ২৬-এ মার্চের 'কর্মযোগিন্' [ নিবেদিতা-সম্পাদিত ] পত্রিকায় অরবিন্দের আকস্মিক অন্তর্ধানে বিস্ময় প্রকাশ করা হয় এবং একথাও বলা হয় যে, স্থানীয় সংবাদপত্র থেকে জানা যাচ্ছে যে, তিনি নাকি তিব্বতে চলে গেছেন এবং নির্জনে সাধনায় রত আছেন। ২১-এ মার্চের 'ধর্ম' পত্রিকাতেও এই খবর বেরোয় যে, তিনি যোগে নিযুক্ত আছেন এবং সেই মুহূর্তে কোনো রাজনৈতিক বা সাংবাদিকতার কাজ করবেন না। কিন্তু ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র উপায়ান্তর না পেয়ে ২৫-এ ডিসেম্বরের সেই নিবন্ধের লেখকের অভাবে 'কর্মযোগিন্'-এর মুদ্রাকর মনোমোহন ঘোষের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে। তবে হাইকোর্টে আপীলের ফলে তাতে হেরে যায়। তারপর সরকার পক্ষে অনেক আলোচনা চলতে থাকে।

আগেই বলা হয়েছে, 'কর্মযোগিন' এবং 'ধর্ম' শ্রীঅরবিন্দের অনুপস্থিতিতেও কিছুদিন চলেছিল,—এদিকে সংশ্লিষ্ট যুবকদের বিরুদ্ধে পুলিশ লেগেই ছিল। অতঃপর সুরেশ গিয়ে ঠাকুর-বাড়িতে আশ্রয় নেন, বিজয় কলকাতাতেই গা ঢাকা দেন। নলিনীকান্ত গুপ্ত সুদূর এক পল্লীগ্রামে এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে ওঠেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ৩১-এ মার্চ, ১৯১০ চন্দননগরে বাসের মধ্যে ঐ সময়ের শেষদিকে তিনি গোন্দলপাড়ায় বলাইচন্দ্র দের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন এবং এই পুরো পর্বেই তাঁর সাধনা চলতে থাকে। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার জানিয়েছেন যে, ১৯০৯-এর জুলাই-ডিসেম্বরের দুটি 'খোলা চিঠি'র অন্তর্বর্তী পর্বে সম্ভবত শ্রীঅরবিন্দ সক্রিয় রাজনীতি থেকে সাময়িকভাবে সরে গিয়ে আরো অনুকূল সময়ে আরো কার্যকরী কিছু করতে চেয়েছিলেন। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের

নিজের কথাগুলিই অতঃপর দেখা দরকার—"The spiritual and political pulls had been with him all along, from the time of the composition of Bhavani Mandir at least: but whereas, during the editorship of the *Bande Mataram*, the political pull was rather stronger than the spiritual, during the editorship of the *Karmayogin* and the *Dharma*, the spiritual pull was decidedly stronger, and this was confessedly the result of his prison-sadhana at Alipur. Although during the short spell of his political leadership he proved a superb strategist and technician of political action, although his speeches and writings bore the impress of a masterful and wide-ranging intellect, yet he had learned, as a result of his spiritual experiences, to subordinate everything to the Divine Command whenever it might come. Thus it was that in mid-February, whatever his contingency plans before, when the *ades* actually came, "No, go to Chandernagore"—it was the countermanding of a mental plan and the issue of a Divine Command—he followed it implicitly. And in Motilal Roy's upstairs room, Sri Aurobindo must have felt a sudden cleansing of the dust and odour of politics, for he was found sitting in meditation as one on the threshold of a new life. He sent no further contributions to the *Karmayogin* or the *Dharma*, and reduced his contacts with the world to an absolute minimum. As the days passed, he saw that his real destiny was to make spiritual rather than political conquests. In a manner of speaking, the political period was now ended ; the Yogic period had begun."[৩০]

এই হোলো তাঁর রাজনীতির শেষ কথা। আধ্যাত্মিক বিকাশ ও পূর্ণতার পথ খুঁজে খুঁজে তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছে গিয়েছিলেন।

শ্রীঅরবিন্দ শিক্ষা-সংস্কার চেয়েছিলেন, সে-কথা আগেই দেখা গেছে। তিনি জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপরে বারবার জোর দিয়ে গেছেন, সেই তত্ত্বটি বোঝবার জন্তেই মোটামুটি আমাদের শিক্ষা সংস্কার সম্বন্ধে চিন্তাশীল অগ্রণী মনীষীদের ভাবনা সংক্ষেপে দেখে নেওয়া দরকার।

রামমোহনের আমল থেকেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রাচীন ধারা থেকে নতুন প্রয়োজনীয়তার দিকে দৃষ্টি ফেরাবার চেষ্টা দেখা যায়। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর রামমোহন তখনকার ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে জানান যে, এদেশে প্রচলিত ব্যাকরণ ও দর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম চর্চার বদলে প্রকৃতিবিজ্ঞান, রসায়ন, শারীর-বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থাপনা চাই। ব্যাকরণ-দর্শনের তদানীন্তন শিক্ষাকে তিনি 'imaginary learning' নামে চিহ্নিত করেন। আধুনিককালের উপযোগী শিক্ষা চাই—এই ছিল তাঁর অভিমত। য়ুরোপে বেকনের আগে যেরকম শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল এবং পরে যে পরিবর্তন ঘটে, সেই পরিবর্তনের দিকেই তিনি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর পরামর্শ কর্তৃপক্ষ মেনে নেন। তিনি নিজের উদ্ভাবিত ধর্মমতকে বলে গেছেন 'universal religion' অর্থাৎ সর্বজনীন ধর্ম। পৃথিবীর বিভিন্ন নেশন ও 'ট্রাইব'কে তিনি অভিন্ন মানবজাতি বলে উল্লেখ করেন ১৮৩২-এ ফ্রান্সের তদানীন্তন বৈদেশিক মন্ত্রীর কাছে লেখা পাসপোর্টের আবেদন-পত্রে।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-৯১) সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, ইংরেজি, সংস্কৃত-সাহিত্য, অলঙ্কার, বেদান্ত, স্মৃতিশাস্ত্র, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষ ইত্যাদি নানা বিদ্যার ছাত্র ছিলেন এবং পরে অধ্যাপনা-জীবনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ১৮৪১-৪৬ পর্বে কাজের পরে ১৮৪৬-এর এপ্রিলে সংস্কৃত কলেজের চাকুরিতে প্রবেশ করেন; ১৮৪৭-এর ১৬ই জুলাই মতান্তরের জন্যে সে-কাজে ইস্তফা দেন। আবার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে কাজ নেন। পরে আবার ১৮৫০-এর ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যাপক হন। ১৮৫১ থেকে ১৮৫৩-র মধ্যে সংস্কৃত কলেজের ঐতিহাসিক পুনর্গঠনের নিয়ন্তা রূপে তিনি একদিকে যেমন সংস্কৃত শিক্ষার প্রতিবন্ধকতা দূর করেন, অন্যদিকে ইংরেজি বিভাগেও নানা সংস্কারের ব্যবস্থা যাতে প্রবর্তিত হয় সে চেষ্টা করেন। সে-বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এখানে বাহুল্য। শিক্ষিত মাত্রেই সেসব কথা জানেন। কিন্তু বাংলা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা, বাংলায় প্রাথমিক শিক্ষার প্রসঙ্গে তাঁর পাটিগণিত, জ্যামিতি,

পদার্থবিদ্যা, নীতিবিজ্ঞান ইত্যাদির দিকে বিশেষ নজর বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আমাদের জাতীয় প্রয়োজনীয়তার দিকটিতে তাঁর নিজের,—এবং উনিশ শতকে শেষ পর্যন্ত সকলেরই বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

'আত্মশক্তি ও সমূহ' নিবন্ধমালার প্রথম নিবন্ধ 'দেশনায়ক' লেখা হয় ১৩১৩ সালে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের অব্যবহিত পরেই। তাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী অন্যান্য প্রবন্ধের মতোই একথা স্পষ্টভাবে জানান যে, দেশের সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের সম্বন্ধ রাখা চাই। তার কুড়ি বছর আগে প্রেসিডেন্সি কলেজের তদানীন্তন অধ্যাপক প্রসন্নকুমার রায়ের বাড়িতে যে ছাত্রসম্মেলন হয় তাতে যে গান গাওয়া হয় তার কয়েক ছত্র তিনি তুলে দেখান—

দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু
কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না তো কিছু।
যদি মান চাও যদি প্রাণ চাও,
প্রাণ আগে কর দান।

ঐ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ একথা মেনে নেন যে, সেই আমাদের ব্রিটিশ প্রভুর কাছে আবেদন-নিবেদনের পর্ব আগেকার কুড়ি বছরের মধ্যে শেষ হয়েছে বলে যদি স্বীকার করা যায়, তাহলে একথাও স্বীকার করতে হয় যে—"আমাদের দেশে যে দুর্গতি ঘটিয়াছে, তার কারণ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে, এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজেদের ছাড়া আর কাহারও দ্বারা কোনদিন সাধ্য হইতে পারে না।"

পরবর্তী প্রবন্ধ পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর "সভাপতির অভিভাষণে' ১৩১৪ সালে তিনি পরের অনুগ্রহ ছেড়ে নিজের সত্যের উপর দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই যে শিক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে তোলার আগ্রহ দেখা যায় তার উল্লেখ করেন।

রবীন্দ্রনাথ আমাদের মাতৃভাষাকেই সর্বপ্রকার শিক্ষার বাহন করতে চেয়েছিলেন। মাত্র বাইশ বছর বয়সে ১২৯০ সালে 'ভারতী' পত্রিকার কার্তিক সংখ্যায়, অর্থাৎ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ গ্রামে গ্রামে যাতে "নিদেন গুটিকতক" শিক্ষিত লোক পাওয়া যায় যাঁরা অশিক্ষিতদের মধ্যেও কতকটা শিক্ষা বিতরণ করতে পারেন, সে-বিষয়ে তাঁর অভিপ্রায় প্রকাশ করেন এবং লেখেন—"কেবল ইংরাজি লিখিলে কিংবা ইংরাজিতে বক্তৃতা করিলে এইটি হয় না। ইংরাজিতে যাহা শিখিয়াছ, তাহা বাংলায় প্রকাশ কর, বাংলাসাহিত্য উন্নতিলাভ করুক ও অবশেষে বঙ্গবিদ্যালয়ে দেশ ছাইয়া সেই সমুদয় শিক্ষা বাংলায় ব্যাপ্ত হইয়া

পড়ুক। ইংরাজিতে শিক্ষা কখনই দেশের সর্বত্র ছড়াইতে পারে না।" এই উক্তির দশ বছর পরে 'সাধনা' পত্রিকায় ১২৯৯ সালের পৌষ সংখ্যায় তাঁর 'শিক্ষার হেরফের',—১২৯৯-এর চৈত্র সংখ্যায় এবং ১৩০০ সালের আষাঢ় সংখ্যায় 'প্রসঙ্গকথা' বের হয়। এইসব রচনায় তিনি জোর দিয়ে জানান যে, বাংলা ভাষা এবং বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমেই শিক্ষার সঙ্গে আধুনিক জীবনের সামঞ্জস্য সাধন সম্ভব। পূর্বোক্ত 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধ পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ( ১৮৩৮-৯৪ ), গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ( ১৮৪৪-১৯১৮ ) এবং আনন্দমোহন বসু ( ১৮৪৭-১৯০৬ ) তিন মনীষী তাঁকে চিঠি লিখে সমর্থন জানান।

রামমোহনের আমল থেকে বিবেকানন্দের সময় পর্যন্ত—অর্থাৎ সারা উনিশ শতকে শিক্ষার আদর্শ এবং পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলেছেন, লিখেছেন,—এবং বিভিন্ন আন্দোলনেও যোগ দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্যে'র 'ইংরেজস্তোত্র' রচনাটির ২০-সংখ্যক অনুচ্ছেদে আমাদের সেকালের জাতিগত স্বপ্নের বিরুদ্ধে কটাক্ষ ছিল এই শিক্ষাসূত্রেই। ১৯-সংখ্যক অনুচ্ছেদে ইংরাজকে সম্বোধন ক'রে লেখা হয়েছিল—'তুমি বিদ্বান বলিবে বলিয়া আমি লেখাপড়া করি।' ২০-সংখ্যক অনুচ্ছেদের প্রাসঙ্গিক উক্তিটি ছিল—'তোমার প্রীত্যর্থে স্কুল করিব'। ২১-সংখ্যক অনুচ্ছেদে দেখা গেছে—'আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব।'

'বাবু' প্রবন্ধের এক জায়গায় বৈশম্পায়ন জনমেজয়কে বলেন—'হে নরশ্রেষ্ঠ। যিনি কাব্যরসাদিতে বঞ্চিত, সংগীতে দগ্ধ কোকিলাহারী, যাঁহার পাণ্ডিত্য শৈশবাভ্যস্ত গ্রন্থগত, যিনি আপনাকে অনন্ত জ্ঞানী বিবেচনা করিবেন, তিনিই বাবু।'

ভূদেব, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ ইত্যাদি অনেকেই যথার্থ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন চেয়ে গেছেন। সেই শিক্ষার অভাব দেখা গেছে দেশে। শ্রীঅরবিন্দ এসব কথা একেবারেই শোনেননি মনে করা ঠিক হবে না। তাঁদের মধ্যে সূক্ষ্ম আদর্শগত ভেদ যতোই থাক, এই একটি ব্যাপারে তাঁরা সম্পূর্ণ একমত ছিলেন যে, আমাদের শিক্ষার সংস্কার দরকার। রবীন্দ্রনাথ ১৩১২ সালের বৈশাখের একটি বক্তৃতায় ( ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ) প্রধানত এই কথাই বলেছিলেন, যে, দেশকে জানতে হবে এবং যথাযোগ্য দেশের সেবা করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্যচেতনাই উনিশ শতক থেকে আমাদের বর্তমান শতকের প্রথমার্ধ অবধি প্রায় আদর্শ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। এ আদর্শে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান-ধর্ম-ইতিহাস-

সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বিমুখতার চিহ্ন নেই। তবে শিক্ষার বাহন হোক মাতৃভাষা—এই দাবিটি বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়েছে।

১৩২২ সালের আশ্বিনে 'শ্রীমতী লীলা মিত্রের' একটি চিঠি পেয়ে রবীন্দ্রনাথ শিক্ষা-প্রসঙ্গে আরো কয়েকটি বাস্তব সমস্যার উল্লেখ ও সংক্ষিপ্ত বিচার করেন ('স্ত্রীশিক্ষা' দ্রষ্টব্য—'শিক্ষা')। মানুষ আবশ্যক অনাবশ্যক নানা বিদ্যা শিখতে চায়। কিন্তু 'মানুষকে পুরা পরিমাণে মানুষ করিব এ কথা আমাদের সকলের অন্তরের কথা নয়।'—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিটি আমাদের সমাজের বিশেষ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশের নির্দেশক। এ-প্রসঙ্গ আজও পুরোনো হয়ে যায়নি। তাঁর নিজের কথাগুলি এই কারণেই এখানে কিঞ্চিৎ তুলে দেখা যেতে পারে। তিনি লেখেন—

"যখন সর্বসাধারণকে শিক্ষা দেওয়ার প্রস্তাব হয়, তখন একদল শিক্ষিত লোক বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমরা চাকর পাইব কোথা হইতে? বোধ হয় শীঘ্রই এ সম্বন্ধে রসিক লোকে প্রহসন লিখিবেন যাহাতে দেখা যাইবে—বাবুর চাকর কবিতা লিখিতেছে কিংবা নক্ষত্রলোকের নাড়ীনক্ষত্র গণনা করিবার জন্য বড়োবড়ো অঙ্ক কাঁদিয়া বসিয়াছে, বাবু তাহাকে ধুতি কোঁচাইবার জন্য ডাকিতে সাহস করিতেছেন না পাছে তাহার ধ্যানের ব্যাঘাত হয়। মেয়েদের সম্বন্ধেও সেই এক কথা যে, তারা যদি লেখাপড়া শেখে, তবে যে ঝাঁটা বঁটি ও শিলনোড়া বাবুদের ভাগে পড়ে।"

কিন্তু স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে এই আশঙ্কা অমূলক। স্ত্রী-পুরুষের নৈসর্গিক ভেদ বিধাতার সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের কথায়—"মেয়েরা যদি বা কান্ট-হেগেলও পড়ে, তবু শিশুদের স্নেহ করিবে এবং পুরুষদের নিতান্ত দূর-ছাই করিবে না। কিন্তু তাই বলিয়া শিক্ষা-প্রণালীতে মেয়ে পুরুষে কোথাও কোন ভেদ থাকিবে না, একথা বলিলে বিধাতাকে অমান্য করা হয়।" এটি এখন আমাদের জীবনে পরীক্ষিত সত্য।

শিক্ষার আদর্শ বিশ্লেষণের শতাব্দীব্যাপী প্রয়াসে আমরা এ সত্যটুকু অনুভব করতে পেরেছি যে, মানুষের বিকাশ একমুখী নয়, তা বহুমুখী হওয়াই স্বাভাবিক; এবং সেই কারণেই মূলত মানুষের ভাবের ক্ষেত্র এবং ব্যবহারিক জীবন, উভয় দিকেই শিক্ষার লক্ষ্য থাকা দরকার। মাতৃভাষাই শিক্ষার সমুচিত বাহন। রবীন্দ্রনাথের 'শিক্ষাসংস্কার' প্রবন্ধটির এক জায়গায় বলা হয়—"যে ভাষায় আমাদের শিক্ষা সমাধা হয় সে ভাষায় প্রবেশ করিতে আমাদের অনেক দিন লাগে। ততদিন পর্যন্ত কেবল দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া হাতুড়ি পেটা এবং কুলুপ

খোলার তন্ত্র অভ্যাস করিতেই প্রাণান্ত হইতে হয়।" অর্থাৎ যথার্থ মনুষ্যত্ব শিক্ষা বা মনুষ্যত্বের উদ্বোধনই যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে জীবনের একটি মুহূর্তও বৃথা অপব্যয়িত হতে না দিয়ে, জ্ঞান এবং ভাবকে রক্ত মাংসের সঙ্গে মিশতে দেওয়া উচিত। ইংরেজ বা অন্য কেউ 'বিদ্বান' বলে পিঠ চাপড়াবে বলেই যে লেখাপড়া শিখতে হবে তাও নয়,—আবার বিশেষ কালে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক ভাবে অনুপ্রাণিত করতে হবে বলেই যে শিক্ষার প্রয়োজন, তাও নয়! রবীন্দ্রনাথের কথায়—"শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গে যদি আর-কোনো অবান্তর উদ্দেশ্য ভিতরে ভিতরে থাকিয়া যায় তবে তাহাতে বিকার জন্মায়।" ১৩,৩ সালে লেখা এই প্রবন্ধটিতে তিনি জানান—"নিজে চিন্তা করিবে, নিজে সন্ধান করিবে, নিজে কাজ করিবে, এমনতরো মানুষ তৈরী করিবার প্রণালী এক ; আর পরের হুকুম মানিয়া চলিবে, পরের মতের প্রতিবাদ করিবে না, ও পরের কাজের যোগানদার হইয়া থাকিবে মাত্র, এমন মানুষ তৈরীর বিধান অন্যরূপ।" এটিও চিন্তনীয় মন্তব্য।

এই সমালোচনার আসল লক্ষ্য ছিল তখনকার ব্রিটিশ সরকারের উপনিবেশ —এই ভারতবর্ষের শিক্ষা-ব্যবস্থাপনা। রবীন্দ্রনাথ লেখেন—"গবর্মেণ্ট-প্রতিষ্ঠিত সিনেটে সিনডিকেটে বাঙালি থাকিলেই যে বিদ্যা-শিক্ষার ভার আমাদের নিজের হাতে রহিল, তাহা আমি মনে করি না।"

শিক্ষার ক্ষেত্রে, দেশ স্বাধীন হবার পরেও আজ পর্যন্ত আমরা কোন্ পথে চলেছি, সে চিন্তা অনিবার্য। বিবেকানন্দ বলতেন, মানুষের নিজের মধ্যেই যে চরম শ্রেষ্ঠতা নিহিত আছে, তার বিকাশ ঘটিয়ে তোলাই শিক্ষার উদ্দেশ্য। বোধ-হয়, বর্তমান মানবজাতির বিভিন্ন চিন্তা এবং সম্ভাবনা সম্বন্ধে দেশের ছেলেমেয়েরা নিজেদের পৃথক পৃথক অধিকার-ক্ষেত্র অনুসারে যাতে অবহিত হতে পারে,— এবং ভাবার বাহন সে পথে যাতে ন্যূনতম বাধাও না হয়,—অতিরিক্ত শাসনে তাদের স্বভাবের কৌতূহল বা তৃষ্ণা যাতে পীড়িত না হয়, এইসব দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার আশু-সংস্কার স্বীকার্য। ইংরেজ সরকারের অধীনে বাস ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এবং আরো কেউ কেউ শিক্ষা-সংস্কারের কথাপ্রসঙ্গে ইংরেজের বিরুদ্ধে অনেক কথা বলে গেছেন। সে-আমলে রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের কথা উল্লেখ ক'রে বলেন—সরকারের কাছে অনুমতির প্রয়োজনই যে নেই শুধু, তা নয়,—সরকারের সংস্পর্শ জ্ঞানত এড়িয়ে থেকেই, যা যথার্থ, তা আমাদের শান্তভাবে এবং ধৈর্যের সঙ্গে ক'রে তুলতে হবে। এখন দেশের ঠিক সে-অবস্থা নেই। এবং তখনো রবীন্দ্রনাথ ঠিক ঐ ধরনের কথা ব্যক্ত করেই চুপ করেন নি। আমাদের শিক্ষার

তথাকথিত সাহেবিয়ানার বিরুদ্ধে লিখে গেছেন তিনি। আরো নানা প্রসঙ্গ তাঁর নানা রচনায় আলোচিত হয়েছে। তিনি লিখে গেছেন—"শিক্ষার জন্ত এখনও আমাদের বনের প্রয়োজন আছে এবং গুরুগৃহও চাই। বন আমাদের সজীব বাসস্থান এবং গুরু আমাদের সহৃদয় শিক্ষক।" অপরাধী ছাত্রদের শাস্তি কী রকম হবে, তারও ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন তিনি—"অপরাধ করিলে ছাত্রগণ আমাদের প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রায়শ্চিত্ত পালন করিবে। শাস্তি পরের নিকট হইতে অপরাধের প্রতিফল, প্রায়শ্চিত্ত নিজের দ্বারা অপরাধের সংশোধন।"

রবীন্দ্রনাথের সেই ১৩১২-১৩ সালের বিভিন্ন প্রবন্ধের এইসব উক্তি থেকে আজ আমাদের জীবন-পরিবেশ বহুদূরে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এখন নগরই শিক্ষার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। গ্রামগুলি নগরমুখী হয়ে আছে। প্রায়শ্চিত্তের কথা এখন কে কাকে শোনাবেন? নোটবই, পণ্য শিক্ষা এবং সহিংস বিক্ষোভই এখন প্রচলিত রীতি। কিন্তু এই রীতিতেও আমরা কি সুখী হয়েছি?

সুখী যে হইনি, সে-বিষয়ে দেশে বোধহয়, মতান্তর নেই। বঙ্কিমচন্দ্র বলতেন,—বিভিন্ন বৃত্তির সামঞ্জস্যের অবস্থাই আদর্শ। কিন্তু আমরা এরকম কটি মানুষই বা দেখেছি? ১৩২৩ সালের ফাল্গুন মাসে লেখা অতুলচন্দ্র গুপ্তের একটি প্রবন্ধে ('শিক্ষার লক্ষ্য') বলা হয়—আদর্শ মানুষ বড়োই বিরল। বাল্মীকি যখন নারদকে প্রশ্ন করেন অশেষ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি কে? তখন সেই ত্রেতা যুগেও নারদ ইক্ষাকুবংশ-প্রভব রামচন্দ্র ব্যতীত আর কারও নাম করতে পারেন নি। অতএব—শিক্ষার ফলে সেরকম সম্ভাবনা সত্য ক'রে তোলা সম্ভব নয়; আদর্শ মানুষ বা অতিমানুষ গড়ে তোলা কখনোই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। বুদ্ধির চর্চায় চরিত্র গঠিত হতে পারে—প্লেটোর এই মতও এখন পুরোনো হয়ে গেছে। শিক্ষার অভাব নেই, বুদ্ধিও কম নেই—অথচ চরিত্রটি ভালো নয়, এরকম মানুষ আমরা কি যত্রতত্র দেখি না?

হার্বার্ট স্পেনসারের সূত্রে পাওয়া জীব-শরীরের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সভ্যতার ক্রমোন্নতির সম্পর্ক সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের ধারণাটি যে 'আগাগোড়া মিথ্যা', অতুলচন্দ্র তাঁর ঐ প্রবন্ধে সে-কথা জানিয়ে গেছেন। মানুষের কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, শিল্প, সংগীত ইত্যাদিকে তার জীবশরীরেরই ক্রমবিকাশের ফল বলতে দ্বিধা হয়; অতুলচন্দ্রের কথায়—'এগুলি বাহিরের বস্তু। মানুষ এগুলিকে আবিষ্কার করিয়াছে—সৃষ্টি করিয়াছে। ইহারা এক পুরুষের শরীর হইতে আর

এক পুরুষের শরীরে সঞ্চারিত হয় না। এক পুরুষের মানুষ পরের পুরুষের মানুষকে এগুলি সঞ্চিত ধনের মতো দান করিয়া যায়। ইহারা মানুষের heredity নয়, inheritance. এগুলির বংশানুক্রম নাই, আছে উত্তরাধিকার।

শিক্ষার ব্যবস্থাপনা এসব চিন্তা পরিহার করতে পারে না। অতুলচন্দ্র জানিয়েছিলেন যে, একভাবে বলা যায়—শিক্ষার লক্ষ্য মানবসমাজের পূর্বোক্ত উত্তরাধিকার সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করা; দ্বিতীয়ত,—'শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য মানুষকে জীবন-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করা।' এই শেষোক্ত মতটির কথাসূত্রে তিনি লিখেছিলেন—"এই মতটির আবির্ভাব মানবসভ্যতার একটা tragedy. ইহা মনের উপর প্রাণের প্রতিশোধ।" কৌতূহলী পাঠক এই রচনাটি পড়ে দেখবেন। জীবপর্যায়ে ক্রমবিকাশের ধারায় মানুষ 'প্রাণের' ঘরে চুরি ক'রে 'মনের' ঐশ্বর্য যে কী অর্থে বাড়িয়েছে সে-প্রসঙ্গ অতুলচন্দ্রের নিজের ঐ লেখাটি থেকেই অনুভব করা সমীচীন। এখানে সে রচনা থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতি তুলে দেখাবার চেষ্টা নিষ্প্রয়োজন। বরং এই প্রাসঙ্গিক কথাটিই উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমানে আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের কথা ভাবতে গেলে বর্তমান জীবন-ধর্মকে অগ্রাহ্য করা উচিত হবে না। রামমোহন, বঙ্কিম, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, রবীন্দ্রনাথ বা বিবেকানন্দের চিন্তার মধ্যেই সম্পূর্ণ আবদ্ধ থাকাও চলবে না। মনুষ্যত্বই লক্ষ্য বটে; কিন্তু সে লক্ষ্যের যুগে যুগে অল্পবিস্তর পরিবর্তন ঘটে থাকে। বঙ্কিমের সামঞ্জস্যবাদ মিথ্যে নয়, কিন্তু সেই সঙ্গে একালের উৎপাদী বা 'প্রোডাকটিভ' শব্দটির ইঙ্গিতও ধর্তব্য। অর্থাৎ শিক্ষা উত্তরাধিকারে মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করুক, শিক্ষিত মানুষ সৎ হোন, অতীতের এবং বর্তমানের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাহিত্য-শিল্প সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ও আগ্রহী হোন—এবং দেশের অর্থনৈতিক উৎপাদনে ব্রতী হবার সুযোগ পান, এসব স্বীকার্য। শিক্ষিত বেকার কোনো সভ্যতার লক্ষণ নয়। আমাদের আশ্রমে আশ্রমে নরশ্রেষ্ঠ তৈরী করবার সাধনা অটুট রাখতে হবে—এ স্বপ্ন এখন দিবাস্বপ্ন অথবা দুঃস্বপ্ন। যাঁরা ধর্মশিক্ষার ওপর জোর দেন, তাঁরাও মর্ত্য মানবিক দাবিগুলি ভুলবেন কেন? শরীর এবং মন, দু'টির একযোগে নিয়োগ দরকার;—বলা বাহুল্য, সুনিয়োগ চাই,—অর্থকরী এবং পরমার্থ-সচেতন নিয়োগ।

শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কার সম্বন্ধে বঙ্গভঙ্গ-আন্দোলনের সমকালীন ও তার কিঞ্চিৎ পূর্বাবধি আয়োজন বিশেষ স্মরণীয়। 'A Phase of Swadeshi Movement (National Education) 1905—1910' পুস্তিকায় (চক্রবর্তী

চ্যাটার্জি অ্যাণ্ড কোং লিঃ, কলকাতা, ১৯৫৩ ) অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও অধ্যাপিকা উমা মুখোপাধ্যায় আমাদের সেই পর্বের 'জাতীয় শিক্ষা' আন্দোলন সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং তার 'ফোরওয়ার্ডে' বা মুখবন্ধে হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লেখেন যে, ব্রিটিশ-প্রবর্তিত এদেশের শিক্ষাব্যবস্থা মোটেই 'ন্যাশনাল' বা জাতীয় কল্যাণের উদ্দেশ্যে রচিত হয়নি। স্যার উইলিয়ম উইলসন সাহেবের এই বিশেষ উক্তি হেমেন্দ্রপ্রসাদ তাঁর ঐ রচনায় উল্লেখ করেন। হাণ্টার সাহেব জানান যে, প্রাচীন ভারতের বিশেষ মনোযোগের তিনটি নীতির বিরুদ্ধে সরকারী শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সর্বৈব বিদ্রোহী—(ক) সংযম, শৃঙ্খলা বা ডিসিপ্লিনের নীতি—(খ) ধর্মনীতি—এবং (গ) সন্তোষের নীতি। "Your State education is producing a revolt against three principles which although they were pushed too far in ancient India, represent the deepest wants of human nature—the principle of discipline, of religion, the principle of contentment." এই শিক্ষার ফল দেশের পক্ষে বিষময় হবে, ঈশ্বরে আস্থাহীন উচ্ছৃঙ্খল করণিক-বৃত্তিজীবী, সরকারী অনুদান-ভোগী, অসন্তোষময় এক জনগোষ্ঠী গড়ে উঠবে। হাণ্টার সাহেব যেমন বলেছিলেন, দেশের যথার্থ হিতাকাঙ্ক্ষী এক শ্রেণীর দেশবাসীও তখন সেইরকম ভাবছিলেন। যাতে দেশের সবরকম চাহিদা মেটানো যায়, জাতীয় শিক্ষা তো সেই রকমই হওয়া উচিত। কিন্তু সরকারী শিক্ষার ছাপ না থাকলে মান সম্মান বা জীবিকার উপায় কিছুই সহজে মেলে না। আবার এই শিক্ষার ফলে জনগণের সঙ্গে শিক্ষিত-শ্রেণীর বিরাট ব্যবধান দেখা দিতে থাকে। স্বদেশী আন্দোলন যখন আসন্ন, তখনি দেশের শিক্ষিত বিবেকী ব্যক্তিরা জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। সেইসব মানুষও ছিলেন ব্রিটিশ প্রবর্তিত বিজাতীয় শিক্ষারই ফসল, কিন্তু তাঁরা ছিলেন তথাকথিত শিক্ষিতদের মধ্যে ব্যতিক্রম। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৬৫-১৯৪৮) ছিলেন স্বনামখ্যাত জাতীয়তাবাদী কর্মী এবং 'ডন-সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠাতা। ১৯০২-এর জুলাই মাসে এই 'ডন-সোসাইটি' স্থাপিত হয় এবং ১৯০৭-এর গোড়ার দিক পর্যন্ত এটি টিঁকে ছিল। অর্থাৎ স্বদেশী আন্দোলনের তীব্রতার আগেই এই স্বদেশী সাংস্কৃতিক উদ্দীপনার প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। সেকালের মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনের, অর্থাৎ একালের বিদ্যাসাগর কলেজের দোতলায় 'ডন-সোসাইটি'র অফিস ছিল। সাধারণ বিভাগ, শিল্পবিভাগ এবং পত্রিকা এই তিন বিভাগে ডন-সোসাইটির কাজ

হোতো। সাধারণ বিভাগে সপ্তাহে দু'দিন ক্লাস হোতো—রবিবারে, সেদিন সতীশচন্দ্র নিজে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেন এবং শুক্রবার নৈতিক ও ধর্ম-বিষয়ক ক্লাসে পণ্ডিত নীলকণ্ঠ গোস্বামী গীতার কর্মযোগ ও গীতার আদর্শ সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশী শিল্প সামগ্রীর এক দোকান খোলা হয়, যাতে দেশীয় শিল্প ও বাণিজ্যের অনুকূলে দেশবাসীকে শিক্ষিত ক'রে তোলা যায়। এর আগেই ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ডন' পত্রিকা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে সেই পত্রিকা 'দি ডন অ্যাণ্ড ডন সোসাইটিজ ম্যাগাজিন' নামে চলতে শুরু করে; ১৯০৪-০৬, এই দু' বছর পত্রিকাটি যথার্থ ডন সোসাইটির মুখপত্র হিসেবে এবং তারপর ১৯০৪-এর আগস্ট মাসে জাতীয় শিক্ষা-পরিষদ পূর্ণোত্তমে কাজ আরম্ভ করলে ১৯০৯ পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের মুখপত্র হিসেবে প্রকাশিত হয়। তারপর ১৯১০ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত চার বছর ভারতীয় শিল্প, ভাস্কর্য, সংগীত, ইতিহাস ইত্যাদির পর্যালোচনায় নিযুক্ত থাকে। হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় 'ভারতকোষ'-এর তৃতীয় খণ্ডে ডন-সোসাইটির এই বিবরণী দিয়েছেন। তাঁদের কথায়—"এই সমিতিতে যে সকল কৃতবিদ্য তরুণ দীক্ষিত হইয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিনয়কুমার সরকার, রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, হারাণচন্দ্র চাকলাদার, রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার, উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রমুখ মনীষীর নাম স্মরণীয়।" কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য (১৮৯০-১৮৯২) গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৪-১৯১৮), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের (১৮৬১-১৯০৭, মতন ব্যক্তিদের এই সংস্থা সহায়ক কর্মী পেয়েছিলেন। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান ইউনিভার্সিটিজ কমিশনের সদস্য হন এবং সেই কমিশনের শিক্ষা-সম্পর্কিত মতামতের সঙ্গে তাঁর অনৈক্যের সূত্রগুলি জাতীয় শিক্ষার অনুকূল ছিল, সেকথা সুবিদিত। ১৪ই আগস্ট ১৯০৬ তারিখে যখন কলকাতার ন্যাশনাল স্কুল ও কলেজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয় সেই সভায় গুরুদাস জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও আদর্শ ব্যাখ্যা করেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর একাধিক ইংরেজি ও বাংলা বই যেমন "A Few Thoughts on Education" (১৯০৪),—"The Education Problem in India" (১৯১৪),—'শিক্ষা' (১৯০৭), 'জ্ঞান ও কর্ম' (১৯১০) সুপরিচিত। ব্রহ্মবান্ধব (আসল নাম: ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন জেনারেল অ্যাসেমব্লিজ ইনস্টিটিউশনের এফ-এ ক্লাসে স্বামী বিবেকানন্দের (তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) সহপাঠী। তিনি রামকৃষ্ণ পরমহংস ও কেশবচন্দ্র

দেবের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জানুয়ারি নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত হন, পরে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে প্রোটেস্ট্যান্ট খ্রীষ্টান ও পরে ক্যাথলিক খ্রীষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত হন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং প্রথমে করাচিতে (১৮৯৪) মাসিক,—ও পরে কলকাতায় (১৯০০) সাপ্তাহিক 'সোফিয়া' প্রকাশ করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব অক্সফোর্ডে কেম্ব্রিজে হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বিলেত থেকে ফিরে, তাঁর 'সারস্বত আয়তন বিদ্যালয়' পুনর্গঠিত করেন। এবং ১৯০৪-খ্রীষ্টাব্দে (১৬ই ডিসেম্বর) দৈনিক 'সন্ধ্যা' পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকা স্বদেশী আন্দোলনের অন্যতম মুখপত্র হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি অনেকেই সে সময়ে জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেন। সুবোধচন্দ্র মল্লিক (১৮৭৯ ১৯২০)—যাঁদের ওয়েলিংটন স্কোয়ারের বাড়িটি ছিল সেকালের স্বদেশী আন্দোলনের কেন্দ্র, ডন-সোসাইটির সঙ্গে যাঁর যোগ ছিল, অরবিন্দ ঘোষ যাঁর বাড়িতে কয়েক বছর বাস করেছেন, ময়মনসিংহ গৌরীপুরের জমিদার—ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৭৩-১৯৫৭) এবং আরো অনেকেই এ-বিষয়ে সেকালে বিশেষ বিতর্কে, আলোচনায় ও পথ সন্ধানে অগ্রসর হন। এর অনেক আগেই বিবেকানন্দ বলেন—"Art, Science and Religion are but three different ways of expressing a single truth But to understand this we must have Advaita."

৪০

জন্মশতবর্ষ সংস্করণের সপ্তদশ খণ্ডের ষষ্ঠ বিভাগে 'Education and Art' সম্বন্ধে তাঁর যে আলোচনা আছে (পৃঃ ১৯১-২৩১) তার প্রথমেই 'A Preface on National Education' এবং 'A System of National Education' পাওয়া যায়। তাতে শ্রীঅরবিন্দ জাতীয় শিক্ষার আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য জানিয়েছেন। আমাদের ইস্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত তখনকার শিক্ষা-ব্যবস্থা ভাল নয়, এই নেতিবাচক সমালোচনার পরিবর্তে তিনি চেয়েছিলেন যথার্থ জাতীয় শিক্ষা বলতে কী বোঝায় সেটি যাতে দেশের লোক ভেবে দেখেন সেই রকম মনোভাবের চর্চা। তাঁর মতে, পূর্ব-পশ্চিম যেখানেই হোক,—ইংলণ্ডে জার্মানীতে জাপানে সর্বত্রই শিক্ষাব্যবস্থা যাতে সুনাগরিক গড়ে তুলতে পারে; সেই চেষ্টা করা চাই। শিক্ষার ক্ষেত্রে কোনো সংকীর্ণ জাতীয়তায় বেড়া দেওয়া চলে না। প্রাচীন ভারতের অঙ্কশাস্ত্র বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেটুকু ভাস্করাচার্য

আর্যভট্ট, বরাহমিহির দেখিয়ে গেছেন, কেবল সেই ক্ষেত্রেই আবদ্ধ থেকে জাতীয় শিক্ষার নামে গ্যালিলিও, নিউটন প্রভৃতিকে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরে নির্বাসিত রাখা চলবে না। প্রাচীন টোলের শিক্ষাপ্রণালীতেই আমরা কি নিজেদের আবদ্ধ রাখবো নাকি তক্ষশীলায় নালন্দাতে কীভাবে পাঠ দেওয়া হোতো সেইসব প্রণালী আবিষ্কার করেই সন্তুষ্ট থাকবো? শিক্ষার ক্ষেত্র ব্যাপক, সর্বজনীন,—দেশগত সীমা উত্তীর্ণ হয়ে তা বিশ্বমানবের কল্যাণের অভিপ্রায়ী। এই ছিল শ্রীঅরবিন্দের ধারণা। আমরা বিংশ শতকের অধিবাসী এবং কিছুতেই আমরা চন্দ্রগুপ্ত বা আকবরের আমলে ফিরে যেতে পারি না, এই সত্যটি তিনি প্রত্যেককে মনে রাখতে বলেন। রেলপথ, মোটরকার ফেলে দিয়ে আমরা প্রাচীন গো-যানের যুগে ফিরবো কেন? পশ্চাৎ-গতি নয়, চাই প্রগতি। চাই ভারতবর্ষের অন্তর্লীন মহাশক্তির দাবি পূরণের সামর্থ্য। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান পরিহারের প্রশ্ন ওঠে না, কিন্তু ভারতীয় মনের ঐতিহ্য,—
—আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতার সঙ্গে, আগ্রহের সঙ্গে যাবতীয় আহৃত আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মিলিয়ে নেওয়াটাই পরম লক্ষ্য। সংস্কৃত বা অন্য কোনো প্রাচীন ভাষা আমাদের শিখতেই হবে, ইংরেজি বা অন্য বিদেশী ভাষা শেখা চাই যাতে আমাদের অতীতের সঙ্গে বর্তমান বিশ্বের যোগ রক্ষা ক'রে নিজেদের স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে পারি। সেটাই হবে আমাদের জাতীয় শিক্ষার প্রধান কথা।

যাঁরা বলেন, ইউরোপীয় সভ্যতার শিক্ষা আমাদের পেতে হবে, শ্রীঅরবিন্দ তাদের মনে করিয়ে দেন যে, ইউরোপ তার সভ্যতা গড়ে তোলে প্রাচ্য সংস্কৃতির ভিত্তিতে—মিশর, ভারত, ফিনীশীয় ইত্যাদি সংস্কৃতির ওপরেই,—এবং তাকে এক নতুন দিকে পরিচালিত করে গ্রীস—রোমের সহজাত মানসিকতা ও সামাজিক প্রবণতার প্রভাবে,—কিছু হারিয়েও ফেলে এবং আরবদের কাছ থেকে পুনরায় প্রাচ্যজ্ঞানই আহরণ করে; ভারতের কাছেও সে ঋণী এবং ব্যাপকভাবে নব-জাগরণের অর্থাৎ রেনেসাঁসের ফলে তা ফিরে পেয়ে টিউটনিক, ল্যাটিন, কেলটিক ও স্লাভ জাতিদের প্রবণতা অনুসারে তার পরিণতি ঘটে। এই যখন ইতিহাস, তখন এশিয়ার জাতিগুলি কেনইবা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতাকে বিনাবাক্যে মেনে নেবে? তাঁর বিশেষ আর একটি কথা এই যে, একথা যদিও অনেকে বলে থাকেন যে, মানুষের মন সর্বত্রই একই রকম—অতএব একই শিক্ষা সকলের পক্ষে সকল জাতির পক্ষে গ্রাহ্য, তবু এই বিশেষ দিকটি শ্রীঅরবিন্দের নজরে পড়ে যে, সার্বিক মানব-মনের ও মানবাত্মার মধ্যেই ব্যক্তি ও জাতি-

মনের অসংখ্যবিধ বৈচিত্র্য বিদ্যমান। জাতীয় শিক্ষা সেই প্রাণ-মন-আত্মার চাহিদা মেটাবার জন্যেই বিশেষ জরুরী।

তিনি তিনটি প্রয়োজনীয় লক্ষ্যের কথা জানান—"There are three things which have to be taken into account in a true and living education, the man, the individual in his commonness and in his uniqueness, the nation or people and universal humanity."[৩১] এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি জানান যে, ভারতবর্ষ মানুষকে দিব্য সত্যের অভিব্যক্তি রূপে দেখে এসেছে,—মন, বুদ্ধি, দেহ-কে সে অস্বীকার করেনি, কিন্তু ঐশ্বরিক মহিমা বা দিব্য শক্তিরই অভিব্যক্তি প্রত্যেকটি মানুষ—এই হোলো ভারতের ধারণা। শ্রীঅরবিন্দের কবিতা, যোগ, বিপ্লব, শিক্ষাচিন্তা সবই এই ভিত্তিতে আশ্রিত। তাই অন্যেরা যখন আমাদের শিক্ষা-সংস্কারের কথা আলোচনা করেছেন, শ্রীঅরবিন্দের চিন্তার সঙ্গে তাঁদের ধ্যানের কিছু কিছু মিল অবশ্যই দেখা যায়, কিন্তু তাঁর নিজস্ব ধারণার এই বিশেষত্বই সর্বাধিক লক্ষণীয়। তাঁর শিক্ষাচিন্তা আরো ব্যাপকভাবে আলোচ্য বটে, কিন্তু এখানে সংক্ষেপে তাঁর জীবনবোধের সঙ্গে যুক্ত রেখে তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল কথাটি উল্লেখ করবার চেষ্টা করা গেল। এই ক্ষেত্রেও শিক্ষাব্রতীকে মন বা অন্তঃকরণের চারটি স্তরের প্রসঙ্গ তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন—পূর্বস্মৃতি ও সংস্কার বা চিত্তশক্তি হোলো প্রথম স্তর; দ্বিতীয় স্তর হোলো মন (manas)—ভারতীয় মনস্তত্ত্বে যাকে বলে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়; তৃতীয় স্তর হোলো বুদ্ধি—যেটি মননকর্মের আসল যন্ত্র; চতুর্থ স্তর এখনো অপরিণত—এই স্তরের কাজ আমরা উচ্চ প্রতিভার ক্ষেত্রে দেখতে পাই—সম্যক্ বোধ, সত্যের স্বজ্ঞাজাত উপলব্ধি যাতে মানুষকে ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা করে তোলে। অতঃপর তিনি নৈতিক প্রজ্ঞাকে শিক্ষার অন্যতম অঙ্গ বলেছেন এবং এই ক্ষেত্রে তিনি তিনটি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছেন—ছাত্রের 'আবেগে'র প্রকৃতি,—তার 'সংস্কার' অর্থাৎ অভ্যাস ও সঙ্গ—এবং 'স্বভাব' বা সহজাত প্রবণতা। এইগুলি লক্ষ্য ক'রে তাকে সৎপথে চালিত করতে হবে। বাইরে থেকে কোনো শৃঙ্খলা বা পোষাক-পরিচ্ছদ চাপিয়ে দিলে চলবে না, তার স্বভাবকে কল্যাণের পথে প্রবাহিত করা দরকার। ইউরোপে তা হয় না। তাঁর মতে, সেখানে হৃদয়হীন ভণ্ডামি ও গতানুগতিকতা শিক্ষাকে বিকৃত ক'রে তুলেছে। উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দেয় অচিরেই।

---

৩১। জন্মশতবর্ষ-সংকলন শ্রীঅরবিন্দ গ্রন্থাবলী ১৭শ খণ্ড: পৃঃ ১০৮ দ্রষ্টব্য।

আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের ভূমিকা দেখা দেবার আগে আমরাও সেই শিক্ষা-ব্যবস্থার শিকার হয়েছিলুম। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষায় গুরুর ভূমিকার তিনি খুবই প্রশংসা করেন। তিনি লেখেন—"To neglect moral and religious education altogether is to corrupt the race." ৩২ জাতীয় শিক্ষা সম্পর্কে বিশদ আলোচনার মধ্যেই তিনি এই ধর্মশিক্ষার কথাসূত্রে ঈশ্বরের জন্যেই আমাদের জীবন, মানুষের জন্যেই আমাদের অস্তিত্ব, স্বদেশের কল্যাণেই আমাদের আত্মোৎসর্গ ইত্যাদি আদর্শ জাগিয়ে তোলার ওপরে জোর দেন।

এর আগেই রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মনীষীর শিক্ষা-চিন্তার মাতৃভাষার মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে তাঁদের ঐকমত্যের দিক দেখানো হয়েছে। শ্রীঅরবিন্দ নিজে লেখেন—"The mother-tongue is the proper medium of education and therefore the first energies of the child should be directed to the thorough mastering of the medium." ৩৩ এবং এইসব পরিচিত বা প্রত্যাশিত লক্ষ্যের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে ছাত্রের চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়ে তোলার আদর্শের উপযোগিতা দেখিয়েছেন। সেই দিকটি ভাবতে গেলেই বঙ্কিমচন্দ্রের ও রবীন্দ্রনাথের আলোচনা মনে পড়ে। শ্রীঅরবিন্দের কথায়, চিত্তের মানসিক ও নৈতিক অভ্যাসগুলিকে শুদ্ধ করে তুলতে হবে। এই উদ্দেশ্যেই আমাদের প্রাচীন যোগাভ্যাসের প্রয়োজনীয়তার কথা তোলেন তিনি। বিভিন্ন বিষয়ের ওপরে একই সময়ে মনঃসংযোগ করা দুঃসাধ্য নয়। বলা বাহুল্য, এজন্যে উপযুক্ত চর্চা বা অভ্যাস চাই। চিত্তশুদ্ধি ও যোগ-সাধনার ফলেই তা সম্ভব। যুক্তি, বিবেচনা ইত্যাদির সঙ্গে, স্মৃতিশক্তির সঙ্গে কল্পনা-শক্তিকে তীক্ষ্ণ করে তুলতে হবে। আমাদের ভাষাচর্চার ক্ষেত্রেও শব্দের অর্থ, ব্যঞ্জনা, স্বাদ ইত্যাদি অনুভবের সামর্থ্য অবহেলা করা চলবে না। যুক্তিবিচার জাগ্রত রাখতে হবে। জাতীয় শিক্ষার কথা-প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ নানাভাবে এইসব দিকই দেখিয়ে গেছেন এবং এ-ছাড়া আরো অনেক কথা আছে।

তাঁর সমস্ত কর্ম,—সকল আলোচনার ও সাহিত্য-সৃষ্টির শেষ কথা হোলো মানুষের রূপান্তর ঘটাতে হবে। চাই অন্তরের জাগরণ,—বৃহতের অভিব্যক্তি,—পরমের সংযোগ।

---

৩২। জন্ম শতবর্ষ সংস্করণ শ্রীঅরবিন্দ গ্রন্থাবলী ১৭শ খণ্ড পৃঃ ১৯৮ দ্রষ্টব্য।

৩৩। তদেব, পৃষ্ঠা ২১৪ দ্রষ্টব্য।

৪১

শ্রীঅরবিন্দের জন্ম-শতবর্ষ-সংস্করণের গ্রন্থাবলীর ষোড়শ খণ্ডের প্রথমাংশে 'The Supramental Manifestation upon Earth.' বিভাগে পরপর যে আটটি নিবন্ধ পাওয়া যায় সেইগুলিই তাঁর শেষ গদ্যরচনা। 'বুলেটিন অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন' পরে যার নাম হয় 'বুলেটিন অফ শ্রীঅরবিন্দ ইণ্টারন্যাশনাল সেণ্টার অফ এডুকেশন'—সেই পত্রিকার জন্যেই তিনি এগুলি লেখেন। ১৯৪৯-এর ২১-এ ফেব্রুয়ারি থেকে এই 'বুলেটিন অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন' প্রকাশিত হতে থাকে এবং পূর্বোক্ত আটটি নিবন্ধের প্রথমটি ১৯৪৮-এর ৩০-এ ডিসেম্বর শ্রীঅরবিন্দ কথিত বাণীর শ্রুতিলিখন থেকে মুদ্রিত হয়। এতে তিনি আশীর্বাদ জানিয়েছিলেন এবং মানসিক ও আত্মিক সাধনা যে শারীরিক স্বাস্থ্যচর্চার ওপর বিশেষ-নির্ভরশীল সে-বিষয়ে নানা কথার মধ্যে নিয়ম শৃঙ্খলা, সাহস, কৌশল, সংকল্পের স্থৈর্য ইত্যাদি প্রসঙ্গের ওপর জোর দেন। দ্বিতীয় নিবন্ধের নাম Perfection of The Body. শরীরমাদ্যম্ খলু ধর্মসাধনম্-এই বহুশ্রুত সংস্কৃত রচনটি উল্লেখ ক'রে তিনি জানান "A divine life in a material world implies necessarily a union of the two ends of existence. The spiritual summit and the material base."—অর্থাৎ, এই জড়বস্তুময় দুনিয়ায় দিব্যজীবনের দিকে লক্ষ্য রাখা মানেই নিচের জড়ত্বের অধিষ্ঠান আর শিখরের আত্মিকতা, অস্তিত্বের এই দুই প্রান্তের সমন্বয় বোঝায়। আত্মার ভিত্তি যে-জড়ে আশ্রিত, সেই জড় উঠেছে আত্মিকতার (heights of the spirit) ঊর্ধ্বমুখে এবং আত্মিকতার মহিমা জড়াভিমুখী গতিতে নেমে আলোতে, ঐশ্বর্যে, শক্তিতে বাস্তব জগৎকে প্রভাময় করে তুলছে। ফলে, বস্তুজগৎ উত্তরোত্তর দিব্যজগৎ হয়ে উঠছে। হাঁ, এইভাবেই। শ্রীঅরবিন্দ রূপান্তর বা transformation-এর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে লেখেন—"The transformation is not a change into something purely subtle and spiritual to which Matter is in its nature repugnant and by which it is felt as an obstacle or shackle binding the spirit; it takes up Matter as a form of the spirit though now a form which conceals and turns it into a revealing instrument, it does not cast away the energies of Matter, its capacites, its methods; it brings out their hidden possibilities, uplifts, sublimates, disc-

loses their innate divinity."

শ্রীঅরবিন্দের এইসব কথার গূঢ়ার্থ হোলো দিব্যতার পথে জড় বা 'ম্যাটার'ও বাধা নয়, পরিত্যাজ্য নয়,— সমস্ত নিহিত সম্ভাবনার পূর্ণতার দিকে উন্নয়ন,— যা বাধা বলে মনে হয়, তাকে সহায়ক যন্ত্ররূপে রূপান্তরিত করাই লক্ষ্য। এই বক্তব্যের মধ্যে আমরা তাঁর যে দর্শনের কথা পাই, সে পথে এগিয়ে যাবার কোনো প্রাত্যহিক কার্যক্রম আছে কি?

এই পরিস্থিতি মনে রেখেই শ্রী মাধব পুণ্ডলিক পণ্ডিত সার্থকতা সমন্বয়ের সন্ধানী যাঁরা, তাঁদের জন্যে একটি পুস্তিকা লেখেন—'How do I begin.' প্রত্যেকেই নিজের-নিজের প্রয়োজন ও সামর্থ্য অনুসারে এই বইয়ের বিধিমার্গের সমুচিত অদল-বদল করে নিতে পারেন। তাঁর নিজের কথায়— "I have thought of this time and again and I propose to formulate a broad programme for the daily life of the seeker after Integral perfection. It is understood that this is only a flexible outline to be filled in and adapted by each Individual according to his needs and circumstances."

শ্রীঅরবিন্দের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের বিচিত্রতা তাঁর পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও সাধনায় কোনো খণ্ডিত অংশমাত্র মনে করা ঠিক হবে না। কবি-যোগী-বিপ্লবী একাধারে এই তিনের সমন্বয় ঘটেছিল তাঁর মধ্যে। এই সুপরিচিত প্রসঙ্গটাই উপস্থিত খণ্ডে বারবার দেখা গেছে। ফলে, কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটেছে অপরিহার্য-ভাবে। বঙ্কিমচন্দ্র ও স্বামী বিবেকানন্দের মতন তিনিও ভারতীয় নেশন বা জাতির মহিমা দেখিয়ে আমাদের ঐতিহ্য ও যথার্থ প্রগতির পথে গভীর আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় আমাদেরই উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠার সাধনা করে গেছেন। পূর্ণতার আদর্শবোধ ছাড়া তাঁর রাজনীতি-চিন্তাও ধরা যায় না। তাঁর রাজনীতি তাঁর জীবনের অন্যান্য বহুবিধ ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দিব্য জীবনের চরিতার্থতায় গিয়ে মিশেছে।

আরো গুছিয়ে সব কথা বলবার সামর্থ্য তাঁর সম্বন্ধে আরো নিবন্ধচিত্ত না হ'লে কি সম্ভব হ'তে পারে? এই লেখকের উপস্থিত প্রয়াস অসম্পূর্ণ এই দৈন্যবোধ সত্ত্বেও এটিকে একজন পাঠকের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ক্ষীণ প্রয়াস হিসেবেই অন্যান্য পাঠকরা গ্রহণ করবেন, এই প্রার্থনা জানিয়ে এই খণ্ডটি এখানেই শেষ করা যাক। অতঃপর তাঁর যোগের তত্ত্ব ও সাধনার পথ সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা ও নির্দেশ দেখা যাবে। সেক্ষেত্রেও পুনরাবৃত্তি অপরিহার্য।

## গ্রন্থাগারের উপযোগী উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থ

### ॥ প্রবন্ধ ও সমালোচনা সাহিত্য ॥

১. *বাংলা নাটক, নাট্যতত্ত্ব ও রঙ্গমঞ্চ প্রসঙ্গ*—
ডঃ প্রদ্যোত সেনগুপ্ত— ৫০·০০

২. *বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডি-তত্ত্বের প্রয়োগ*—
ডঃ শীতল ঘোষ ৪০·০০

৩. *বাঙলা ধাঁধার ভূমিকা*—
ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক ৪০·০০

৪. *নবজাগরণ ও মানবিকতাবাদের ভূমিকায় দীনবন্ধুর নাটক*—ডঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ২২·০০

৫. *বাংলা নাটক সমীক্ষা*—
কমলকুমার সান্যাল ১০·০০

৬. *বঙ্কিমসাহিত্যে ডাকাতের ভূমিকা*—
অধ্যাপক পঞ্চানন মালাকর ১২·০০

৭. *কবি দেবেন্দ্রনাথ সেন ও কয়েকজন*—
শক্তিব্রত ঘোষ ১৪·০০

৮. *দেবতার দীপ হস্তে যে আসিল ভবে*—
ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র ১ম, ১৫·০০ / ২য় ১৫·০০

৯. *পানিত্রাসে শরৎচন্দ্র*—
অধ্যাপক বীরেন্দ্র দত্ত ১০·০০

১০. *বুদ্ধদেব বসু : নানা-প্রসঙ্গ*—
আনন্দ রায় সম্পাদিত ১৫·০০

১১. *গণশিক্ষার স্বপক্ষে সম্পাদনায়*—
মধুসূদন চক্রবর্তী ১২·০০

১২. *পথ-পুস্তিকা : পথ-সাহিত্য*—
ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী ১৪·০০

### ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক

১৩. *বাবুগৌরবের কলকাতা*—
ডঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৬·০০

১৪. *ছিঁড়ে কলকাতা ছাড়িয়ে*—
ডঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৩.০০

১৫ *নদীর তীরে নগরী*—
ডঃ বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় ১৮.০০

১৬. *পালকি চলে ছুলকি চালে* " ১০.০০

১৭. *গোরাদের কলকাতা*—কান্তিরঞ্জন ঘোষ ১২.০০

১৮. *সুরাট থেকে সুতানুটি*—নারায়ণ দত্ত ২০.০০

১৯. *মানুষের ক্রমবিকাশ এবং সভ্যতা ও সংস্কৃতি*—
কমলকুমার সান্যাল ১ম, ১০.০০ / ২য় ১২.০০

২০. *চিতোর গড়*—( সম্পূর্ণ ইতিহাস )
অরুণকান্তি সাহা— ১৬.০০

২১ *ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সংগ্রামী কারা*—
কমলকুমার সান্যাল ১২.০০

২২. *রিকলিং দি-লং-মার্চ*—
অনুবাদ অরুণকান্তি সাহা ২৪.০০

## উপন্যাস

২৩. *সপ্ত দুর্গার উদয়াস্ত* ১ম—সম্রাট সেন ২০.০০

২৪. *ঐ* ২য়— " ২০.০০

২৫. *টুকুনের অসুখ* –অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় ২০.০০

২৬. *রূপকথার আংটি*— " ১ম ২৫.০০ / ২য় ২৫.০০

২৭. *নদী যখন সাগরে*—নিখিলচন্দ্র সরকার ২৫.০০

২৮. *তিস্তার কার্ণিসে*—দেবব্রত ঘোষ ১০.০০

## বিজ্ঞান-বিষয়ক

২৯. *সমুদ্রের চোখ*—সমরজিৎ কর ১২.০০

৩০. *বিজ্ঞানের ছড়া* –ডঃ কমল চক্রবর্তী ৫.০০

৩১. *বিজ্ঞান-ভাবনা*— " ৮.০০

৩২. *বরণীয় বিজ্ঞানী স্মরণীয় আবিষ্কার*—
বীরু চট্টোপাধ্যায় ২০.০০

৩৩. *হিমালয় বিচিত্রা*—ধ্রুব মজুমদার ১৫.০০